পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা-সংসদ কর্তৃক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য নব-প্রবর্তিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত

খাদ্য ও পুষ্টি

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্য]

ডঃ নারায়ণী বসু, এম. এ., ডি. ফিল.

অধ্যাপিকা, সমাজ-বিজ্ঞান বিভাগ, বিহারীলাল গৃহ-বিজ্ঞান কলেজ, ভূতপূর্ব অধ্যাপিকা, হাওড়া গার্লস কলেজ, মাধ্যমিক গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, উচ্চ মাধ্যমিক গৃহ-পরিচালনা ও গৃহ-শুশ্রূষা (XI & XII) প্রভৃতি গ্রন্থের লেখিকা।

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬
দ্বিতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮২
সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬
পুনর্মুদ্রণ : জুলাই, ১৯৮৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা মাত্র।

বাঁধাই : গীতা বাইন্ডিং কনসার্ন

মুদ্রাকর :

পি. এল. দত্ত
প্রিন্টোগ্রাফ
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

সি. বি. অফসেট
২৪, বাগমারী রোড
কলিকাতা-৭০০০৫৪

ভূমিকা

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচী অনুসারে এই নতুন পুস্তক প্রণয়ন করা হইল। বিষয়টি যদিও গৃহবিজ্ঞানের (Home Science) একটি শাখা এবং শুধু মেয়েদেরই পাঠ্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে সকলেরই বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। আমাদের এই অনগ্রসর দেশে শুধু যে খাদ্যাভাব রহিয়াছে তাহা নয় সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নানা সংস্কার এবং অজ্ঞতার জন্যও তাহারা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) খাদ্য সম্বন্ধে দীর্ঘদিন ধরিয়া নানা গবেষণা চালাইয়া আসিতেছে। এতদিন পর্যন্ত এইসব গবেষণার ফলাফলগুলি শুধু বিশেষজ্ঞরাই জানিতে পারিতেন। নতুন পাঠ্যসূচীতে ICMR-এর কিছু কিছু গবেষণা ও খাদ্য সম্বন্ধে সরকারী কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জনসাধারণকে খাদ্যের গুরুত্ব সম্বন্ধে অবহিত করা এবং সস্তা ও সহজলভ্য খাদ্য হইতে উপযুক্ত পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্য গ্রহণের শিক্ষাদানই খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ের উদ্দেশ্য। শুধু ছাত্রছাত্রীরাই নয় সকল গৃহিণী এবং সাধারণ মানুষমাত্রেরই এই বিষয়টি জানা উচিত। পাঠ্যসূচী অনুসরণ করিয়া যতদূর সম্ভব সরল ভাষায় ইহা লেখার চেষ্টা করা হইয়াছে। খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে কাহারো জানার ইচ্ছা থাকিলে এই পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন আশা করি।

এই গ্রন্থ রচনায় বিহারীলাল কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ ইরা ঘোষের অকৃত্রিম সাহায্য পাইয়াছি। অধ্যাপক ডঃ মনোরঞ্জন দে-র সহায়তা ব্যতীত এই পুস্তক প্রকাশ করাই অসম্ভব ছিল। শুধু ধন্যবাদের দ্বারা তাঁহাদের অপরিসীম ঋণ শোধ করা যাইবে না। খুব তাড়াতাড়ি লেখা ও ছাপার কাজ শেষ করিতে হইয়াছে। ফলে পুস্তকে কিছু কিছু ত্রুটি থাকিয়া গেল। নতুন সংস্করণে সেসব সংশোধন করার আশা রাখি। যাহাদের জন্য এই পুস্তক প্রণয়ন করা হইল তাহারা উপকৃত হইলে সর্বশ্রম সার্থক হইবে।

নারায়ণী বসু

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণ প্রকাশনে সাহায্য করিয়াছেন বিহারীলাল কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ সুনীতি চ্যাটার্জী, ডঃ কৃষ্ণা পান এবং ফুড এ্যাণ্ড নিউট্রিশন বিভাগের রীডার ডঃ ইরা ঘোষ। ICMRএর প্রকাশিত রিপোর্ট এবং ডঃ সমর রায়চৌধুরীর খাদ্য ও পথ্য বইখানিরও কিছু সাহায্য লইয়াছি। সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। এই সংশোধিত সংস্করণখানি যদি ছাত্রীদের উপকারে আসে তবেই আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

নারায়ণী বসু

মধ্যমগ্রাম
৬ই আগষ্ট, ১৯৮২

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আগের সংস্করণে পরিশিষ্টতে দুগ্ধ সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণে উহা "খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি"-র মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হইল। এছাড়া "বেসাল মেটাবলিক রেট" সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংযোজিত হইল। সংশোধিত সংস্করণটি ছাত্রীদের যথার্থ উপকারে আসিলে আমার সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে।

মধ্যমগ্রাম
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

নারায়ণী বসু

SYLLABUS FOR NUTRITION

(Elective)

Full Marks : 200

Paper I (Marks : 100)

THEORETICAL

A. An Introduction to Nutrition :

1. Basic Concepts about food nutrition and health.
2. Role of food in the maintenance of good health.

B. Nutrients and Nutritive Processes :

1. Nutrients in food and the foods supplying them.
2. Utilization of food by the body : digestion, absorption and metabolism.
3. Energy requirement of men during rest, different physical activities and different physiological conditions e. g., growth, pregnancy and lactation.
4. Carbohydrates in nutrition.
5. Protein and aminoacids—their functions and requirements. Quality of food Protein—animal vs. vegetable Protein.
6. Fats and oils in nutrition.
7. Vitamins and minerals—their sources, functions and requirements.
8. Water balance.

C. Nutrition in every-day Meal :

1. Dietetics, its meaning.
2. Basic food groups and the study of different foods : Cereals, pulses, nuts and beans, roots and tubers, green leafy Vegetables, other vegetables, fruits, meat and fish, egg, milk and milk products, fats and oils, sugar and jaggery spices and condiments, beverages.

Paper II (Marks : 100)

A. Cookery and Kitchen Sanitation :

1. Methods of Cooking and their effects on the nutritive values of food—measures for the prevention of loss of nutrients.
2. Planning of an idel kitchen.
3. Methods of food preservation.

B. Dietetics and Diet Planning :

1. Nutritional allowances for Indians.
2. Balanced diets for different age groups and occupations.

3. Balanced diets for pregnant and nursing mother.
4. Formulation of low cost balanced diets from locally available cheap foods.
5. Feeding of infants—breast feeding vs. aritificial feeding. Infant wearing food.
6. Defective feeding of infants—as a cause of malnutrition.
7. Preparation of simple Therapeutic diets.

C. Nutrition for the Community :

1. The common deficiency diseases in India e.g., Protein-calorie malnutrition, Vitamin A malnutrition, anaemia goitre, etc.
2. Supplementary feeding for vulnerable groups.
3. Nutrition education for the community including cooking demonstrations.
4. Methods for survey of food consumption and food habits in families.
5. Current National Nutritional programmes in India.
6. Use of food value tables and calculation of nutritive value of the diet.

PRACTICAL

1. Practice using weights and measures.
2. Detection of carbohydrate, protein and fat in food.
3. Cooking of cereals in various ways and evaluation of results.
4. Milk and egg preparations.
5. Proper methods of cooking vegetables including green leafy vegetables.
6. Plan and prepare a day's diet for an average adult woman allowances for pregnant and nursing mother.
7. Preparation of nutritious snacks for school tiffin based on locally available cheap foods.
8. (a) Prepare a diet for a patient with fever.
   (b) Prepare a liquid diet to alleviate diarrhoea.
9. Carry out diet survey in family and interpret the results in terms of adequacy.
10. Prepare a meal for supplementary feeding programme.

বিষয়-সূচী

প্রথম পত্র

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

A. খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মূল ধারণা

(Basic concepts about food, nutrition & health)

1. আমরা পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ দেখিতে পাই। উহাদের মধ্যে কিছু কিছু আমরা খাদ্যরূপে গ্রহণ করি। আবার আমরা যে সকল দ্রব্য অখাদ্য বলিয়া পরিত্যাগ করি গরু, ছাগল ইত্যাদি জীব-জন্তু সে সকল বস্তু হইতে কিছু কিছু খাদ্যরূপে গ্রহণ করে। খড়, ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদি মানুষের খাদ্য নয় ; কিন্তু এই সকল দ্রব্য ঐ জীব-জন্তুর প্রধান খাদ্য। ঘাস, লতা-পাতা, খড় ইত্যাদি প্রধানতঃ সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ, এই সেলুলোজ মানুষ পরিপাক করিতে পারে না। এই-জন্য উহা মানুষের দেহের কোন উপকারে আসে না। কিন্তু গরু, ছাগল ইত্যাদি জীবজন্তু সেলুলোজ জীর্ণ করিয়া দেহের কাজে লাগাইতে পারে। এইজন্য উহা ঐ জাতীয় জীব-জন্তুর খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমরা সকলেই জানি যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহাকে উপযুক্ত খাদ্য না দিলে তাহার শরীর সঠিকরূপে বৃদ্ধি পায় না। অবশ্য শিশুর দেহের এই বৃদ্ধির কাজটি মাতৃগর্ভেই প্রথম শুরু হয়। যখন একটি কোষরূপে শিশু প্রথম মাতৃগর্ভে আবির্ভূত হয় তখন হইতেই উহার দৈহিক বৃদ্ধি চলিতে থাকে। একটি কোষ, প্রথমে দুইটি কোষে এবং দুইটি কোষ চারটি কোষে বিভক্ত হয়। এইরূপে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় শিশুর দেহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রায় ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত দেহের এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। দেহের এই বৃদ্ধির জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আবার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের দেহের ভিতরে ও বাহিরে অনবরত কাজ চলিতে থাকে। এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায়ও আমাদের হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী প্রভৃতি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি তাহাদের কাজ অব্যাহত রাখে। এই কাজের ফলে দেহ অর্থাৎ দেহের কোষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দেহের এই ক্ষয় পূরণের জন্যও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া কোন কাজ করিতে হইলে শক্তির প্রয়োজন হয়। রেলগাড়ী চালাইতে যে শক্তির প্রয়োজন তাহা প্রথমে কয়লা পোড়াইয়া তাপ আকারে পাওয়া যায়। এই তাপ পরে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আমাদের দেহের ভিতরের ও বাহিরের বিভিন্ন কাজের জন্যও শক্তির প্রয়োজন হয়। এই শক্তি আমরা খাদ্যদ্রব্য হইতেই তাপ আকারে পাইয়া থাকি। খাদ্য গ্রহণ না করিলে আমাদের কাজ করিবার উৎসাহ এবং শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। খাদ্যের অপর একটি কাজ দেহকে সুস্থ রাখা। স্কার্ভি, বেরিবেরি প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধের জন্য খাদ্যের ভাইটামিনের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য শরীরে দহন ক্রিয়ার ফলে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে, সেই দহন ক্রিয়ার জন্য 'বি'-ভাইটামিনের বিশেষ প্রয়োজন হয়। এই ভাইটামিনের অভাব হইলে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যের দহনে ব্যাঘাত ঘটে এবং শরীর অসুস্থ হয়।

সুতরাং যে সকল দ্রব্য খাইলে নিম্নলিখিত এক বা একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় তাহাকে খাদ্য বলে ঃ

(১) **শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন ;**

(২) **শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন ;**

(৩) **শরীরের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলি সুক্ষ্মভাবে পরিচালিত করিয়া শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা।**

দুগ্ধ খাদ্যের আদর্শ উদাহরণ। ইহার সাহায্যে উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। আবার পাতিলেবুকেও খাদ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ, ইহার ভাইটামিন-'সি' উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্যের তিন নম্বর উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে।

খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্যসমূহকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে —(১) দেহাভ্যন্তরে উহাদের কাজের প্রকারভেদে এবং (২) উহাদের উপাদান অনুযায়ী।

কাজের প্রকারভেদে খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ—খাদ্যদ্রব্য আমাদের দেহের প্রধানতঃ তিনটি প্রয়োজন সাধন করিয়া থাকে। এই প্রয়োজনানুসারে আমরা খাদ্যদ্রব্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—

(১) **ক্ষয়-পূরক এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধি-সহায়ক খাদ্য**

প্রোটিনই দেহের ক্ষয় পূরণ এবং বৃদ্ধি সাধনে প্রধানতঃ সহায়তা করিয়া থাকে। উপযুক্ত প্রোটিনের অভাবে দেহ রুগ্ন ও অপরিপুষ্ট হয়। ইহা ছাড়া খনিজ লবণসমূহও দেহ গঠনে সাহায্য করিয়া থাকে। এইজন্য যে সকল খাদ্যদ্রব্যে প্রোটিন ও খনিজ লবণ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহাদের ক্ষয়পূরক এবং পুষ্টি ও বৃদ্ধি-সহায়ক খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, বাদাম, সয়াবীন ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

(২) **তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য**

এক শ্রেণীর খাদ্য আমাদের দেহে প্রধানতঃ তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া উহাকে কর্মক্ষম রাখে। কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যই প্রধানতঃ দেহে তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। এইজন্য যে সকল খাদ্যে এই উপাদান দুইটি অধিক পরিমাণে থাকে তাহাদের তাপ ও শক্তি উৎপাদক খাদ্য বলে। চিনি, গুড়, ভাত, রুটি, মাখন, জেলী, ঘি, ময়দা, আটা ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

(৩) **দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী ও রোগ প্রতিরোধক খাদ্য**

আবার এমন খাদ্যও আছে যাহা আমাদের দেহের ক্ষয় পূরণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি কোন কাজেই আসে না। অথচ উহাদের অভাবে আমাদের দেহের স্বাভাবিক ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইতে পারে না এবং অচিরেই আমরা বেরিবেরি, স্কার্ভি ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়ি। খাদ্যের ভাইটামিনসমূহই প্রধানতঃ দেহের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদের এই সকল রোগের হাত হইতে রক্ষা করে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন খনিজ লবণ এবং জলও এই ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করে। সুতরাং ভাইটামিন ও

খনিজ লবণ যে সকল খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে তাহাদের প্রতিরোধক খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। সবুজ শাকসবজি, টমেটো, কমলালেবু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ফল, ডিম, দুধ ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য।

উপাদান অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ : উপাদান অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করাই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। প্রথমেই মনে রাখা ভাল যে অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই একাধিক উপাদান দেখিতে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র একটি উপাদানে গঠিত এমন খাদ্যদ্রব্যের সংখ্যা খুবই কম। চিনি, সরিষার তেল ইত্যাদি এই শ্রেণীর খাদ্য। প্রথমটি বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট এবং দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ স্নেহদ্রব্য। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, চাউল, আটা ইত্যাদি মিশ্র খাদ্য অর্থাৎ একাধিক খাদ্যোপাদান এই সকল খাদ্যে বর্তমান। সুতরাং খাদ্যকে উপাদান অনুযায়ী বিভক্ত করিবার মূল নীতিটি হইতেছে, যে খাদ্যে যে উপাদানটি সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান তাহাকে সেই উপাদানের খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রধানতঃ প্রোটিনবহুল এবং প্রোটিনের অভাব পূরণ করিবার জন্যই আমরা এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি। এইজন্য উহাদের প্রোটিনবহুল খাদ্য বলে। ভাত, আটা, ময়দা, রুটি, আলু ইত্যাদি খাদ্যের প্রধান অংশ কার্বোহাইড্রেট। এইজন্য উহারা কার্বোহাইড্রেটবহুল খাদ্য। এইরূপে উপাদান অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যসমূহ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) **প্রোটিনবহুল খাদ্য**, যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল (Pulses), সয়াবীন, বাদাম ইত্যাদি।

(২) **কার্বোহাইড্রেটবহুল খাদ্য**, যথা—চিনি, গুড়, বাতাসা, মিছরি, শরবত, মুড়ি, চিড়া, ভাত, রুটি, আটা, ময়দা, আলু, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদি।

(৩) **স্নেহবহুল খাদ্য**, যথা—তেল, ঘি, দালদা, মাখন, চর্বি ইত্যাদি।

(৪) **ভাইটামিন ও খনিজলবণবহুল খাদ্য**, যথা—সবুজ শাকসবজি, বিভিন্ন প্রকারের ফল, তরিতরকারি ইত্যাদি।

কোন কোন খাদ্যে আবার একাধিক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। ইলিশ মাছ এই শ্রেণীর খাদ্যের উদাহরণ। ইহাতে প্রোটিন ছাড়াও যথেষ্ট স্নেহপদার্থ এবং ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' পাওয়া যায়। দুধ ক্যালসিয়াম খনিজ লবণের অতি উৎকৃষ্ট উৎস। ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতিতে ফসফরাস খনিজ লবণ এবং ডালে ভাইটামিন 'বি' বেশ পাওয়া যায়। সুতরাং এই সকল খাদ্য একাধিক শ্রেণীভুক্ত করা যায়।

পুষ্টি (Nutrition) : শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে খাদ্য-দ্রব্য বয়স ও শ্রমের তারতম্য অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। যদি প্রয়োজনের তুলনায় খাদ্যের উপাদানগুলির মোট পরিমাণ কম হয় তবে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পাইবে। এই অবস্থাকে পুষ্টির অভাব বা subnutrition বলে। শুধু পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলে না, খাদ্যের উপাদানগুলি যাহাতে সঠিক অনুপাতে খাদ্যে বর্তমান থাকে সেইদিকেও দৃষ্টি রাখিতে

হয়। যদি খাদ্যে কোন এক বা একাধিক উপাদানের অভাব বা হ্রাস ঘটে তাহা হইলেও শরীর অসুস্থ হইবে। এই অবস্থাকে অসম খাদ্যজনিত পুষ্টির অভাব বা malnutrition বলে। আবার শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যদি উপাদানগুলি খাদ্যের সহিত গ্রহণ করা হয়, তবে অতিরিক্ত উপাদানগুলি শরীরে স্নেহ পদার্থরূপে জমা হইতে থাকিবে। শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় পদার্থ এইভাবে জমিতে থাকিলে শরীর অত্যধিক মোটা হইবে এবং দেহের ওজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থাকে obesity বলে।

সুতরাং খাদ্যের উপাদান কি এবং শরীর সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে খাদ্যে উহাদের কি অনুপাতে থাকা প্রয়োজন এবং খাদ্যে উহাদের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে কি কি কুফল হয়, ইহাই পুষ্টি বা Nutrition শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

স্বাস্থ্য (Health)—আমরা অনেক সময় লোকের বাইরের দিকটি দেখিয়াই স্বাস্থ্য বিচার করি। একটি মোটা-সোটা, সুন্দর পুরুষ দেখিলে আমরা স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ বলিয়া মনে করি। আবার একজন রোগা, লিকলিকে শরীরের লোক দেখিলে তাহাকে স্বাস্থ্যহীন বলিয়া মনে করি। আসলে কিন্তু বাইরের দিকটা দেখিয়াই স্বাস্থ্য বিচার করা চলে না। একজন তথাকথিত স্বাস্থ্যবান যুবক হয়ত কয়েক মিনিট হাঁটিয়াই হাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহার বুক ধড়ফড় করে বা শ্বাসকষ্ট হয়। আবার একজন রোগা লোক হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটিয়াও ক্লান্ত হয় না। স্বাস্থ্যবান লোকের পরিশ্রম করিবার শক্তি থাকে। অল্পতেই হাঁপাইয়া পড়িলে তাহাকে স্বাস্থ্যবান বলা চলে না। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির যেমন দেহে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ থাকে তেমনি মনেও আনন্দ, স্ফূর্তি থাকে। একটি স্বাস্থ্যবান লোকের মধ্যে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি দেখা যাইবে।

(১) বয়স অনুযায়ী তাহার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যথাযথ বৃদ্ধি হইবে এবং ওজন ঠিক থাকিবে।

(২) দেহে কোন রকম অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ থাকিবে না। শরীরে শক্তি, কাজে উৎসাহ এবং মনে আনন্দ থাকিবে।

(৩) রোগ প্রতিরোধের স্বাভাবিক শক্তি থাকিবে। অতি সহজেই রোগে আক্রান্ত হইবে না।

2. **স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের কাজ** (Role of food in the maintenance of good health) ঃ আমরা খাদ্য খাই কেন এবং খাদ্য আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় কি ভাবে সাহায্য করে তাহা প্রথমেই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে খাদ্য নিম্নলিখিত তিন ভাবে কাজ করিয়া থাকে।

(১) **দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঃ** জন্ম হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত আমাদের দেহের বৃদ্ধি চলিতে থাকে। এই বৃদ্ধির জন্য প্রধানতঃ প্রোটিন ও খনিজ পদার্থ জাতীয় খাদ্যই বিশেষরূপে প্রয়োজন হয়। প্রত্যেকটি কোষের মূল উপাদান প্রোটিন। এইজন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হইলে শরীর রোগা ও অপুষ্ট থাকে এবং মস্তিষ্কের অপরিপুষ্টির জন্য লেখা-পড়া, বুদ্ধি ইত্যাদি কম হয়। ফসফরাস ও ক্যালসিয়াম এই দুইটি খনিজ লবণ হাড়ের প্রধান উপাদান। খাদ্যে এই দুইটির অভাব হইলে হাড় দুর্বল হয় এবং রিকেট ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হয়।

(২) তাপ ও শক্তি উৎপাদন ঃ কোন কোন খাদ্যদ্রব্য যেমন কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট বা চর্বিজাতীয় খাদ্য আমাদের দেহে জ্বালানী কাঠের ন্যায় কাজ করিয়া তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে। তাই তাপ ও শক্তি আমাদের কর্মদক্ষতা জোগায়। এই শ্রেণীর খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল হয় এবং কাজের সামর্থ্য হ্রাস পায় ও দিনে দিনে শরীর ক্ষয় হইয়া ওজন কমিতে থাকে। আবার এক শ্রেণীর চর্বি জাতীয় খাদ্যের অভাবে দেহে চর্ম-রোগের সৃষ্টি হয়। এইগুলি উদ্ভিজ্জ তৈলের অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত।

(৩) দেহের অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপগুলি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখা ঃ এই কাজের জন্য প্রধানতঃ ভাইটামিন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ভাইটামিনের অভাবে রাত-কানা রোগ, বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেট প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয় ; এমন কি প্রজনন শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। তাছাড়া ভাইটামিনের অভাবে স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পায়। ফলে অতি সহজেই শরীর সর্দি, কাশি ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের দহনের জন্য ভাইটামিন '$বি_1$' ও '$বি_2$' প্রয়োজন হয়। এই ভাইটামিনের অভাব হইলে কার্বোহাইড্রেট দহনের বিঘ্ন ঘটে। ফলে শরীর দুর্বল হয় এবং কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। সুস্থ শরীরের যে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ তা বজায় রাখিতে ভাইটামিন জাতীয় খাদ্য সাহায্য করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

B. খাদ্যের উপাদান এবং পুষ্টিসাধন পদ্ধতি

(Nutrients & nutritive processes)

1. **খাদ্যের উপাদান ও যেসব খাদ্যে পাওয়া যায়** (Nutrients in food and the foods supplying them) ঃ ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহা প্রধানতঃ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই শ্বেতসার শরীরের মধ্যে দহনের সাহায্যে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে বলিয়া ভাতকে আমরা খাদ্য হিসাবে গণ্য করিয়া থাকি। খাদ্যের যে বস্তুর জন্য উহাকে খাদ্য বলা হয়, সেই বস্তুকে উহার উপাদান (Nutrient) বলে। শ্বেতসার ভাতের প্রধান উপাদান। কোন দ্রব্যের খাদ্য-মূল্য (Food value) উহার উপাদানের প্রকার এবং প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ছয়টি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

(১) প্রোটিন (Proteins); (২) কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates); (৩) স্নেহপদার্থ (Fat); (৪) বিভিন্ন খনিজ লবণ (Mineral substances); (৫) ভাইটামিন (Vitamins); (৬) জল।

এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় উপাদান আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশ বলিয়া উহাদের Proximate Principle বা প্রধান উপাদান বলে। শেষোক্ত উপাদান দুইটি অর্থাৎ লবণ ও ভাইটামিন পরিমাণে অল্প থাকে বলিয়া উহাদের Accessory Food Factors বা আনুষঙ্গিক উপাদান বলে।

খাদ্যের উপাদানগুলির কার্যকারিতা ঃ খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে **প্রোটিনকে** (১) দেহসংগঠক এবং (২) দেহ **সংরক্ষক** খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। আমাদের দেহ প্রধানতঃ অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে গঠিত। বিভিন্ন প্রোটিনই আবার এই সকল জীবকোষের প্রধান উপাদান। গৃহনির্মাণে যেমন ইটই প্রধান উপকরণ, তেমনি দেহ নির্মাণে বিভিন্ন প্রোটিনগুলিই প্রধান উপাদান। এজন্যই প্রোটিনকে দেহনির্মাণের ইট (body building bricks) স্বরূপ বলা হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য শরীরের কোষগুলি ক্ষয়-প্রাপ্ত হইলে প্রোটিন এই ক্ষয় পূরণ করিয়া থাকে। পঁচিশ বৎসরের পরে সাধারণতঃ জীবদেহের কোন বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু তাহার পর মৃত্যু পর্যন্ত জীবকোষগুলির ক্ষয়ক্রিয়া চলিতে থাকে। প্রোটিনই এই ক্ষয় পূরণ করিয়া মানুষকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। উপযুক্ত প্রোটিনের অভাব হইলে ক্রমান্বয়ে এই ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে মৃত্যুও ঘটিতে পারে। (৩) কখনও কখনও **প্রোটিন শরীরে তাপশক্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে।**

লবণও (Mineral substances) **প্রোটিনের ন্যায় শরীর গঠনে** সহায়তা করে। **ক্যালসিয়াম** (Calcium) এবং **ফসফরাস** (Phosphorus) দেহের অস্থি গঠনে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত **শরীর সংরক্ষণেও** উহাদের দান কম নহে। শরীরে

রক্তাল্পতা (anaemia) ঘটিলে লৌহ জাতীয় লবণ তাহা দূর করিয়া শরীরকে রক্ষা করে। শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করাও ইহাদের একটি বিশেষ কাজ। আয়োডিনের (Iodine) পরিমাণ খাদ্যে কম হইলে 'গলগণ্ড' রোগ হয়। কারণ, এই লবণের অভাবে থাইরক্সিন (Thyroxine) নামক হরমোনের (Hormon) স্বাভাবিক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। খাদ্যে সামান্য পরিমাণ সোডিয়াম আয়োডাইড (Sodium Iodide) মিশাইয়া দিলে 'গলগণ্ড' দূর হইয়া যায়।

খাদ্যে অন্য দুইটি উপাদান কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থ প্রধানতঃ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিয়া শরীরকে কর্মক্ষম রাখে। উহারা শরীরে জ্বালানি কাঠের ন্যায় কাজ করে বলিয়া উহাদের 'Fuel Foods' বা 'জ্বালানি খাদ্য' বলা হয়। ভাইটামিনসমূহ (Vitamins) শরীর গঠন বা তাপ ও শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে না। উহারা অন্যান্য উপাদানগুলির অর্থাৎ প্রোটিন, শ্বেতসার ও স্নেহজাতীয় পদার্থের ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া শরীরকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম রাখে এবং দেহে শক্তি সরবরাহ করে।

খাদ্যে উপাদানসমূহের কম বা বেশী হইবার ফল : শরীরকে সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে হইলে খাদ্যে উপরোক্ত ছয়টি উপাদানই বয়স ও শারীরিক পরিশ্রম অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকা প্রয়োজন। যদি খাদ্যে উপাদানগুলির মোট পরিমাণ (total quantity) এই নির্দিষ্ট পরিমাণের তুলনায় কম হয়, তবে শরীর দুর্বল হইয়া পড়িবে এবং কর্মক্ষমতা কমিয়া যাইবে। এই অবস্থাকে পুষ্টির অভাব বা অপুষ্টি (under nutrition) বলা হয়।

খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানগুলির মোট পরিমাণ ঠিক রাখিলেই চলিবে না। এই উপাদানগুলিকে আবার নিজেদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রাখিয়া চলিতে হইবে। যদি খাদ্যে কোন এক বা একাধিক উপাদানের অভাব বা হ্রাস ঘটে তাহা হইলেও শরীর অসুস্থ হইবে। এই অবস্থাকে অসমখাদ্যজনিত পুষ্টির অভাব বা malnutrition বলে।

আবার শরীরের প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে যদি উপাদানগুলি খাদ্যের সহিত গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত উপাদানগুলি শরীরের মধ্যে জমা হইতে থাকিবে। শ্বেতসার এবং স্নেহজাতীয় পদার্থ এইভাবে জমিতে থাকিলে শরীর অত্যধিক মোটা হইবে এবং দেহের ওজন অত্যধিক বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থাকে obesity বলে।

খাদ্য হইতে এই সকল উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে কোন্ কোন্ খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন তাহা খাদ্যের শ্রেণীবিভাগে আলোচিত হইয়াছে। যেমন প্রোটিনের জন্য প্রোটিনজাতীয় খাদ্য—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি ; কার্বোহাইড্রেটের জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য—ভাত, মুড়ি, চিড়া, খৈ, রুটি, আটা, ময়দা, আলু, চিনি, গুড় ইত্যাদি ; স্নেহ বা ফ্যাটের জন্য স্নেহজাতীয় খাদ্য—তেল, ঘি, মাখন, বনস্পতি ইত্যাদি এবং খনিজ লবণ ও ভাইটামিনের জন্য ঐ শ্রেণীর খাদ্য—শাক্-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি খাওয়া প্রয়োজন।

2. খাদ্যকে দেহের কাজে লাগান : পাচনতন্ত্র, পরিপাক ও মেটাবলিজম : (Utilization of food by the body : digestion, absorption and metabolism)

পাচনতন্ত্র ও পরিপাক ক্রিয়া (Digestive system and digestion) : বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি দ্রব্যই (যেমন গ্লুকোজ, খনিজ লবণ ইত্যাদি) দেহ সরাসরি গ্রহণ করিয়া আপন কাজে লাগাইতে পারে। অবশিষ্ট অধিকাংশ খাদ্য-দ্রব্যই যতক্ষণ না ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয় ততক্ষণ শরীরের কোন্ কাজে লাগে না। ভাতের প্রধান অংশ শ্বেতসার। কিন্তু এই শ্বেতসার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া যতক্ষণ না গ্লুকোজে পরিণত হইতেছে ততক্ষণ শরীরের কোন উপকারে আসিবে না। শ্বেতসার গ্লুকোজে পরিণত হইলেই দেহ ঐ গ্লুকোজ শোষণ করিয়া উহা হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডে এবং স্নেহ-পদার্থ ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হইলেই ঐ সকল উপাদান দেহের উপকারে আসিবে।

খাদ্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহের গ্রহণোপযোগী অবস্থায় পরিণত হওয়াকেই পাচন ক্রিয়া বা পরিপাক ক্রিয়া বলে। খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া দেহের যে অংশে সম্পন্ন হয় তাহাকে **পাচনতন্ত্র** (Digestive system) বলে। মুখ-গহ্বর (mouth), অন্ন-নালী (oesophagus), পাকস্থলী (stomach), ক্ষুদ্রান্ত্র (small intestine) এবং বৃহদন্ত্র (large intestine) যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় লইয়া এই পাচনতন্ত্র সংগঠিত। খাদ্য-দ্রব্য পাচনতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভাবে পরিবর্তিত হইয়া অবশেষে রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া দেহের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

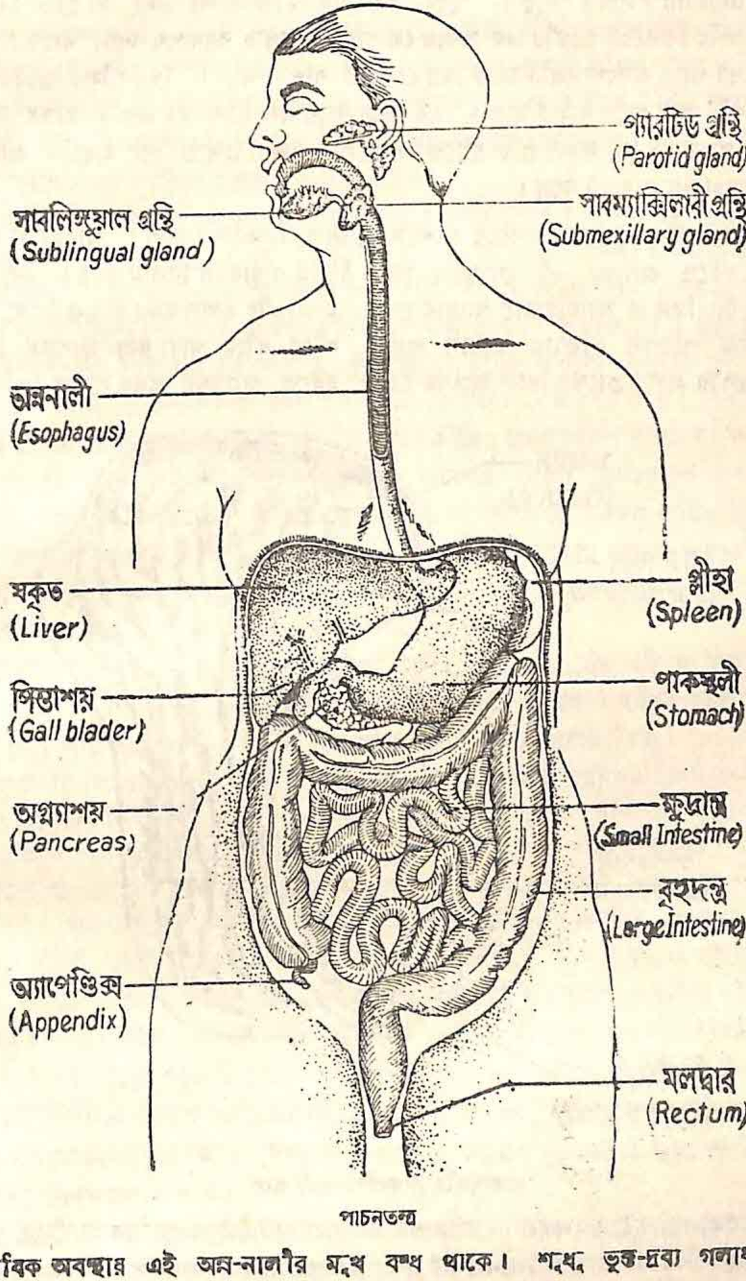
মুখ গহ্বরে পরিপাক : আমাদের মুখে সর্বদাই লালা নিঃসৃত হইতেছে। এই লালা প্যারটিড (parotid), সাব-লিংগুয়াল (sublingual) এবং সাব-ম্যাক্সিলারি (sub-maxillary) নামক তিনটি বিভিন্ন গ্রন্থি হইতে আসে। ইহার বেশীর ভাগই জল। এই জল ছাড়াও অ্যামাইলেস বা টায়ালিন (amylase or ptyalin) নামক এক প্রকার জারক পদার্থ (enzyme), মিউসিন এবং কিছু খনিজ লবণ এই লালার মধ্যে পাওয়া যায়।

ইহা সাধারণতঃ মৃদু ক্ষারধর্মী। দৈনিক প্রায় 1000 সি. সি. হইতে 1500 সি.সি. লালা একজন ব্যক্তির মুখে নিঃসৃত হয়।

লালা আমাদের খাদ্য-দ্রব্যকে সিক্ত ও নরম করে। ইহার মিউসিন ভুক্ত-দ্রব্যকে পিচ্ছিল করিয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া পাকস্থলীতে পেঁছাইতে সাহায্য করে। অ্যামাইলেস বা টায়ালিন খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় পদার্থকে ভাঙ্গিয়া মলটোজ-এ (maltose) পরিণত করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক ক্রিয়া মুখ-গহ্বরেই প্রথম শুরু হয়। শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ যাহাতে উত্তমরূপে টায়ালিনের সহিত মিশ্রিত হইতে পারে সেইজন্য খাদ্য-দ্রব্য ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ ধরিয়া চর্বণ করা প্রয়োজন। অতি অল্প সময় খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বরে থাকে বলিয়া সামান্য পরিমাণ শ্বেতসার মলটোজে পরিণত হয়। কাঁচা শ্বেতসার (uncooked) জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের মুখে কোন পরিবর্তন হয় না।

পাকস্থলীতে পরিপাক ঃ মুখ-গহ্বর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত খাদ্য দ্রব্যসমূহ লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া অন্ন-নালীর মধ্য দিয়া আমাশয় বা পাকস্থলীর মধ্যে পেঁছে। অন্ন-নালী মুখ-গহ্বর হইতে শ্বাসনালীর পিছন দিক দিয়া বরাবর নিচে নামিয়া গিয়াছে।

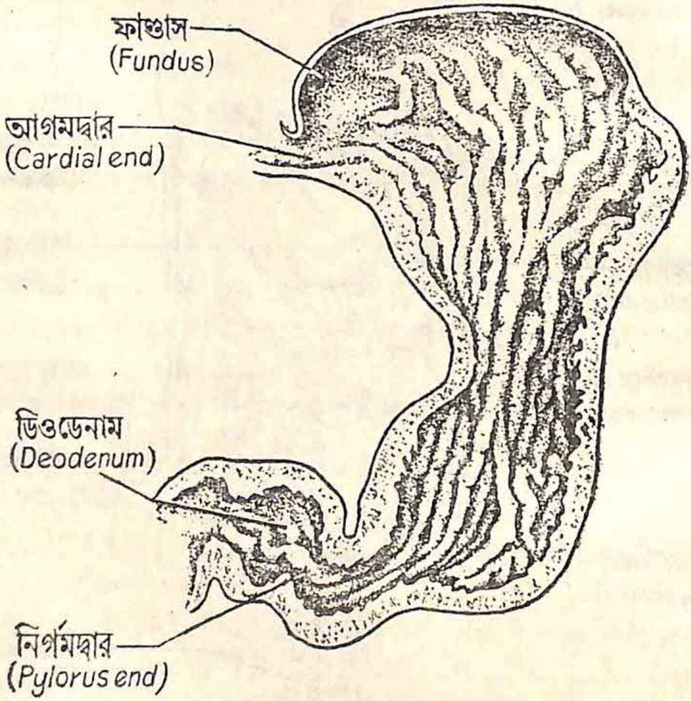


পাচনতন্ত্র

স্বাভাবিক অবস্থায় এই অন্ন-নালীর মুখ বন্ধ থাকে। শুধু ভুক্ত-দ্রব্য গলাধঃকরণ

করিবার সময়ই উহা খুলিয়া যায়। দৈর্ঘ্যে উহা প্রায় পাঁচ ইঞ্চি। অন্ন-নালীর শেষ প্রান্ত হইতে পাকস্থলী আরম্ভ হইয়াছে এবং এই সংযোগস্থলকে আগমদ্বার (cardiac end) বলে। পাকস্থলীর শেষপ্রান্ত নির্গমদ্বার (Pylorus end) দ্বারা ডিওডেনামের (deodenum) সহিত যুক্ত। ইহা প্রায় 12 ইঞ্চি লম্বা এবং 5 ইঞ্চি চওড়া। পাকস্থলীর ভিতরের প্রাচীর এক প্রকার শ্লৈষ্মিক পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে। এই আবরণের গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। ছিদ্রগুলির প্রত্যেকটিই এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলের মুখ। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নলগুলি এক একটি গ্রন্থির সহিত সংযুক্ত থাকে। এই সকল গ্রন্থি হইতে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয় যাহাকে আমাশয় রস (gastric juice) বলে।

পাকস্থলীর একেবারে উপরের অংশকে ফাণ্ডাস (fundus) বলে। খাদ্য-দ্রব্য মুখ-গহ্বর হইতে আসিয়া এই ফাণ্ডাসে প্রায় $\frac{1}{2}$—2 ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করে। এই সময় লালার টায়ালিন বা অ্যামাইলেস খাদ্যের শ্বেতসার জাতীয় উপাদানের আরও কিছু অংশ মলটোজে পরিণত করিবার সুযোগ পায়। ধীরে ধীরে খাদ্য-দ্রব্য ফাণ্ডাস হইতে পাকস্থলীর অপর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে আমাশয় রসের সহিত (gastric



পাকস্থলীর লম্বালম্বি কাটা অংশ

juice) মিশ্রিত হইতে থাকে। আমাশয় রস প্রধানতঃ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, প্রো-রেনিন (pro-renin), পেপসিনোজেন (pepsinogen) এবং লাইপেজ (lipase) দ্বারা

গঠিত। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন ও পেপসিন উৎপন্ন করে। রেনিন, পেপসিন এবং লাইপেজ এই তিনটি আমাশয় রসের জারক পদার্থ (enzyme)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের জন্য আমাশয় রসটি তীব্র আম্লিক (acidic)। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (১) খাদ্যের প্রোটিন নরম করিয়া পরিপাকে সহায়তা করে। (২) ইহার সাহায্যে প্রো-রেনিন এবং পেপসিনোজেন হইতে যথাক্রমে রেনিন এবং পেপসিন উৎপন্ন হয়। (৩) খাদ্য-দ্রব্যের সহিত কোন দূষিত জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ করিলে ইহা ঐ জীবাণু তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহা ছাড়া (৪) নির্গমদ্বার (pylorus end) খুলিতে এবং (৫) খাদ্যের লৌহ জাতীয় পদার্থ শোষণেও এই অ্যাসিড সহায়তা করিয়া থাকে।

পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য কতক্ষণ অবস্থান করিবে তাহা উহার পরিমাণ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। তরল খাদ্যদ্রব্য 15 মিনিট হইতে আধঘণ্টার বেশী অবস্থান করে না। এইজন্যই তরল খাদ্য-দ্রব্যে আমাদের তাড়াতাড়ি ক্ষুধার উদ্রেক হয়। স্নেহজাতীয় খাদ্য-দ্রব্য সর্বাপেক্ষা বেশী সময় পাকস্থলীতে অবস্থান করে। সাধারণতঃ 4 হইতে 5 ঘণ্টা কাল খাদ্য-দ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে পেপসিন খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রোটিয়োজ (proteoses) এবং পেপটোন (peptone) উৎপন্ন করে। রেনিন দ্বারা দুধ ছানায় পরিণত হয়। লাইপেজ ডিম এবং ক্রীমের স্নেহপদার্থের সামান্য কিছু ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) এবং গ্লিসারলে পরিণত করে। অধিকাংশ স্নেহ-পদার্থেরই পাকস্থলীতে কোন পরিবর্তন হয় না। এইভাবে বিভিন্ন জারক রসের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য ক্রমাগত পরিবর্তিত হইয়া সর্বশেষে একটি পাতলা মণ্ডের (chyme) আকার ধারণ করে। এই মণ্ড ধীরে ধীরে পাকস্থলীর পেশীর সংকোচন এবং বিস্তারের ফলে নির্গমদ্বার দিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে (small intestine) প্রবেশ করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক ঃ খাদ্যের সর্বাপেক্ষা বেশী পরিবর্তন হয় এই ক্ষুদ্রান্ত্রে। প্রায় 5 ঘণ্টাকাল খাদ্য-দ্রব্য এই ক্ষুদ্রান্ত্রে অবস্থান করে। কোন ব্যক্তির স্বাভাবিক অবস্থায় মোট পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে প্রায় 9 ঘণ্টা সময় প্রয়োজন হয়।

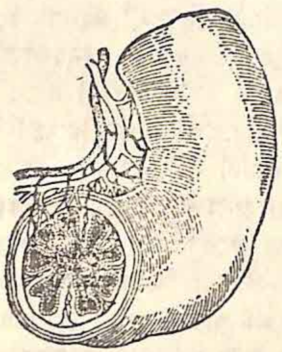
পাকস্থলীর পিছনের দিকে প্রায় 6 ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি অগ্ন্যাশয় (pancreas) আছে। ইহা একটি ক্ষুদ্র নলের দ্বারা ক্ষুদ্রান্ত্রের সহিত যুক্ত। খাদ্য-দ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিলে এই অগ্ন্যাশয় হইতে এক প্রকার ক্লোম রস (pancreatic juice) বাহির হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই ক্লোম রসে অ্যামাইলোপসিন (amylopsin), স্টিয়াপসিন (steapsin), ট্রিপসিন (trypsin) এবং কাইমো-ট্রিপসিন (chymo-trypsin) নামক প্রধান প্রধান চারটি জারক পদার্থ থাকে। ট্রিপসিন এবং কাইমো-ট্রিপসিন প্রথমে ট্রিপসিনোজেন এবং কাইমোট্রিপসিনোজেন আকারেই অগ্ন্যাশয় হইতে নির্গত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে এন্টারোকাইনেস (enterokinase) নামক এক প্রকার পদার্থ নিঃসৃত হয়। ইহা ট্রিপসিনোজেন হইতে ট্রিপসিন উৎপন্ন করে। এই ট্রিপসিন আবার কাইমোট্রিপসিনোজেন হইতে কাইমোট্রিপসিন প্রস্তুত করে। এই ক্লোম রস ক্ষারধর্মী (basic)। উহা খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব প্রশমিত করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে।

অ্যামাইলোপসিন খাদ্যের অবশিষ্ট শ্বেতসার মলটোজে (maltose) পরিণত করে। ইহা কাঁচা (uncooked) শ্বেতসার হইতেও মলটোজ উৎপন্ন করিতে পারে। স্টিয়াপসিন

স্নেহপদার্থ হইতে গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড (fatty acid) উৎপন্ন করে। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই তাহা এইখানে ট্রিপসিন এবং কাইমোট্রিপসিন দ্বারা প্রধানতঃ প্রোটিয়োজ (proteoses) এবং পেপটোনে (peptone) পরিণত হয়।

ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজে যকৃত (liver) সহায়তা করে। যকৃত হইতে পিত্তরস (bile) উৎপন্ন হইয়া পিত্তাশয়ে (gall bladder) সঞ্চিত হয়। একটি ক্ষুদ্র নলের সাহায্যে এই পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবাহিত হয়। ইহা স্নেহপদার্থ পরিপাকে সহায়তা করে।

ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে একপ্রকার রস নির্গত হয়। এই রসকে সাক্কাস এনটেরিকাস (succus entericus) বলে। এই রসে ইরেপসিন (erepsin), সুক্রেজ (sucrase), মলটেজ (maltase) এবং ল্যাক্টেজ (lactase) নামক চারিটি জারক পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া এনটারোকাইনেস (enterokinase) নামক আরও একটি পদার্থ এই রসে দেখিতে পাওয়া যায়।



ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙ্গুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ দেখিতে পাওয়া যায়

ইরেপসিন প্রোটিয়োজ (proteose) এবং পেপটোন (peptone) ভাঙ্গিয়া অ্যামিনো অ্যাসিড (amino acids) প্রস্তুত করে। সুক্রেজ খাদ্যের ইক্ষু শর্করা (cane sugar) হইতে গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ (fructose) উৎপন্ন করে। মলটেজ এবং ল্যাক্টেজ যথাক্রমে মলটোজ (maltose) এবং দুগ্ধ শর্করা (lactose) ভাঙ্গিয়া প্রথমটি গ্লুকোজ এবং শেষেরটি গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ (galactose) প্রস্তুত করে।

এইরূপে ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হয়।

পরিপাক প্রাপ্ত হইবার পর খাদ্যদ্রব্যসমূহ রক্তের মধ্যে শোষিত হয়। এই শোষিত হইবার কাজটুকু প্রায় সম্পূর্ণরূপেই এই ক্ষুদ্রান্ত্রে হইয়া থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙ্গুলের ন্যায় একপ্রকার অভিক্ষেপ (projections) দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল অভিক্ষেপ সমূহকে ভিলাই (villi) বলে। ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্তবহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য রক্তের মধ্যে শোষিত হইয়া প্রথমে পোর্টাল শিরাদ্বারা যকৃতে ও পরে শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিচালিত হয়।

বৃহদন্ত্রের কাজঃ ক্ষুদ্রান্ত্র হইতে ভুক্তদ্রব্যের অবশিষ্টাংশ বৃহদন্ত্রে পরিচালিত হয়। বৃহদন্ত্র হইতে প্রধানতঃ খাদ্যের জলীয় অংশটুকু দেহে শোষিত হইয়া বাকী অংশ মলে পরিণত হয়। এই মল প্রতি 24 ঘণ্টা অন্তর দেহ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া কর্তব্য। শাক-সবজি ও তরিতরকারির দুষ্পাচ্য সেলুলোজ পেশীর সংকোচনের সৃষ্টি করিয়া বৃহদন্ত্র হইতে এই মল নিষ্কাশিত করিতে সহায়তা করে। এইজন্যই খাদ্য-দ্রব্যে পরিমিত সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ থাকা উচিত।

প্রোটিনের পরিপাক

খাদ্যের প্রোটিন সরাসরিভাবে আমাদের দেহ গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রোটিন ভাঙ্গিয়া যখন অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় তখনই উহা শরীরের কাজে লাগে। পাচনতন্ত্রের সাহায্যে খাদ্যের প্রোটিনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিনো অ্যাসিডে বিভক্ত হওয়াকেই প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া (Protein digestion) বলে।

প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়া প্রথমে পাকস্থলীতেই শুরু হয়। পাকস্থলীর গাত্র হইতে নিঃসৃত **আমাশয় রসে** (gastric juice) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এবং পেপসিনোজেন থাকে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড পেপসিনোজেন হইতে পেপসিন উৎপন্ন করে। তাছাড়া এই অ্যাসিডের সংস্পর্শে প্রোটিন কিছুটা নরম হয়। এই নরম প্রোটিন **পেপসিন** এনজাইমের সহায়তায় **প্রোটিয়োজ** (Proteoses) এবং **পেপটোনে** (Peptone) পরিণত হয়। সাধারণতঃ 4 হইতে 5 ঘণ্টাকাল খাদ্যদ্রব্য পাকস্থলীতে থাকে। ইহার পর খাদ্যদ্রব্য ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্র একটি সরু নলের দ্বারা অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) সহিত যুক্ত। অগ্ন্যাশয় হইতে **ক্লোম রস** (pancreatic juice) ঐ সরু নলের সাহায্যে ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্লোম রসটি ক্ষার জাতীয়, সুতরাং, ইহা পাকস্থলী হইতে আগত খাদ্য-দ্রব্যের আম্লিক (acidic) ভাব দূর করিয়া মৃদু ক্ষারত্ব প্রদান করে। ক্লোম রসের ট্রিপসিনোজেন ও কাইমোট্রিপসিনোজেন ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক আবরণ হইতে নিঃসৃত এনটারোকাইনেসের (enterokinase) সহায়তায় যথাক্রমে ট্রিপসিন (trypsin) ও কাইমোট্রিপসিনে (chymo-trypsin) পরিণত হয়। যে সকল প্রোটিনের পাকস্থলীতে কোনরূপ পরিবর্তন হয় নাই, সেই সকল প্রোটিন এখানে **ট্রিপসিন ও কাইমোট্রিপসিন** এই দুইটি এনজাইমের সাহায্যে **প্রোটিয়োজ ও পেপটোনে** রূপান্তরিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র হইতে **সাক্কাস এনটেরিকাস** (succus entericus) নামক একটি রস নিঃসৃত হয়। এই রসে **ইরেপ্সিন** (erepsine) নামক একটি এনজাইম থাকে। এই এনজাইম উৎপন্ন প্রোটিয়োজ ও পেপটোন ভাঙ্গিয়া **অ্যামিনো অ্যাসিড** (amino-acid) উৎপন্ন করে। এইরূপে প্রোটিনের পরিপাক ক্রিয়া পাকস্থলীতে আরম্ভ হইয়া ক্ষুদ্রান্ত্রে আসিয়া সম্পূর্ণ হয়।

পরিপাক ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ ক্ষুদ্রান্ত্রেই শোষণ ক্রিয়া (absorption) আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঙ্গুলের ন্যায় অভিক্ষেপ (projections) দেখা যায়। এই সকল অভিক্ষেপসমূহকে ভিলাই (villi) বলে। (১২ পৃষ্ঠার চিত্র দেখ।) ভিলাইয়ের মধ্যে অসংখ্য কৈশিক রক্ত বহানলী (capillary blood vessels) আছে। ইহাদের সাহায্যেই পরিপাকপ্রাপ্ত অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ শোষিত হইয়া পোর্টাল শিরার মাধ্যমে যকৃতে পরিচালিত হয়। এই যকৃত হইতে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পরে শরীরের বিভিন্ন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়।

প্রোটিন পরিপাকে যে সকল এন্‌জাইম অংশ গ্রহণ করে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে সংক্ষেপে দেওয়া হইল ঃ

এন্‌জাইম	উৎপত্তিস্থল	যাহার উপর ক্রিয়া করে	খাদ্যের পরিণতি
(১) পেপসিন	পাকস্থলী	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ ও পেপটোন
(২) ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ ও পেপটোন
(৩) কাইমো-ট্রিপসিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ ও পেপটোন
(৪) ইরেপসিন	ক্ষুদ্রান্ত্র	প্রোটিয়োজ ও পেপটোন	অ্যামিনো অ্যাসিড

স্নেহপদার্থের পরিপাক ঃ

এনজাইম	উৎপত্তিস্থল	যাহার উপর ক্রিয়া করে	খাদ্যের পরিণতি
—	মুখগহ্বর	স্নেহপদার্থ	স্নেহপদার্থ
গ্যাসট্রিক লাইপেজ	পাকস্থলী	স্নেহপদার্থ	গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ	অগ্ন্যাশয়	স্নেহপদার্থ	ঐ
ফসফোলাইপেজ	অগ্ন্যাশয়	ফসফোলিপিড (লেসিথিন)	ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল + কোলিন + অজৈব ফসফেট
কোলেস্টেরল এস্টারেজ	অগ্ন্যাশয়	কোলেস্টেরল	কোলেস্টেরল + ফ্যাটি অ্যাসিড
লাইপেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	স্নেহদ্রব্য	গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড

বিশোষণ ঃ খাদ্যের ট্রাইগ্লিসারাইড, লাইপেজ এনজাইমের প্রভাবে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে উৎপন্ন গ্লিসারল অন্ত্রে বিশোষিত হয় এবং রক্তে প্রবেশ করে। অবশিষ্ট ট্রাইগ্লিসারাইডের কিছু অংশ বিশ্লিষ্ট হইয়া মনো ও ডাই-গ্লিসারাইড উৎপন্ন করে এবং তাহা পিত্তলবণ, ফ্যাটি অ্যাসিড ও অপরিবর্তিত ট্রাইগ্লিসারাইডের সহিত যুক্ত হইয়া অতি ক্ষুদ্র স্নেহকণিকা গঠন করে এবং আন্ত্রিক কোষের সংস্পর্শে আসিয়া পিত্তলবণ বিযুক্ত হয় এবং বাকী উপাদানগুলি কোষে প্রবেশ করে এবং কোষের মধ্যে যে লাইপেজ থাকে তাহা মিশ্রণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করে। এই গ্লিসারল ATP ও গ্লিসারোকাইনেজ এনজাইমের দ্বারা পুনরায় ট্রাই গ্লিসারাইড তৈরি করে। মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বনসংখ্যা ১০এর কম হইলে তাহা সরাসরি পোর্টাল শিরায় প্রবেশ করে।

কার্বোহাইড্রেটের পরিপাক ঃ

এনজাইম	উৎপত্তিস্থল	যাহার উপর ক্রিয়া করে	খাদ্যের পরিণতি
টায়ালিন	মুখগহ্বর	পরিপক্ব শ্বেতসার	এরিথ্রোডেক্সট্রিন + মলটোজ
টায়ালিন	"	এরিথ্রোডেক্সট্রিন	অ্যাক্রোডেক্সট্রিন + মলটোজ
টায়ালিন	"	অ্যাক্রোডেক্সট্রিন	মলটোজ + আইসোমলটোজ

সুক্রোজের সঙ্গে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ার ফলে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি হয়। পাকস্থলীতে কার্বোহাইড্রেট ভাঙার কোন এনজাইম নাই।

এনজাইম	উৎপত্তিস্থল	যাহার উপর ক্রিয়া করে	খাদ্যের পরিণতি
অ্যামাইলোপসিন (টায়ালিন)	অগ্ন্যাশয়	শ্বেতসার	মলটোজ + আইসোমলটোজ
সুক্রেজ	ক্ষুদ্রান্ত্র	সুক্রোজ	গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ
ল্যাক্টেজ	"	ল্যাক্টোজ	গ্লুকোজ + গ্যালাকটোজ
মলটেজ	"	মলটোজ	গ্লুকোজ
আইসোমলটেজ	"	আইসোমলটোজ	গ্লুকোজ

বিশোষণ ঃ পলিস্যাকারাইড অণুগুলি বৃহদাকৃতি হওয়ায় অন্ত্রে ইহাদের বিশোষণ হয় না। ৫ কার্বনযুক্ত মনোস্যাকারাইড ও ফ্রুক্টোজ ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা রক্তে প্রবেশ করে। অন্ত্রের কোষঝিল্লীতে বিশেষ বাহক পদার্থদ্বারা গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজের শোষণ নিষ্পন্ন হয় এবং ইহার জন্য ATPর উপস্থিতি দরকার হয়।

পরিপাকের সহায়ক এনজাইমসমূহ
(Digestive Enzymes)

খাদ্যের পরিপাক করিতে যে সকল জারকরস (enzyme) অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে তাহাদের নাম, উৎপত্তি ও কাজ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

জারক পদার্থ (Enzyme)	যে গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয় (Secreted by)	যাহার উপর ক্রিয়া করে (Substance acted upon)	খাদ্যের পরিণতি (Products of Enzyme activity)
টায়ালিন বা অ্যামাইলেস,	লালাগ্রন্থি	পরিপক্ক (cooked) শ্বেতসার	মলটোজ
রেনিন	পাকস্থলীর গ্রন্থি	দুধের প্রোটিন	ছানা প্রস্তুতি
পেপ্‌সিন	" "	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ এবং পেপ্‌টোন
লাইপেজ	" "	স্নেহ	গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
ট্রিপ্‌সিন	অগ্ন্যাশয়	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ এবং পেপটোন
কাইমো-ট্রিপ্‌সিন্	"	প্রোটিন	প্রোটিয়োজ এবং পেপটোন
অ্যামাইলোপসিন	"	শ্বেতসার	মল্‌টোজ
স্টিয়াপ্‌সিন	"	স্নেহ	গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অ্যাসিড
এন্‌টারোকাইনেস্	ক্ষুদ্রান্ত্রের-শ্লৈষ্মিক আবরণ	ট্রিপ্‌সিনোজেন	ট্রিপ্‌সিন্
ইরেপ্‌সিন্	" "	প্রোটিয়োজ এবং পেপ্‌টোন	অ্যামিনো অ্যাসিড
সুক্রেজ	" "	ইক্ষু শর্করা	গ্লুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ
মল্‌টেজ	" "	মল্‌টোজ	গ্লুকোজ
ল্যাক্টেজ	" "	দুগ্ধ-শর্করা	গ্লুকোজ এবং গ্যালাক্টোজ

বিপাক ও মেটাবলিজম্

(Metabolism)

আমরা এই পর্যন্ত জানি যে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য হজম হইবার পর তরল অবস্থায় অন্ত্রের গাত্র দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়। কিন্তু পরিণামে ঐ সকল খাদ্য-দ্রব্য কি হয় ? বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের পরিণামও বিভিন্ন। এই সকল খাদ্যের পরিণতি আমাদের দেশে প্রচলিত একটি প্রবাদে সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে।

"মাংসে মাংস বৃদ্ধি, অন্নে বৃদ্ধি বল,
দুগ্ধে লাবণ্য বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।"

অর্থাৎ মাংস ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্যে দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন হয় ; অন্ন ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে দেহে কর্মশক্তি উৎপন্ন হয় এবং দুধ, ঘি, তেল ইত্যাদি চর্বি জাতীয় খাদ্যে দেহে মেদ উৎপন্ন হইয়া দেহের কান্তি বর্ধিত করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, খাদ্য-দ্রব্য অন্ত্র হইতে রক্তে শোষিত হইবার পরই প্রকৃত পক্ষে দেহের কাজে অর্থাৎ দেহের ক্ষয়পূরণ, পুষ্টিসাধন এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হইতেছে। রক্তের সাহায্যে খাদ্যবস্তু দেহের বিভিন্ন কোষে আসিয়া হাজির হয় এবং সেখানে কতকগুলি জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা দেহের ক্ষয়পূরণ এবং পুষ্টিসাধন করিয়া শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। দেহের কোষে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যের এই পরিবর্তন সম্ভব হয় তাহাকেই **বিপাক বা মেটাবলিজম্** (Metabolism) বলে। মেটাবলিজমের দুইটি দিক আছে। এক দিকে খাদ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি দেহ গঠন ও দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অত্যাবশ্যক দ্রব্যগুলি প্রস্তুত করিয়া থাকে। প্রোটিন ভাঙ্গিয়া যে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ অন্ত্র হইতে রক্তমধ্যে পরিচালিত হয় তাহা আবার সংশ্লেষিত হইয়া দেহের পেশী, অস্থি, রক্ত, হরমোন, এন্জাইম ইত্যাদি উৎপন্ন করে। অন্ত্র হইতে শোষিত গ্লুকোজ যকৃতে আসিয়া গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। মেটাবলিজমের এই গঠনমূলক প্রক্রিয়াকে **অ্যানাবলিজম্ (Anabolism)** বলে। আবার অপর দিকে অন্ত্র হইতে শোষিত খাদ্য-দ্রব্য আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া দেহে শক্তি ও তাপ সরবরাহ করিয়া পরিণামে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, জল, ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড ইত্যাদি অসার পদার্থরূপে বাহির হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য দেহে শক্তি সরবরাহ করা—যে শক্তির সাহায্যে দেহের অত্যাবশ্যক কার্যগুলি (যেমন পেশীর সংকোচন, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, স্নায়ুর পরিবহন, হরমোন, এন্জাইম ইত্যাদি প্রস্তুতি, খাদ্য-দ্রব্য হজম ও শোষণ

প্রভৃতি) সুসম্পন্ন হইতে পারে। খাদ্য-দ্রব্যের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া শক্তি উৎপন্ন করিবার প্রক্রিয়াকে **কেটাবলিজম্** (Catabolism) বলে। কেটাবলিজম্ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য ভাঙ্গিয়া পরিণামে অপ্রয়োজনীয় ও অসার পদার্থ (যথা, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস, ইউরিয়া ইত্যাদি) উৎপন্ন করে। **অ্যানাবলিজম্ ও কেটাবলিজম্ এই দুইয়ের মিলিত প্রক্রিয়াকেই বিপাক বা মেটাবলিজম্ বলে।**

প্রোটিন মেটাবলিজম্—খাদ্যের প্রোটিন পরিপাকের পর অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে রক্তে শোষিত হয়। অন্ত্রের সমস্ত রক্তশিরাগুলি একত্রে মিলিত হইয়া একটি বৃহৎ রক্তশিরা গঠন করিয়াছে। ইহাকে পোর্টাল শিরা বলে। এই পোর্টাল শিরা যকৃতে আসিয়া শেষ হইয়াছে। পূর্বোক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুগুলি অন্ত্র হইতে এই পোর্টাল শিরা বাহিয়া প্রথমে যকৃতে আসিয়া উপস্থিত হয়। যকৃত হইতে অপর একটি শিরা হৃৎপিণ্ডে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এই শিরার সাহায্যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি যকৃত হইতে পরে হৃৎপিণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে দেহের সর্বত্র রক্তের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে খাদ্যের প্রোটিন অ্যামিনো অ্যাসিডরূপে রক্তের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন কোষে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য প্রোটিন খাদ্য খাইবার কিছুক্ষণ পর রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহাতে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থা অপেক্ষা অনেক বেশী। কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পর রক্ত পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে উহাতে অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ এখন অনেক কম। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, দেহকোষগুলি রক্তের অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে নিজ নিজ প্রয়োজনে লাগাইয়াছে। দেহকোষগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডগুলিকে প্রধানতঃ দুইটি কাজে লাগাইয়া থাকে। একটি কাজ হইল অ্যাসিডগুলির সহায়তায় নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি করিয়া দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা। ভ্রূণাবস্থা হইতে 20 বৎসর বয়স পর্যন্ত আমাদের দেহের বৃদ্ধি চলিতে থাকে। মাতৃগর্ভে একটি কোষের দ্বারা প্রথমে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। এই একটি কোষ হইতে কোটি কোটি কোষের সৃষ্টি হইয়া আমাদের পূর্ণদেহ গঠিত হয়। অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে এনজাইমের সহায়তায় জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় একটি কোষ আরও নূতন নূতন কোষের সৃষ্টি করিয়া দেহের এই বৃদ্ধি অব্যাহত রাখে। কোষ প্রস্তুতিতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি প্রথমে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কোষের প্রোটিন বিভিন্ন প্রকার। অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে প্রত্যেটি কোষ আপন অঙ্গের অনুরূপ প্রোটিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। এইজন্যই খাদ্যের প্রোটিন প্রথমে ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হওয়া প্রয়োজন; নতুবা উহার

সাহায্যে দেহের বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন প্রস্তুত হওয়া সম্ভব হইত না। সুতরাং প্রথমে যাহা প্রোটিন ছিল পাচনতন্ত্রে তাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিড হইল। আবার কোষে আসিয়া তাহা সংশ্লিষ্ট হইয়া প্রোটিন হইল। আমাদের দেহের বৃদ্ধি যখন বন্ধ হইয়া যায় তখনও কিন্তু এই নূতন কোষ সৃষ্টি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। কারণ, সৃষ্টি হইতে মৃত্যু পর্যন্ত অনবরত আমাদের দেহ ক্ষয় হইতেছে অর্থাৎ দেহের পুরাতন কোষগুলি ধ্বংস বা নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এই ক্ষয়প্রাপ্ত কোষের জায়গায় নূতন কোষের আবির্ভাব না হইলে আমাদের দেহ ধ্বংস হইয়া যাইত। এইজন্যই মৃত্যু পর্যন্ত যতদিন আমরা জীবিত থাকি ততদিন আমাদের অ্যামিনো অ্যাসিড তথা প্রোটিনের প্রয়োজন হইয়া থাকে। বাল্যে এবং কৈশোরে যতদিন দেহের পূর্ণতা না হয় ততদিন দেহের বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ এই দুইটি কাজই একসঙ্গে চলিতে থাকে বলিয়া ঐ সময় প্রোটিনের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশী হয়।

আমাদের দেহে বিভিন্ন প্রকার এনজাইম, হরমোন ইত্যাদি নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ আছে। ইহারা দেহের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। রক্তের অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে বিভিন্ন কোষে এই সকল প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেনঘটিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই সকল কাজের জন্য দেহের যতটুকু অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজন সে তাহাই রক্ত হইতে গ্রহণ করিবে তাহার বেশী নয়। সুতরাং প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে অতিরিক্ত অ্যামিনো অ্যাসিডের অবস্থা কি হইবে ? অতিরিক্ত অ্যাসিড রক্ত হইতে যকৃতে ফিরিয়া আসে এবং সেখানে আবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। অ্যামিনো অ্যাসিড হইতে নাইট্রোজেন বিশ্লিষ্ট হইয়া প্রথমে অ্যামোনিয়া এবং পরে ঐ অ্যামোনিয়া হইতে ইউরিয়া নামক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। ইউরিয়া অবশেষে মূত্রের সহিত নির্গত হইয়া যায়। অ্যামিনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেনবিহীন অংশটুকু গ্লুকোজে পরিণত হইয়া দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। সুতরাং প্রোটিন খাদ্য যে কেবলমাত্র দেহের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধনই করিয়া থাকে তাহা নয়। ইহার সাহায্যে কর্মশক্তিও সৃষ্টি হইতে পারে। তবে অধিক পরিমাণে প্রোটিন খাদ্য খাইলেই খাদ্যের এই অতিরিক্ত প্রোটিন কর্মশক্তি সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়। অল্প প্রোটিন খাইলে তাহাতে কর্মশক্তি সৃষ্টি হয় না, কারণ, তাহা দেহ গঠন কার্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। এইজন্যই অল্প প্রোটিন খাইলে মূত্রে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয় না, কিন্তু অধিক প্রোটিন খাইলে মূত্রে ইউরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়া যায়।

কিন্তু প্রোটিন যদি একেবারেই না খাওয়া যায় তাহা হইলে কি হয় ? আমরা উপরে দেখিয়াছি অতিরিক্ত প্রোটিন গ্লুকোজে পরিণত হইয়া কার্বোহাইড্রেটের ন্যায়

তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে, অর্থাৎ প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের দ্বারা কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি জাতীয় খাদ্যের কাজটুকু চলিতে পারে। কিন্তু কার্বোহাইড্রেট এবং চর্বি জাতীয় খাদ্যের দ্বারা প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের কাজ কোন প্রকারেই সাধিত হইতে পারে না, কারণ, কার্বোহাইড্রেট ও চর্বি জাতীয় খাদ্যে নাইট্রোজেন থাকে না। খাদ্য হইতে যদি একটুও প্রোটিন না পাওয়া যায় তাহা হইলে দেহের কম প্রয়োজনীয় অংশ ভাঙ্গিয়া ঐ অংশের প্রোটিন দ্বারা অধিকতর প্রয়োজনীয় অঙ্গের প্রোটিনের অভাব পূরণ করা হইয়া থাকে। সুতরাং প্রোটিনের অভাবে শরীর একে একে তাহার কম প্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি বিনাশ করিয়াই বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা করে।

কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম্‌—খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার কার্বোহাইড্রেট পাচনক্রিয়ায় গ্লুকোজে পরিণত হইয়া রক্তে প্রবেশ করে। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্লুকোজরূপে রক্তে প্রবেশ করিয়া পোর্টাল শিরার সাহায্যে প্রথমে যকৃতে গিয়া উপস্থিত হয়। যকৃত হইতে পরে শরীরস্থ সমস্ত রক্তে সঞ্চারিত হয়। সেইজন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য-দ্রব্য খাইবার কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়িয়া যায়। কিন্তু দুই ঘণ্টা কাল পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ আবার কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ এই যে রক্তের মধ্যে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই যকৃত এবং মাংসপেশীসমূহ ঐ অতিরিক্ত গ্লুকোজ রক্ত হইতে আহরণ করিয়া একপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা গ্লাইকোজেন নামক দ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া আপন কোষগুলির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া রাখে। এই সঞ্চয়কার্য মাংসপেশী অপেক্ষা যকৃতেই সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। রক্তের গ্লুকোজ হইতে যকৃত প্রথমে যথাসম্ভব গ্লাইকোজেন প্রস্তুত করিয়া তাহার সঞ্চয় বাড়াইয়া লয়, পরে ধীরে ধীরে ঐ সঞ্চিত গ্লাইকোজেন ভাঙ্গিয়া গ্লুকোজ প্রস্তুত করিয়া রক্তে প্রেরণ করে এবং গ্লুকোজের একটি নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ রক্তের মধ্যে রক্ষা করিয়া চলে। শরীরের পক্ষে এইরূপ গ্লুকোজের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ নিতান্তই প্রয়োজন, কারণ, বিভিন্ন প্রকার কার্যের জন্য তাহার সর্বদাই শক্তি তথা ইন্ধনের দরকার। গ্লুকোজ দেহে ইন্ধনের ন্যায় কাজ করে এবং অক্সিজেনের সহায়তায় শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। চলাফেরা, দৌড়ান ইত্যাদি বাহ্যিক শারীরিক পরিশ্রমে এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া, পেশীর সংকোচন, স্নায়ুর উত্তেজনা, হরমোন, এন্‌জাইম, ইউরিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রস্তুতি প্রভৃতি নানাবিধ অভ্যন্তরীণ কার্যের জন্য অনবরতই আমাদের শক্তির (energy) প্রয়োজন হয়। তাপশক্তি (heat) দ্বারা এই সকল কার্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং গ্লুকোজ অক্সিজেনের সহিত দহন ক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন করিলে উহা দেহের প্রয়োজনে আসিবে না। খাদ্যের মধ্যে যে রাসায়নিক শক্তি (chemical energy) লুক্কায়িত আছে তাহার দ্বারাই

প্রয়োজনীয় শক্তির চাহিদা পূরণ হইয়া থাকে। এই শক্তি সরবরাহের জন্য গ্লুকোজ এক জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোষের মধ্যে ATP (Adenosine Triphosphate) নামক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে। এই ATPর মধ্যে গ্লুকোজের রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে এবং প্রয়োজনের সময় শরীর ATPASE (Adenosine Triphosphatese) নামক এনজাইমের দ্বারা ATP ভাঙ্গিয়া উহা হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং গ্লুকোজের রাসায়নিক শক্তি দেহ সরাসরি কাজে লাগাইতে পারে না, ATPর মাধ্যমেই ঐ শক্তি দেহ কাজে লাগাইয়া থাকে। গ্লুকোজ হইতে ATPর মাধ্যমে এই শক্তি সংগ্রহ করিতে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না। এইজন্যই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাস্তুর (Louis Pasteur) 1861 সালে বলিয়াছিলেন যে বায়ুশূন্য স্থানেও জীবনধারণ করা সম্ভব (life can go on without air)। তাহা হইলে আমাদের অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? গ্লুকোজ হইতে ATP সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া প্রথমে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্যে যথা পাইরুভিক অ্যাসিড (Pyruvic acid) প্রভৃতিতে পরিণত হইতে থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্রব্য পরিণামে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও জলে রূপান্তরিত হয়। এই জল উৎপাদনের জন্য বাহির হইতে অক্সিজেন সরবরাহ করিতে হয়। অর্থাৎ গ্লুকোজের হাইড্রোজেন পরিণামে রক্তের হিমোগ্লোবিন বাহিত অক্সিজেনের সহিত কতকগুলি এনজাইমের সহায়তায় কোষের মধ্যে জল উৎপন্ন করে। বাহির হইতে অক্সিজেন সরবরাহ না করিলে এই হাইড্রোজেন জলে পরিণত হইতে পারে না। আমরা যখন খুব বেশী শারীরিক পরিশ্রম করি (যেমন দৌড়ান ইত্যাদি) তখন খুব সহজেই হাঁপাইয়া পড়ি। ইহার কারণ কি? অতিরিক্ত পরিশ্রমে অধিক শক্তি ব্যয়িত হয়। ফলে অনেক গ্লুকোজ অণু ATP উৎপন্ন করিয়া ঐ শক্তি সরবরাহ করে। ATP সৃষ্টির পর গ্লুকোজের হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি জলে পরিণত হইতে চেষ্টা করে। এইজন্যই অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা তখন খুব বৃদ্ধি পায় এবং দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা ঐ অক্সিজেনের সরবরাহ চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্লুকোজ তথা কার্বোহাইড্রেট হইতে দেহ শক্তি সংগ্রহ করে ATPর মাধ্যমে এবং অক্সিজেন প্রয়োজন হয় কার্বোহাইড্রেটের হাইড্রোজেনকে জলে পরিণত করিতে। ইহা ছাড়া কার্বোহাইড্রেটের বিপাক একই ধাপে সম্পন্ন হয় না। ইহা ধীরে ধীরে বিভিন্ন এনজাইমের সাহায্যে কোষের মধ্যে ভাঙ্গিতে থাকে এবং ATPর মাধ্যমে দেহে শক্তি সরবরাহ করিয়া পরিণামে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

যদি কার্বোহাইড্রেট খাদ্য একেবারেই না খাওয়া হয় তাহা হইলে প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিড হইতেই যকৃত গ্লুকোজ বানাইয়া দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ করিবে।

যদি এই কাজে প্রোটিনও না পাওয়া যায় তবে দেহের চর্বি ভাঙ্গিয়াই তখন শক্তি উৎপন্ন হইবে।

আমরা দেখিয়াছি যে গ্লুকোজ প্রথমে যকৃতে আসিয়া গ্লাইকোজেনে পরিণত হয়। এই পরিণতিতে অগ্ন্যাশয়ের একটি হরমোন 'ইনস্যুলিন' সাহায্য করিয়া থাকে। ইনস্যুলিন না হইলে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে পরিণত হইতে পারে না। এই ইনস্যুলিন অগ্ন্যাশয় হইতে ক্ষরিত হইয়া সর্বদাই রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে। ইহারই সাহায্যে যকৃতে এবং মাংসপেশীতে গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং কাহারও অগ্ন্যাশয়টি নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িলে অর্থাৎ উহা হইতে ইনস্যুলিন নিঃসৃত না হইলে দেখা যাইবে যে ঐ ব্যক্তি যতই কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ করুক না কেন তাহা কোথায়ও সঞ্চিত হইতেছে না। খাইবার কিছুক্ষণ পরেই উহা রক্তের মধ্যে পরিচালিত হয় এবং কিছুক্ষণ পরে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। ইহা এক প্রকার রোগ এবং ইহাকে **ডায়েবেটিস বা বহুমূত্র রোগ বলে।** এই রোগে গ্লুকোজ সঞ্চিত হইতে পারে না। ফলে যথেষ্ট খাদ্য খাওয়া সত্ত্বেও ইন্ধনের অভাবে দেহ ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য আমাদের দেহের উপকারে আসিবে কিনা তাহা নির্ভর করিতেছে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিনের উপর।

ফ্যাট মেটাবলিজম্—চর্বি বা ফ্যাট জাতীয় খাদ্য পাচনতন্ত্রের সাহায্যে ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলে বিভক্ত হইয়া অন্ত্র হইতে রক্তে পরিচালিত হয় এবং সেখানে পুনরায় যুক্ত হইয়া চর্বি বা ফ্যাট উৎপন্ন করে। আবার কাহারও কাহারও মতে চর্বি পাচনতন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে বিভক্ত হইয়া সরাসরি রক্তমধ্যে পরিচালিত হয়। এই চর্বি পরিশেষে দেহের বিভিন্ন অংশে আসিয়া জমিতে থাকে। শরীরের চামড়ার নীচেই সর্বাপেক্ষা অধিক চর্বি থাকে। যাহার দেহে যত বেশী চর্বি তাহার চামড়ার আবরণ তত বেশী পুরু ও থলথলে হয়। ইহা ছাড়া পেটের ভিতরে ঝিল্লির আবরণের গায়ে গায়ে চর্বি থাকে। মাংসপেশীর মধ্যে এবং কোন কোন জন্তুর যকৃতেও কিছু কিছু চর্বি দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে কম খাইলে লোক রোগা হয় এবং বেশী খাইলে গায়ে চর্বি হয়, সুতরাং বলা যায় অতিরিক্ত খাদ্য দেহে চর্বি সৃষ্টি করে। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে গ্লাইকোজেনের সঞ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে। ঐ সঞ্চয় দৈনন্দিন খরচের জন্য অর্থাৎ প্রত্যহই ইহা যেমন জমিতে থাকিবে তেমনি খরচ হইতে থাকিবে অর্থাৎ জমাখরচ দুইটিই এক সঙ্গে চলিতে থাকিবে। কিন্তু চর্বির সঞ্চয় শুধু ভবিষ্যতের দুঃসময়ের জন্য। সুতরাং চর্বি প্রত্যহ জমা হইতে থাকিলেও ইহা প্রত্যহ খরচ হইবে না। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের অসময়ের জন্যই ইহা তোলা থাকে। চর্বি সঞ্চয়ের কোন সীমা নাই। যত ইচ্ছা চর্বি দেহে সঞ্চয় করা যাইতে পারে এবং অধিক চর্বি সঞ্চয় হইতে থাকিলে দেহ ক্রমশঃই মোটা হইতে থাকিবে। দেহে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে এই চর্বিই ইন্ধনের ন্যায় জ্বলিয়া কর্মশক্তি ও তাপ উৎপন্ন করে। গ্লুকোজের ন্যায় চর্বিও দেহে শক্তি ও তাপ উৎপন্ন করিয়া পরিশেষে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে বাহির হইয়া যায়।

মেটাবলিজমে হরমোনের প্রভাব—মেটাবলিজম্ প্রক্রিয়া হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম ইনসুলিন নামক হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মেটাবলিজম্ প্রক্রিয়ায় থাইরয়েড নামক গলদেশের ক্ষুদ্র গ্রন্থিটিই বোধ হয় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত থাইরক্সিন হরমোনটি মেটাবলিজম্ প্রক্রিয়াকে উত্তেজিত করে। ইহারই প্রেরণায় কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রমী আবার কেহবা শ্লথ ও মন্থর গতিসম্পন্ন হয়।

3. **বিশ্রাম, বিভিন্ন কাজ, দৈহিক বিভিন্ন অবস্থা, যথা—বৃদ্ধি, গর্ভাবস্থা ও স্তন্যদানের সময় তাপ ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা (Energy requirements of man during rest, different physical activities and different physiological condition e. g., growth, pregnancy and lactation.)**

মানুষের দেহে একটি নির্দিষ্ট তাপ সর্বদাই বজায় থাকে। দেহের এই উষ্ণতা রক্ষার জন্য তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। আমরা যখন হাঁটাচলা করি তখন গতিশক্তির এবং কোন কাজ করিতে হইলে কর্মশক্তির প্রয়োজন হয়। আমরা এই যে বিভিন্ন আকারে শক্তি ব্যয় করি তাহা খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়। বয়স ভেদে এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদে শক্তির চাহিদার পরিবর্তন ঘটে। আবার একই বয়সের সকল পুরুষ বা সকল নারীর শক্তির প্রয়োজনীয়তা একই রকম হয় না। বস্তুতঃ শারীরবৃত্তীয় অবস্থাভেদে একজন পুরুষ এবং একজন নারীর শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন হয়। পুষ্টির বিচারে খাদ্যের তাপ ও শক্তি পরিমাপ করিবার জন্য যে একক ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাকে ক্যালরি (calorie) বলে। এক কিলোগ্রাম (১০০০ গ্রাম) জলের ১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন তাহাকে **১ ক্যালরি** বলে। পদার্থবিদ্যায়ও তাপের একক হিসাবে ক্যালরি ব্যবহার করা হয়। এই ক্যালরি খাদ্যের পরিমাপে ব্যবহৃত ক্যালরি হইতে স্বতন্ত্র। ১ গ্রাম জলের ১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় তাহা পদার্থবিদ্যায় ১ ক্যালরি হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং খাদ্যে ব্যবহৃত ক্যালরি পদার্থবিদ্যার ক্যালরি হইতে ১০০০ গুণ বড়।

আমাদের দেহে ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ৪ ক্যালরি
১ গ্রাম স্নেহপদার্থ হইতে ৯ ক্যালরি
১ গ্রাম প্রোটিন হইতে ৪ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য খাদ্যের ৬টি উপাদানের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং স্নেহপদার্থের ক্যালরি আছে। পরন্তু জল, ভাইটামিন ও খনিজলবণের কোন ক্যালরি নাই।

বিশ্রামকালীন শক্তির চাহিদা (Energy requirement during rest)ঃ শায়িত কিংবা নিদ্রিত অবস্থায় আমাদের দেহ এবং মন যখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকে তখনও দেহের অভ্যন্তরে রক্ত চলাচল, হৃদ্স্পন্দন, শ্বাসপ্রশ্বাস, তাপরক্ষা ইত্যাদি কাজগুলি চলিতে থাকে। এই ন্যূনতম জৈবক্রিয়ার নাম 'ন্যূনতম বিপাকক্রিয়া' বা 'বিশ্রামকালীন

বিপাকক্রিয়া' (Basal or resting metabolism)। আর তাহার জন্য যে ক্যালরি প্রয়োজন তাহাকে বলে ন্যূনতম বিপাক ক্যালরি।

ন্যূনতম বিপাকীয় হার (Basal Metabolic Rate)ঃ ন্যূনতম বিপাকক্রিয়ার একটা গতি আছে যাহাকে নিম্ন বিপাকীয় হার—Basal Metabolic Rate সংক্ষেপে BMR বলা হয়। ঘণ্টায় দেহের প্রতি বর্গমিটার আয়তন কিংবা/প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের উপর নির্ভর করিয়া BMR পরিমাপ করা হয়। তবে BMR-এর ক্ষেত্রে ওজনের চেয়ে আয়তনের গুরুত্ব বেশী। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে প্রতি ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটার আয়তনে পুরুষদের BMR ৪০ কিলোক্যালরি এবং নারীর ৩১·৬ কিলোক্যালরি।

শেষ বার খাদ্যগ্রহণের ১২ হইতে ১৪ ঘণ্টা পরে একটি উষ্ণ এবং আরামদায়ক কক্ষে হাল্কা পোশাক পরিধান করিয়া শায়িত অবস্থায় ব্যক্তির দেহে যখন সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকে এবং চিন্তামুক্ত থাকে তখনকার সময়ের অক্সিজেন ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া Benedict Roth Apparatus নামক যন্ত্রের সাহায্যে তাপশক্তির উৎপাদন স্থির করা হয়। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে এইরূপ বিশ্রামকালীন অবস্থায় ১ লিটার অক্সিজেন ৪·৬৫ ক্যালরি তাপশক্তি উৎপাদন করে। অর্থাৎ,

একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের লাগে ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে ৪০ কিলোক্যালরি এবং তাহার আনুমানিক আয়তন ১·৮ বর্গমিটার হইলে ৪০ × ১·৮ = ৭২ „ তাপ প্রয়োজন।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারীর লাগে ঘণ্টায় প্রতি বর্গমিটারে ৩১·৬ কিলোক্যালরি এবং তাহার আনুমানিক আয়তন ১·৪ বর্গমিঃ হইলে ৩১·৬ × ১·৪ = ৪৪ „ তাপ প্রয়োজন।

যে সব কারণে বেসাল মেটাবলিজম পরিবর্তিত হইয়া থাকেঃ গড় ন্যূনতম বিপাক ক্যালরি ব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে (১) বয়স, (২) দেহের গড়ন ও আয়তনের উপর, (৩) হরমোন, (৪) পুষ্টির মান এবং (৫) আবহাওয়া উষ্ণতার উপর।

(১) **বয়স**—বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে Basal Metabolic Rate প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য হ্রাস পাইতে থাকে। জন্মের পর প্রথম বৎসর ইহা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রথম এবং দ্বিতীয় বৎসরের মধ্যেই ইহা সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। তৃতীয় বৎসর হইতে ইহা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া যৌবনে আবার সামান্য বৃদ্ধি পায়। পঁচিশ বৎসর হইতে বার্ধক্য পর্যন্ত ইহা আবার ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া থাকে।

(২) **দেহের গড়ন ও আয়তনঃ** দেহের ওজন এবং আয়তনের উপর কোন কোন ব্যক্তির BMR নির্ভর করে। সাধারণতঃ বেঁটে এবং মোটা লোক অপেক্ষা রোগা ও লম্বা লোকের আয়তন বা ক্ষেত্রফল বেশী। তাই তাহার বেসাল মেটাবলিজমও বেশী হইবে।

দেহের গড়নও BMR নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যেমন মেদবহুল দেহের তুলনায় দৃঢ় সুগঠিত দেহের BMR বেশী কারণ মেদবহুল দেহে নিষ্ক্রিয় তন্তু অর্থাৎ চর্বির আধিক্য বেশী পরন্তু সুগঠিত দেহে সক্রিয় তন্তু অর্থাৎ মাংসপেশীর

পরিমাণ বেশী। তাই শেষোক্ত ব্যক্তির BMR-ও বেশী। আবার পুরুষ অপেক্ষা নারীর দেহে চর্বি বেশী তাই নারীর তুলনায় পুরুষের BMR শতকরা প্রায় ১০ ভাগ বেশী।

(৩) **হরমোন** : আমাদের দেহের মধ্যস্থিত কয়েকটি গ্রন্থি হইতে হরমোন নামে কয়েকটি রস সরাসরি রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয়। এই সকল হরমোনের হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে BMRএর তারতম্য হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত থাইরক্সিন নামক হরমোনের ক্রিয়াই সর্বাধিক। অধিক পরিমাণে এই হরমোন নিঃসৃত হইলে মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়। আবার থাইরক্সিন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মেটাবলিজমও হ্রাস পাইয়া থাকে।

থাইরক্সিন ব্যতীত এড্রিনাল ও পিটুইটারি হরমোনও BMRএর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

(৪) **পুষ্টির মান**—পুষ্টিকর খাদ্যের অনবরত অভাবে এবং অনাহারে বেসাল মেটাবলিজম শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পাইতে পারে।

(৫) **আবহাওয়া** : আবহাওয়ার উপরও BMR নির্ভরশীল। ঠান্ডা আবহাওয়ায় বিপাকক্রিয়া তীব্রতর হয় বলিয়া শীতের সময় ক্যালরি লাগে বেশী, গরমের সময় কিছু কম। উষ্ণ অঞ্চলের তুলনায় নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের লোকেদের BMR বেশী।

দেহের উত্তাপ বাড়িলে, যেমন জ্বরের সময়, মেটাবলিজমও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতি ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য শতকরা ৭·২ ভাগ মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়।

আবার জাতিগত পার্থক্যের জন্যও BMRএর তারতম্য ঘটিতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে ভারতীয় ও চীনাদের তুলনায় ককেশীয়দের BMR বেশী যদিও তাহারা সকলেই এশিয়ার অন্তর্গত পাশাপাশি অঞ্চলের অধিবাসী।

নারীর BMR : পুরুষ অপেক্ষা নারীর দৈনিক ক্যালরির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম। ইহার কারণ মোটামুটি তিনটি—(১) নারীর দেহের ওজন পুরুষের তুলনায় কম। (২) নারীর দেহের আয়তনও কম, (৩) পুরুষের তুলনায় নারী কম পরিশ্রমী। তবে বিশেষ অবস্থায় নারীর BMR বৃদ্ধি পায় যেমন গর্ভাবস্থায় ও স্তন্যদানকালে।

গর্ভাবস্থায় (Pregnancy) : গর্ভাবস্থায় বিশেষতঃ গর্ভের শেষের তিন মাস গর্ভিণী নারীর বেসাল মেটাবলিজম নিম্নলিখিত কারণে বৃদ্ধি পায়—(১) তাহাকে দেহের অভ্যন্তরে নতুন তন্তু প্রস্তুত করিতে হয়। (২) তাহার দেহের ওজন বাড়ে এবং (৩) গর্ভস্থ শিশুর মেটাবলিজম অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। এই সময় তাহার স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অন্ততঃ ৩০০ ক্যালরি অধিক খাদ্য গ্রহণ্ করা উচিত।

স্তন্যদানকালে (Lactation) : দেহে স্তন্যের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন এবং স্তন্য ক্ষরণের জন্য স্তন্যদাত্রী জননীর Basal Metabolism বৃদ্ধি পায় এবং শিশুর ০-৬ মাস বয়স পর্যন্ত অতিরিক্ত ৫৫০ ক্যালরি এবং ৬-১২ মাস পর্যন্ত অতিরিক্ত ৪০০ ক্যালরি অধিক খাদ্য প্রয়োজন।

দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শারীরিক কাজে ঃ হাঁটা, চলা, দাঁড়ান, স্নান করা, খাওয়া, পোশাক পরা, পোশাক বদলান ইত্যাদি।

বিভিন্ন শারীরিক কাজে প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ

কাজের ধরন	ক্যালরি প্রতি কিলো ওজন পিছু	ঘণ্টা পিছু ব্যয়িত শক্তির পরিমাণ
১। দাঁড়ান ও বসা অবস্থায়	১·৭ ক্যালরি	
২। ব্যক্তিগত কাজ যেমন পোশাক পরা এবং বদলান, দাড়ি কামান, স্নান করা ইত্যাদির জন্য	৩·০ ক্যালরি	
৩। হাঁটা (৩ মাইল বেগে)	৪·০ ক্যালরি	
৪। সক্রিয় চিত্ত বিনোদন যেমন ক্রিকেট খেলা	৪·০ ক্যালরি	
৫। সাধারণ হাল্কা কাজে	১·৭ ক্যালরি	
৬। হাল্কা পরিশ্রমের জন্য	২·৫ ক্যালরি	
৭। কঠোর পরিশ্রম যেমন কাঠুরিয়ার কাজ বা শ্রমিকের কাজ	৫·০ ক্যালরি	

তাপ ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় করার পদ্ধতি। ঘণ্টায় প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য তাপের প্রয়োজন ১ ক্যালরি। ২৪ ঘণ্টায় স্বাভাবিক পরিশ্রমের কাজের জন্য প্রায় ৭০০ ক্যালরি তাপ ব্যয়িত হয়।

উদাহরণ ঃ ৪৫ কিলোগ্রাম ওজনের একজন নারীর জন্য নিম্নলিখিত তাপের প্রয়োজন হইবে।

বেসাল মেটাবলিক প্রয়োজনীয়তা

১ ক্যা / প্রতি কিগ্রা ওজন / ঘণ্টা

১×৪৫×২৪ =১০৮০ ক্যালরি

২৪ ঘণ্টা কাজের জন্য প্রয়োজন ৭০০ ক্যা.

দৈনিক তাহার মোট প্রয়োজন ১৭৮০ ক্যালরি

১জন ভারতীয় নারীর ক্যালরির প্রয়োজনীয়তা নির্ণয়ের উপায় ঃ

বয়স ২৫ বৎসর ওজন ৪৫ কিগ্রা

দেহের আয়তন ১·৪ বর্গমিটার গড়পড়তা BMR ৩১·৬ ক্যা. / বর্গমি. / ঘণ্টা

২৪ ঘণ্টায় উক্ত নারীর নিম্নলিখিত ক্যালরির প্রয়োজন হইবে ঃ

A. ধরা যাক ইনি

(ক) ব্যক্তিগত কাজ যেমন স্নান, পোশাক পরা ও বদলান, চুলের যত্ন ইত্যাদি কাজে দৈনিক ১ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন।
তারজন্য ৩·০ ক্যা. / কিগ্রা ওজন / ঘণ্টা
(৩·০×৪৫×১) =১৩৫ ক্যালরি তাপ ব্যয়িত হয়

(খ) হাঁটার জন্য (ঘণ্টায় ৩ মাইল বেগে)
১½ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন এবং এইজন্য
১½ ঘণ্টায় ৪·০ ক্যা. / কিগ্রা ওজন / ১½ ঘণ্টা
(৪·০ × ৪৫ × ১½) = ২৭০ ক্যালরি তাপ ব্যয়িত হয়

(গ) বসা ও দাঁড়ান কাজে ৫½ ঘণ্টা
ব্যয় করেন এবং এইজন্য ৫½ ঘণ্টায়
১·৭ / কিগ্রা ওজন / ঘণ্টা
(১·৭ × ৪৫ × ৫½) = ৪২১ ক্যাঃ " " "

৮২৬ ক্যাঃ তাপ ব্যয়িত হয়।

B. অল্প পরিশ্রমের কাজ যেমন শ্রেণীকক্ষে বসা, টাইপ করা, লেখা, লেবরেটরীর কাজের জন্য দাঁড়াইয়া থাকা, পড়া, সেলাই করা, বোনা, কিংবা ঘরের হাল্কা কাজের জন্য ৮ ঘণ্টা সময় ব্যয় করেন এবং এইজন্য ৮ ঘণ্টায় মোট
১·৭ ক্যা. / কিগ্রা ওজন / ঘণ্টা
(১·৭ × ৪৫ × ৮) = ৬১০ ক্যাঃ তাপ ব্যয়িত হয়

C. ইনি ৮ ঘণ্টা সময় নিদ্রা যান
এবং এই ৮ ঘণ্টায় ৩১·৬ ক্যাঃ হিসাবে / বর্গ মি. আয়তন / ঘণ্টা
(৩১·৬ × ১·৪ × ৮) = ৩৫৪ ক্যাঃ " " "

দৈনিক তাহার মোট ১৭৯০ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন।

দেহের ওজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট ক্যালরির হার

ব্যক্তির পরিচয়	প্রতিদিনের নির্দিষ্ট ক্যালরির পরিমাণ
পুরুষ—ওজন ৫৫ কিলোগ্রাম	
অল্প পরিশ্রমী	২৪০০ কিলোক্যালরি
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	২৮০০ " "
কঠোর পরিশ্রমী	৩৯০০ " "
নারী—ওজন ৪৫ কিলোগ্রাম	
অল্প পরিশ্রমী	১৯০০ কিলোক্যালরি
স্বাভাবিক পরিশ্রমী	২২০০ "
কঠোর পরিশ্রমী	৩০০০ "
গর্ভাবস্থায়	স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা প্রয়োজন + ৩০০ কিলোক্যালরি
স্তন্যদানকালে	স্বাভাবিক অবস্থায় যাহা প্রয়োজন + ৫৫০ " + ৪০০

স্তন্যদানের মাত্রা হ্রাস পাইবার সংগে সংগে ক্যালরির মাত্রাও কমাইতে হয় নতুবা মেদ বৃদ্ধি পায়।

শিশু

১ বৎসরের নীচে (০—৬ মাস পর্যন্ত)	দৈনিক ১১৮ ক্যাঃ দৈহিক ওজনের প্রতি কিগ্রা পিছু
১ বৎসরের নীচে (৬—১২ মাস পর্যন্ত)	,, ১০৮ ক্যাঃ ,, ,, ,,
১—৩ বৎসর	দৈনিক মোট ১২২০ ক্যাঃ
৪—৬ বৎসর	,, ,, ১৭২০ ক্যাঃ
৭—৯ বৎসর	,, ,, ২০৫০ ক্যাঃ
১০—১২ বৎসর বালক ও বালিকা যথাক্রমে	,, ,, ২৪২০ ক্যাঃ ও ২২৬০ ক্যাঃ
বালিকা	
১৩—১৫ বৎসর	,, ,, ২৩৬০ ক্যাঃ
১৬—১৮ বৎসর	,, ,, ২২০০ ক্যাঃ
বালক	
১৩—১৫ বৎসর	,, ,, ২৬৬০ ক্যাঃ
১৬—১৮ বৎসর	,, ,, ২৮২০ ক্যাঃ

বয়স বাড়ার এবং কর্মক্ষমতা কমার সঙ্গে সঙ্গে ক্যালরির খরচও কমিয়া যায়। সাধারণতঃ ২৫ বৎসরের পর শতকরা ৩ ভাগ এবং ৪৫—৬৫ বৎসরের মধ্যে শতকরা ৭·৫ ভাগ ক্যালরি ব্যয় কম হয়।

বেসাল মেটাবলিজম (B. M. R.) নির্ণয়ের পদ্ধতি

নীতি—প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় খাদ্য হইতেই দেহে তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং বেসাল অবস্থায়* দেহের মধ্যে কি পরিমান প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় পদার্থ জারিত হয় তাহা নির্ণয় করিতে পারিলে সহজেই বেসাল মেটাবলিজমের হার নির্ণয় করা যায়। (কারণ আমরা জানি, ১ গ্রাম প্রোটিন, ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট এবং ১ গ্রাম স্নেহ জাতীয় খাদ্য হইতে যথাক্রমে 4 ক্যাঃ, 4 ক্যাঃ এবং 9 ক্যাঃ তাপ-শক্তি পাওয়া যায়।) কিন্তু মনে রাখিতে হইবে প্রতিদিন আমরা যে পরিমান খাদ্য খাই তাহা সমস্তই দেহের মধ্যে জারিত হইয়া তাপ-শক্তিতে পরিণত হয় না। এই গৃহীত খাদ্য বস্তুর কিছু অংশ দেহে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হয়, কিছু অংশ অপচয় হয় এবং অবশিষ্ট কিছু অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এই জারিত খাদ্য বস্তুর পরিমাপ নির্ণয়ের জন্য আমাদের তিনটি বিষয় জানা প্রয়োজন—প্রতিদিন আমরা (১) দেহের ভিতরে যে আয়তনের বায়ু বা অক্সিজেন গ্রহণ করি, (২) দেহ হইতে যে আয়তন CO_2 প্রতিদিন বাহির করিয়া দিই এবং (৩) মূত্রের সহিত প্রতিদিন যে যে পরিমাণ নাইট্রোজেন পরিত্যাগ করি। এই তিনটি বিষয় জানা থাকিলে অংক কষিয়া প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়।

* যে নির্দিষ্ট অবস্থায় বেসাল মেটাবলিজম নির্ণয় করা হয় তাহাকে বেসাল অবস্থা (Basal condition) বলে। এই অবস্থা হইতেছে—(১) ব্যক্তি পূর্ণ—বিশ্রামরত অবস্থায় (Absolute rest) থাকিবে, (২) সে উষ্ণ কক্ষে (Warm room) অবস্থান করিবে এবং (৩) 12—14 ঘণ্টা পূর্বে সে তাহার শেষ খাবার গ্রহণ করিবে।

মনে কর বেসাল অবস্থায় একটি লোক 24 ঘণ্টায় 371 লিটার অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং 300 লিটার CO_2 গ্যাস ত্যাগ করে। (সকল গ্যাসের আয়তন প্রমাণ চাপে অর্থাৎ 76 সেমিঃ এবং প্রমাণ তাপে অর্থাৎ $0°$ সেঃ প্রকাশ করা হইয়াছে।) তাছাড়া মনে কর ঐ সময়ের মধ্যে মূত্রের সহিত সে 12 গ্রাম নাইট্রোজেন পরিত্যাগ করে (24 ঘণ্টার মোট মূত্র সংগ্রহ করিয়া রাসায়নিক পদ্ধতিতে ঐ নাইট্রোজেন নির্ণয় করা হয়)।

প্রোটিন নির্ণয়—আমরা খাদ্যের সহিত যে প্রোটিন গ্রহণ করি তাহার প্রতি 100 গ্রামে 16 গ্রাম নাইট্রোজেন থাকে। সুতরাং মূত্রের 12 গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য দেহে $\frac{100 \times 12}{16} = 75$ গ্রাম প্রোটিন জারিত হয়। মূত্রের 1 গ্রাম নাইট্রোজেন যে পরিমাণ প্রোটিন হইতে উৎপন্ন হয় তাহা জারিত করিতে 5·9 লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হয় এবং ঐ জারণের ফলে 4·75 লিটার CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। সুতরাং মূত্রের 12 গ্রাম নাইট্রোজেনের জন্য $12 \times 5·9$ লিটার $=71$ লিটার অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং এই বিক্রিয়ার ফলে $12 \times 4·75$ লিটার $=57$ লিটার CO_2 উৎপন্ন হয়।

কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ-পদার্থ নির্ণয়—সুতরাং কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ জাতীয় খাদ্য দহনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয় তাহার আয়তন $371-71=$ 300 লিটার। আবার এই কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের দহনের ফলে দেহে যে পরিমাণ CO_2 উৎপন্ন হয় তাহার আয়তন $300-57=243$ লিটার। এই CO_2 এর আয়তনকে অক্সিজেনের আয়তন দ্বারা ভাগ করিয়া যে ভাগফলটি পাওয়া যায় তাহাকে Respiratory Quotient (R. Q.) বলে।

$$R.Q. = \frac{CO_2 \text{এর আয়তন}}{O_2 \text{এর আয়তন}} = \frac{243}{300} = 0·8$$

এই R. Q. এর সাহায্যে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ-জাতীয় খাদ্য দহনে কি আয়তন অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় তাহা সহজেই নির্ণয় করিতে পারা যায়। দেহে গ্লুকোজ জারিত হওয়ার সময় নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে।

$$\underset{\text{গ্লুকোজ}}{C_6H_{12}O_6} + 6O_2 = 6CO_2 + 6H_2O$$

সুতরাং কার্বোহাইড্রেটের R. Q. $= \frac{6CO_2}{6O_2} = \frac{6 \times 22·4}{6 \times 22·4} = 1.$ দেহে স্নেহ-জাতীয় খাদ্য জারিত হইবার সময় নিম্নলিখিত বিক্রিয়া ঘটে।

$$\underset{\text{স্নেহ}}{C_{57}H_{110}O_6} + 81·5O_2 = 57CO_2 + 53H_2O$$

সুতরাং স্নেহ-জাতীয় খাদ্যের R.Q. $= \frac{57CO_2}{81·5O_2} = \frac{57 \times 22·4}{81·5 \times 22·4} = 0·7.$

[এক গ্রাম অণু-অক্সিজেন বা CO_2-এর আয়তন প্রমাণ চাপে ও তাপে 22·4 লিটার]

সুতরাং R. Q. যদি 1 হয় তবে কেবলমাত্র কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য এবং R. Q. যদি 0·7 হয় তবে কেবলমাত্র স্নেহ জাতীয় খাদ্য দেহে জারিত হইতেছে বুঝিতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে Diabetes রোগীর দেহে গ্লুকোজ জারিত হয় না, স্নেহ জাতীয় খাদ্যই জারিত হয়। এই জন্য ঐ রোগীর R. Q. 0·7 হয়। 1 হইতে 0·7 এর মধ্যে R. Q. হইলে বুঝিতে হইবে কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ উভয় প্রকার খাদ্যের দহনেই দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং যে ব্যক্তির R. Q. 0·8 সে উভয় প্রকার খাদ্যই জারিত করে। এখন $1-0{\cdot}7=0{\cdot}3$ এবং $1-0{\cdot}8=0{\cdot}2$. সুতরাং ঐ ব্যক্তির দেহে স্নেহ জাতীয় খাদ্য দহনে যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন তাহার আয়তন $=\frac{0{\cdot}2}{0{\cdot}3}\times 300=\frac{2}{3}\times 300=200$ লিটার। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য দহনে অবশিষ্ট $(300-200)=100$ লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। গ্লুকোজের গ্রাম আণবিক ওজন 180 গ্রাম।

$6\times 22{\cdot}4$ লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হয় 180 গ্রাম গ্লুকোজের জন্য

∴ 100 ,, ,, ,, ,, $\frac{180\times 100}{6\times 22{\cdot}4}=134$ গ্রাম

এক অণু স্নেহের গ্রাম আণবিক ওজন = 890 গ্রাম

∴ $81{\cdot}5\times 22{\cdot}4$ লিটার অক্সিজেন প্রয়োজন হয় 890 গ্রাম স্নেহের জন্য

∴ 200 ,, ,, ,, ,, $\frac{890\times 200}{81{\cdot}5\times 22{\cdot}4}=100$ গ্রাঃ

অতএব 24 ঘণ্টায় বেসাল অবস্থায় = ঐ ব্যক্তি যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে তাহার পরিমান তাপ উৎপন্ন করে তাহার পরিমান নিম্নরূপ—

প্রোটিন দহনে— $75\times 4=300$ ক্যাঃ
কার্বোহাইড্রেট দহনে— $134\times 4=536$ ক্যাঃ
স্নেহ-পদার্থ দহনে— $100\times 9=900$ ক্যাঃ

মোট = 1736 ক্যাঃ

সুতরাং ঐ ব্যক্তির B. M. R. = 1736 ক্যাঃ

বিভিন্ন লোকের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বেসাল অবস্থায় সকল লোকের R. Q. সমান (ie. 0·82) অর্থাৎ বেসাল অবস্থায় প্রত্যেকটি লোক একই অনুপাতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ-পদার্থ জারিত করে। অর্থাৎ এই অবস্থায় বিভিন্ন লোকের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের পরিমান বিভিন্ন হইলেও এই তিনটি উপাদানের পরিমানের অনুপাত সকল ক্ষেত্রেই সমান। সুতরাং এক লিটার অক্সিজেন এই তিন প্রকার খাদ্য জারিত করিয়া যে পরিমান তাপ উৎপন্ন করে তাহা সকল লোকের ক্ষেত্রেই সমান এবং প্রমাণ অবস্থায় এই তাপের পরিমাণ 4·825 ক্যাঃ। অতএব হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে B. M. R. নির্ণয়ের জন্য এখন আর উপরোক্ত জটিল অংক কষার প্রয়োজন হয় না, কেবলমাত্র অক্সিজেনের পরিমান নির্ণয় করিয়া উহাকে 4·825 দ্বারা গুণ করিলেই B. M. R. পাওয়া যায়।

পদ্ধতি—হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্র B. M. R. নির্ণয়ের জন্য কোনও ব্যক্তিকে প্রথমে বেসাল অবস্থায় রাখা হয়। অর্থাৎ একটি স্বাভাবিক উষ্ণ ঘরে সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় অনাহারে একরাত্র রাখিয়া পরদিন সকালে যন্ত্রের সাহায্যে 6 মিনিট ধরিয়া ঐ ব্যক্তি শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত কি আয়তন অক্সিজেন গ্রহণ করে তাহা নির্ণয় করা হয়। ঐ আয়তনকে 10 দ্বারা গুণ করিয়া প্রতি ঘণ্টায় কতটুকু অক্সিজেন সে গ্রহণ করে তাহা নির্ণয় করা হয়। শেষে ব্যারোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ঐ জায়গার বায়ুর চাপ এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে বায়ুর উষ্ণতা নির্ণয় করিয়া ঐ আয়তন অক্সিজেনকে প্রমান চাপে ও তাপে রূপান্তরিত করা হয়। এখন এই আয়তনকে 4·825 দ্বারা গুণ করিলেই ঐ ব্যক্তির প্রতি ঘণ্টার B. M. R. পাওয়া যায় (B. M. R. সাধারণত প্রতিঘণ্টারই প্রকাশ করা হইয়া থাকে)।

4. পুষ্টির জন্য কার্বোহাইড্রেট
(Carbohydrate in nutrition)

আমাদের দৈনিক খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে। ইহা অন্যান্য খাদ্যোপাদনগুলির তুলনায় সস্তা, শরীরে তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য স্নেহ পদার্থের পরেই কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্ব। মানবসভ্যতায় এই কার্বোহাইড্রেটের অবদান বহুমুখী। তুলা, পাট ইত্যাদি আমাদের বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিয়াছে। কাগজ আমাদের শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে। যে প্লাস্টিক আজকাল মানবসভ্যতায় বৈচিত্র্য আনিয়াছে তাহাও কার্বোহাইড্রেট হইতে প্রস্তুত হইতেছে।

কার্বোহাইড্রেটের রাসায়নিক সংগঠন—সমস্ত কার্বোহাইড্রেটই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—এই তিনটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। ইহাদের মধ্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সাধারণতঃ ২ঃ১ অনুপাতে অর্থাৎ উহারা জলে যে অনুপাতে থাকে সেই অনুপাতে থাকে। এই জন্যই এই শ্রেণীর পদার্থকে কার্বোহাইড্রেট (hydrate of carbon) বলে। সুতরাং **কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত কোন পদার্থে যদি হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন ২ঃ১ অনুপাতে থাকে তবে ঐ পদার্থকেই সাধারণতঃ কার্বোহাইড্রেট বলা হইয়া থাকে।**

4. পুষ্টির জন্য কার্বোহাইড্রেট (Carbohydrates in nutrition)

কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ ঃ পুষ্টির দৃষ্টিতে কার্বোহাইড্রেটকে শর্করা, শ্বেতসার ও সেলুলোজ এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। রাসায়নিক সংগঠনের বিচারে কার্বোহাইড্রেটের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ ঃ

শর্করা ঃ দুই শ্রেণীর, যথা—

(ক) **মনোস্যাকারাইড** [Mono-Saccharide ($C_6H_{12}O_6$)]ঃ

(১) গ্লুকোজ বা ডেক্সট্রোজ ঃ পাওয়া যায় আঙ্গুরে, দানা শস্যে এবং কিছু কিছু মূলে। রক্তে শর্করা থাকে গ্লুকোজরূপে। গ্লুকোজই শর্করার সরলতম রূপ।

(২) ফ্রুক্টোজ (fructose) মধু, পাকা মিষ্ট স্বাদের ফল এবং কিছু কিছু সবজিতে ফ্রুক্টোজ পাওয়া যায়।

(৩) গ্যালাকটোজ : দুধের চিনি ল্যাকটোজ ভাঙিয়া গ্যালাকটোজে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে স্বরূপে উহার অস্তিত্ব নাই।

বিজারণ ক্ষমতার উপর ভিত্তি করিয়া শর্করাকে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) বিজারণধর্মী এবং (২) অবিজারণধর্মী। গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ এবং গ্যালাকটোজের মধ্যে ৬টি করিয়া কার্বন থাকে। উহাদের হেক্সোজ বা কার্বনযুক্ত একক শর্করা বলা হয়। হেক্সোজে অ্যালডেহাইড (CHO) বা কিটোন (CO) গ্রুপের উপস্থিতির জন্য অ্যালডো হেক্সোজ বা কিটো হেক্সোজ বলিয়া অভিহিত করা হয়। যেসব শর্করায় অ্যালডেহাইড ও কিটোন গ্রুপ মুক্ত অবস্থায় থাকে তাহাকে বিজারণধর্মী শর্করা বলা হয়, যেমন গ্লুকোজ, ল্যাকটোজ ও মলটোজ। যেসব শর্করার মধ্যে এই গ্রুপ দুটি মুক্ত অবস্থায় থাকে না তাহাদের অবিজারণধর্মী শর্করা বলা হয় যেমন সুক্রোজ।

(খ) **ডাইস্যাকারাইডস ($C_{12}H_{22}O_{11}$) :**

(১) সুক্রোজ বা সাধারণ চিনি : আখ, বিট, নানারকম সবজি ও ফলের চিনির নাম সুক্রোজ।

(২) মলটোজ : চাউলের শ্বেতসারের মধ্যে থাকে।

(৩) ল্যাকটোজ বা দুধের চিনি : স্তন্যপায়ীদের দেহে এই চিনি পাওয়া যায়।

রাসায়নিক সংগঠনের দিক হইতে শ্বেতসার ও সেলুলোজ আবার পলিস্যাকারাইড শ্রেণীর অন্তর্গত।

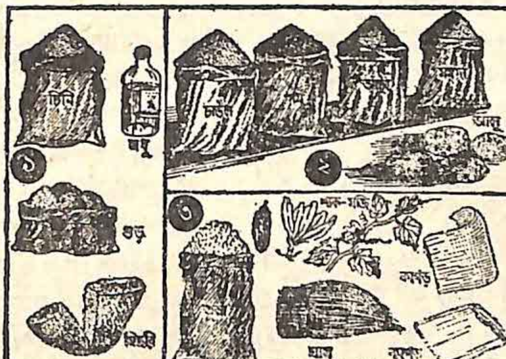
(গ) **পলিস্যাকারাইড ($C_6H_{10}O_5)_n$:**

(ক) শ্বেতসার—প্রাণিজগতের শক্তির প্রাথমিক উৎস হইল শ্বেতসার। উদ্ভিদে কার্বোহাইড্রেট থাকে শ্বেতসাররূপে। চাউল, দানা শস্য, বীজ, মূল, সবজি ইত্যাদিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। কাঁচা আপেল এবং কলার মধ্যে প্রথমে শ্বেতসার থাকে : পরে ফল পাকিবার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্বেতসার শর্করাতে পরিণত হয়। এই সকল উদ্ভিজ্জ শ্বেতসার ব্যতীত প্রাণিদেহে বিশেষ করিয়া যকৃতে এক প্রকার শ্বেতসার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে **গ্লাইকোজেন** বা প্রাণিজ শ্বেতসার (animal starch) বলে। খাদ্যদ্রব্যের কার্বোহাইড্রেট প্রাণীদেহে এই গ্লাইকোজেন উৎপন্ন করে। অনেকগুলি গ্লুকোজের অণুর সমন্বয়ে একটি শ্বেতসারের অণু গঠিত হয়। দেহের মধ্যে এই শ্বেতসার জারকরসের (Enzymes) সাহায্যে আর্দ্র বিশ্লেষিত (Hydrolysis) হইয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ধান, গম, যব, আলু ইত্যাদি এই শ্বেতসার একটি কঠিন

আবরণে আবৃত থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন খাদ্যের শ্বেতসার কণিকা বিভিন্ন আকৃতিতে পাওয়া যায়। শ্বেতসারের উপরের এই কঠিন আবরণটি দুষ্পাচ্য। জলের সাহায্যে উত্তপ্ত করিলে বাহিরের কঠিন আবরণটি ফাটিয়া শ্বেতসার কণিকা বাহির হইয়া আসে। এইজন্যই রন্ধনের সাহায্যে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য সহজপাচ্য হয়।

সেলুলোজ (Cellulose)—খাদ্যশস্য, যথা—ধান, গম, যব ইত্যাদি, শাক্-সব্জি এবং ফল প্রভৃতির অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশটিকে সেলুলোজ বলা হয়। উদ্ভিদের দেহগঠনে ইহাই প্রধানতম উপাদান। সেলুলোজের অণু গ্লুকোজের অণুর দ্বারাই গঠিত। তুলা প্রায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ। কিন্তু দেহের জারকরস (Enzyme) শ্বেতসারের ন্যায় ইহাকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করিয়া গ্লুকোজে পরিণত করিতে পারে না বলিয়া খাদ্যহিসাবে ইহার গুরুত্ব অনেক কম।

কার্বোহাইড্রেটের গুণাগুণ—কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে শর্করাসমুদয় জলে দ্রবণীয়, মিষ্টস্বাদযুক্ত এবং দেখিতে স্ফটিকাকার। শ্বেতসার এবং সেলুলোজ স্বাদহীন এবং জলে অদ্রবণীয়। দেহের জারকরসের দ্বারা গ্লুকোজ, মধু শর্করা এবং গ্যালাক্টোজ শর্করার কোন পরিবর্তন হয় না। সেলুলোজের অতি সামান্যই জারকরসের দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করে। ইহার উপরে জারকরসের কোন ক্রিয়া নাই বলিলেই চলে। পরন্তু শ্বেতসার জারকরসের দ্বারা আর্দ্র বিশ্লেষিত হইয়া গ্লুকোজে পরিণত হয়। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যশস্যে অঙ্কুরোদগম হইবার সময় কিছু শ্বেতসার



(১) শর্করা, (২) শ্বেতসার, (৩) সেলুলোজ

মলটোজ (Maltose) শর্করায় পরিণত হয়। রন্ধনের সময় শ্বেতসারের কিছু অংশ অগ্নির উত্তাপে আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া ডেক্সট্রিন (Dextrin) নামক এক পদার্থ উৎপন্ন করে। আয়োডিন দ্রবণের সংস্পর্শে শ্বেতসার নীল বর্ণ ধারণ করে। অন্য কোন কার্বোহাইড্রেট আয়োডিনের সংস্পর্শে নীলবর্ণে পরিণত হয় না। এইজন্য এই পরীক্ষাটির সাহায্যে শ্বেতসার অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটের মধ্য হইতে সহজে চিনিতে পারা যায়।

কার্বোহাইড্রেটের উৎস—আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট সাধারণতঃ উদ্ভিদ্-জগৎ হইতেই আসে। প্রাণীর যকৃত (liver), বৃক্ক (Kidney), মাছ ইত্যাদি

হইতে যে কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তাহার পরিমাণ অতি সামান্যই। তবে সকল উদ্ভিজ্জ খাদ্যদ্রব্যেই কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সমান থাকে না।

কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ ক্রমশঃ কম অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্যসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(১) ইক্ষু শর্করা (Sugar), গুড় (Jaggery), মিছরি (Sugar candy) মধু (Honey) ;

(২) সাগু (Sago), সিমলা-আলু (Tapioca) ;

(৩) চাউল (Rice), রাগী (Ragi), ভুট্টা (Maize), যব (Barley) গম (wheat), জই (Oat), জোয়ার (Cholam), বাজরা (Cambu) ;

(৪) বিভিন্ন প্রকারের শুষ্ক ফল, যথা,—খেজুর (Dates), কিসমিস (Raisins) ইত্যাদি ;

(৫) বিভিন্ন প্রকারের ডাল, যথা,—ছোলা (Bengal gram), মুগ (Green gram), মাস কলাই (Black gram), অড়হর (Red gram), মসুর (Lentils) ইত্যাদি ;

(৬) সয়াবীন (Soyabeen), বাদাম (Nuts) ইত্যাদি ;

(৭) আলু (Potato), রসুন (Garlic), মিঠে আলু বা রাঙ্গা আলু (Yams), পেঁয়াজ (Onions) ইত্যাদি ;

(৮) টাটকা ফল, যথা—আঙ্গুর, কলা, আপেল, আম, আনারস ইত্যাদি।

(৯) সবুজ শাক-সবজি, যথা—লালশাক বা নটে শাক, বাঁধাকপি, কলমী শাক, লেট্যুস শাক, পালং শাক ইত্যাদি।

কার্বোহাইড্রেটের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা—কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ শ্বেতসারজাতীয় খাদ্যসামগ্রী—মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সস্তা বলিয়া আমাদের দেশের অগণিত দরিদ্র অধিবাসী তাহাদের দেহের প্রয়োজনীয় তাপ-শক্তির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই এই জাতীয় খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাকে। ধনী বা অবস্থাপন্নদের মধ্যে এই জাতীয় খাদ্যের প্রচলন অপেক্ষাকৃত কম। আয় ও অবস্থা ভেদে আমরা সাধারণতঃ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা ৫০-৮০ ভাগ এই জাতীয় খাদ্য হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি। সুষম খাদ্যে (Balanced diet) কার্বোহাইড্রেট মোট তাপ ও শক্তির শতকরা ৫০ হইতে ৬০ ভাগ সরবরাহ করিবে। সুতরাং যে ব্যক্তির দৈনিক ৩০০০ ক্যালরি শক্তির প্রয়োজন হয় তাহাকে প্রায় ৪০০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রত্যহ গ্রহণ করিতে হইবে।

খাদ্য হইতে গ্রহণ করিবার নীতি—কোন একটি নির্দিষ্ট খাদ্য হইতে প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্বোহাইড্রেট গ্রহণ না করিয়া ঐ জাতীয় বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য হইতেই উহা গ্রহণ করা উচিত। চিনি (Sugar), মিছরি (Sugar candy) এবং গুড়ের (Jaggery) প্রায় সমস্তটাই কার্বোহাইড্রেট। শুধু এক জাতীয় খাদ্যসামগ্রীর দ্বারা কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া ক্ষুধামান্দ্য ঘটাইতে পারে। আবার অপর দিকে, শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, কলমী শাক, বাঁধাকপি ইত্যাদির মধ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতি সামান্য। সুতরাং প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট শুধু এক জাতীয় খাদ্যদ্রব্য হইতে সংগ্রহ করিতে হইলে পাকস্থলী উক্ত পরিমাণ শাক-সবজি পরিপাক করিতে পারিবে না। শুধু বিভিন্ন প্রকার ডাল হইতেও আমরা কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিতে পারি না। কারণ, এই সকল ডালে আবার প্রচুর পরিমাণে

প্রোটিনও আছে। কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিতে যে পরিমাণ ডাল গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাতে দেহে প্রোটিনের আধিক্য দেখা দিতে পারে। সুতরাং প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট চিনি, মিছরি, শাকসবজি, ডাল, ভাত ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের মিশ্রণ হইতে গ্রহণ করাই সবচেয়ে ভাল। ইহাতে বিভিন্ন খাদ্যের লবণ এবং ভাইটামিনও আমাদের শরীরে পুষ্টির জন্য পাওয়া যাইবে।

কার্বোহাইড্রেটের কাজ (Functions)—(১) দেহে তাপ বা শক্তি সরবরাহ করাই এই জাতীয় খাদ্যের প্রথম এবং প্রধান কাজ, এইজন্যই উহাদের জ্বালানী খাদ্য বলে। (২) স্নেহজাতীয় পদার্থের দহনে সহায়তা করিয়া কার্বোহাইড্রেটসমূহ আমাদের কিটোসিস (Ketosis) নামক রোগ হইতে রক্ষা করে এবং (৩) খাদ্যের প্রোটিন, ভাইটামিন ও খনিজ লবণ গ্রহণে সহায়তা করে। (৪) কার্বোহাইড্রেটের অপর একটি কাজ হইতেছে, অল্প প্রোটিন মূল্যের খাদ্যে (low protein diet) প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ হইতে অব্যাহতি দেওয়া। প্রোটিনের প্রথম এবং প্রধান কাজ দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন করা। ইহা ছাড়া দেহে তাপ উৎপাদনও উহার অপর একটি কাজ। কিন্তু খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়াইলে সমস্ত প্রোটিনটুকুই দেহের ক্ষয় পূরণে ব্যয় হইয়া যায় এবং ইহা তাপ উৎপাদনে কোন সাহায্য করে না। তখন খাদ্যের বাড়তি কার্বোহাইড্রেটই প্রোটিনের এই তাপ উৎপাদনের কাজটুকু করিয়া দেহের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। এইরূপে কার্বোহাইড্রেট অল্প প্রোটিন মূল্যের খাদ্যে প্রোটিনকে তাপ উৎপাদনের কাজ হইতে অব্যাহতি দেয় বলিয়া কার্বোহাইড্রেটের এই ক্রিয়াকে Protein sparing action বলে। (৫) কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতিতে এক প্রকার জীবাণু অন্ত্রে ভাইটামিন 'কে' এবং ভাইটামিন 'বি' উৎপন্ন করিয়া ঐ সকল ভাইটামিনের অভাব কিছুটা পূরণ করিয়া থাকে। (৬) খাদ্যের সেলুলোজ নামক কার্বোহাইড্রেট কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের আধিক্যের ফল—খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অত্যধিক হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট অন্ত্রে (Intestine) পড়িয়া থাকে এবং গ্যাস ও অ্যাসিড উৎপন্ন করে। ফলে পেটফাঁপা, অজীর্ণ ও উদরাময় রোগের সৃষ্টি হয়। খাদ্যে অত্যধিক কার্বোহাইড্রেট থাকিলে খাদ্যের অন্যান্য উপাদানগুলি যথা—প্রোটিন, ভাইটামিন ও লবণ শরীর প্রয়োজনমত গ্রহণ করিতে পারে না। ইহাতে দেহের ওজন হ্রাস পায় ও রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়া যায় এবং দেহ সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। দাঁতের ক্ষয় রোগও খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের আধিক্যের একটি ফল। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রাচুর্যে দেহ মেদবহুল হইয়া পড়ে।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের অভাবের (deficiency) ফল—খাদ্যের উপাদানগুলির মধ্যে স্নেহই সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। এই তাপ ও শক্তি সরবরাহের জন্য কার্বোহাইড্রেটের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। কার্বোহাইড্রেটের অভাবে স্নেহজাতীয় পদার্থের দহন ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইতে পারে না। ফলে শরীরে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়, ইহাকে 'কিটোন বডি' (Ketone bodies) বলে। এই কিটোন বডি দেহে কিটোসিস (Ketosis) রোগের সৃষ্টি করে।

5. **প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড—উহাদের কাজ এবং পরিমাণ (Proteins and amino acids—their functions and requirements)**

প্রোটিন হইতেই জীবনের স্পন্দন উদ্ভূত হইয়াছে ; তাই প্রোটিন ব্যতীত কোন প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জীব এবং উদ্ভিদ্-জগতে এই প্রোটিন একটি প্রধান অংশ, এইজন্য প্রোটিনকে মুখ্য উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয়।[১]

প্রোটিনের রাসায়নিক সংগঠন—সকল প্রোটিনেই কার্বন (Carbon), হাইড্রোজেন (Hydrogen), অক্সিজেন (Oxygen) এবং নাইট্রোজেন (Nitrogen) দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রোটিনেই আবার এই সকল মৌলিক পদার্থের সহিত গন্ধকও (Sulphur) থাকে। কখনও কখনও ফসফরাস (Phosphorus), লৌহ (Iron) এবং অন্যান্য মৌলিক পদার্থও প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায়। প্রোটিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইলে প্রথমে অ্যামিনো অ্যাসিড (Amino acids) এবং শেষে কার্বন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয়। বিভিন্ন প্রকারের প্রোটিন হইতে মোট প্রায় পঁচিশটি বিভিন্ন অ্যাসিড পাওয়া গিয়াছে। এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিডই প্রোটিনের মূল উপাদান বলা যাইতে পারে।

অ্যামিনো অ্যাসিড কাহাকে বলে ?

বৃহদাকৃতি প্রোটিন অণুকে জল বিশ্লিষ্ট করিলে কতকগুলি ক্ষুদ্র অ্যাসিড অণু পাওয়া যায়। ইহাদের অ্যামিনো অ্যাসিড বলে। প্রতি অ্যামিনো অ্যাসিডে কমপক্ষে ১টি অ্যামিনো বর্গ (NH_2) ও ১টি কার্বক্সিল বর্গ (COOH) বর্তমান। প্রোটিন অণুতে অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পেপটাইড (Peptide) বন্ধনীদ্বারা যুক্ত থাকে—এই বন্ধনীটি ১টি অ্যামিনো অ্যাসিডের কার্বক্সিল বর্গের সহিত পরবর্তী অ্যামিনো অ্যাসিডের সংযুক্তি ঘটায়। দুইটি অ্যামিনো অ্যাসিড ১টি পেপটাইড বন্ধনীদ্বারা যুক্ত হইয়া ১টি ডাইপেপটাইড (dipeptide) গঠন করে। পলিপেপটাইড (Polypeptide) অণু অনেকগুলি পেপটাইড বন্ধনীদ্বারা আবদ্ধ অ্যামিনো অ্যাসিডের সমষ্টিমাত্র। অতএব প্রোটিন একটি পলিপেপটাইড।

প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ—প্রাণী এবং উদ্ভিদ্ উভয় জগতেই প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। উৎপত্তি হিসাবে প্রোটিনকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে :

(১) **প্রাণিজ প্রোটিন** (Animal Protein)—প্রাণি-জগৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহাদের প্রাণিজ প্রোটিন বলে, যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, পনীর ইত্যাদি।

(২) **উদ্ভিজ্জ প্রোটিন** (Vegetable Protein)—এই শ্রেণীর প্রোটিন উদ্ভিদ্‌জগৎ হইতে উৎপন্ন হয় ; যথা—ডাল (Pulses), বাদাম (Nuts), সয়াবীন ইত্যাদি।

আমাদের দেহের প্রধান অংশ প্রোটিন এবং এই প্রোটিন কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সাহায্যে দেহের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীর নিজে প্রস্তুত করিয়া উহাদের অভাব মিটাইতে পারে না, খাদ্যদ্রব্যের সহিত বাহির হইতে সরবরাহ করিতে হয়। এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক

[১] Proteios নামক গ্রীক শব্দ হইতে প্রোটিন শব্দের উৎপত্তি। ঐ শব্দটির অর্থ হইল প্রধান। মুণ্ডার প্রথম এই শব্দটির প্রচলন করেন।

অ্যামিনো অ্যাসিড (Essential amino acids) নামে পরিচিত। নিম্নলিখিত দশটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড ঃ

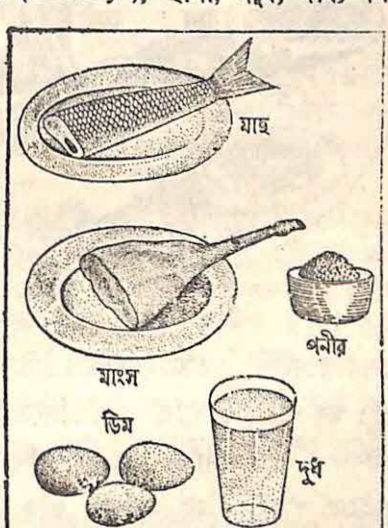
(১) আইসোলিউসিন (Isoleucine), (২) লিউসিন (Leusine), (৩) লাইসিন, (Lysine), (৪) মিথায়নাইন (Methionine), (৫) ফিনাইল অ্যালানাইন (Phenyl alanine), (৬) থ্রিওনাইন (Threonine), (৭) ট্রিপ্টোফ্যান (Tryptophan), (৮) ভ্যালাইন (Valine), (৯) আরজিনাইন (Arginine), (১০) হিসটিডাইন (Histidine)। প্রথম ৮টি বয়স্কদের জন্য এবং তদুপরি শেষের দুটি শুধু বর্ধমান শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যক।

শরীরের প্রোটিন প্রস্তুতিতে এইগুলি ছাড়াও আরও অন্যান্য অ্যামিনো অ্যাসিডের প্রয়োজন হয়। এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড খাদ্যের মধ্যে না থাকিলেও শরীরের বিশেষ ক্ষতি হয় না, কারণ শরীর নিজেই এই সকল অ্যাসিড প্রস্তুত করিয়া উহার অভাব পূরণ করিতে পারে। এইজন্য এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড অপ্রয়োজনীয় (non-essential) অ্যামিনো অ্যাসিড নামে পরিচিত।

মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, এই সকল অ্যামিনো অ্যাসিড দেহ-প্রোটিন নির্মাণের উপযোগী অনুপাতেই বর্তমান থাকে। এইজন্যই প্রাণিজ প্রোটিনকে উপযোগী (Suitable), সম্পূর্ণ (Complete) বা প্রথম শ্রেণীর (First class) প্রোটিন বলে। উদ্ভিদ্-জগতের মধ্যে সবুজ শাক-সবজি, চাল, ডাল ইত্যাদিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়।

নিম্নলিখিত খাদ্যে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায় ঃ—

মাছ, মাংস, ডিম, যকৃত, (liver), বৃক্ক (kidney), ছানা, দুধ, দধি; পনীর (cheese), সবুজ শাক-সবজি (green leafy vegetables); সয়াবীন।



প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন

আবার কোন কোন প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ দেহ নির্মাণের উপযোগী অনুপাতে থাকে না বলিয়া দেহের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই সকল প্রোটিন কম উপযোগী (less suitable), আংশিক পূর্ণ (partially complete) বা দ্বিতীয় শ্রেণীর (second class) প্রোটিন নামে পরিচিত। সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমূহই দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত।

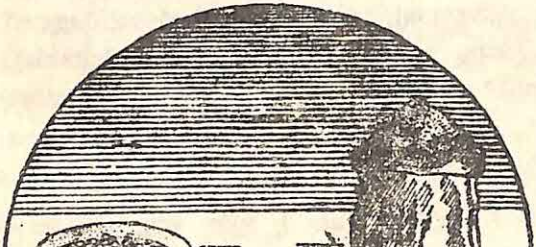
নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য সাধারণতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দেখা যায় ঃ— চাউল, আটা; যব (barley), রাগী (ragi), চোলাম (cholam), বিভিন্ন প্রকারের ডাল (pulses), বাদাম, আলু, গাজর, বীট, শালগম, বিভিন্ন প্রকারের

ফল এবং শাক-সবজি (সবুজ শাক-সবজি বাদে)। ইহাদের মধ্যে ডাল এবং বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী।

ইহা ছাড়া আরও এক প্রকার প্রোটিন আছে যাহা দ্বারা দেহের বৃদ্ধি বা পুষ্টি কিছুই সাধিত হয় না। কখনও কখনও ইহারা দেহে তাপ উৎপাদন করিয়া জ্বালানি খাদ্যের ন্যায় কাজ করে। এই সকল প্রোটিনে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের অভাব লক্ষিত হয়। এইজন্য ইহাদের **অনুপযুক্ত** (unsuitable), **অসম্পূর্ণ** (incomplete) বা **তৃতীয় শ্রেণীর** (third class) প্রোটিন বলে। জেলাটিন (gelatin), জেন (zein) এই শ্রেণীর প্রোটিনের অন্তর্গত।

প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনকে **উৎকৃষ্ট** এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর প্রোটিনকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনও বলে।

আমরা প্রতিদিন বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খাইয়া থাকি। ইহাদের অনেকের মধ্যেই কিছু না কিছু প্রোটিন থাকে। তবে সকল খাদ্যের প্রোটিনেই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না এবং থাকিলেও দেহ গঠনের উপযোগী অনুপাতে থাকে না। ডাল একটি প্রোটিন-বহুল খাদ্য। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির তুলনায় ডাল অনেক সস্তা। এই কারণে কম খরচে ডালের সাহায্যে আমাদের প্রোটিনের চাহিদা অনেকটা পূরণ হইতে পারে। ডালের ন্যায় বাদামেও যথেষ্ট প্রোটিন পাওয়া যায়। তাছাড়া চাউল, আটা ইত্যাদি আমাদের নিত্যকার খাদ্য। ইহাতেও কিছু কিছু প্রোটিন থাকে। কিন্তু এই সকল খাদ্যের প্রোটিন দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। শুধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনের দ্বারা দেহের ক্ষয় পূরণ ও পুষ্টি সাধন চলিতে পারে না। তবে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিতে এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনও দেহ কাজে লাগাইতে পারে। এই কারণেই ভাত, ডাল, রুটি বাদাম ইত্যাদি খাদ্যের সহিত প্রতীদিনই আমাদের খাদ্যে কিছু কিছু মাছ, মাংস, ডিম বা দুধের ব্যবস্থা থাকা উচিত।



দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন

উৎপত্তি অনুসারে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ

প্রোটিন

উদ্ভিজ্জ
ডাল, বাদাম, চাউল,
গম ইত্যাদি

প্রাণিজ
মাছ, মাংস, ডিম
ইত্যাদি

প্রয়োজনীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ হিসাবে প্রোটিনের শ্রেণীবিভাগ।

প্রোটিন

উপযোগী
সম্পূর্ণ বা
প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ঃ
মাছ, মাংস, ডিম,
দুধ ইত্যাদি।

কম উপযোগী,
আংশিক পূর্ণ বা
দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন ঃ
ডাল, আটা,
বাদাম ইত্যাদি।

অনুপযোগী,
অসম্পূর্ণ বা
তৃতীয় শ্রেণীর প্রোটিন ঃ
জেলাটিন,
জেন ইত্যাদি।

সাধারণতঃ অধিকাংশ খাদ্যেই কিছু না কিছু প্রোটিন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এমন কতকগুলি খাদ্য আছে যাহাদের মধ্যে কোনও প্রোটিন দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—চিনি, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, বনস্পতি ইত্যাদি।

প্রোটিনের গুণাগুণ—অধিকাংশ প্রোটিনই জলে অদ্রবণীয়। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের প্রোটিন জল এবং লবণের মিশ্রণে দ্রবীভূত হয়। ডিমের সাদা অংশও এক প্রকারের প্রোটিন। ইহাকে অ্যালবুমেন (albumen) বলে। এই অ্যালবুমেন জলে দ্রবীভূত হয়। অ্যালবুমেনের এই দ্রবণ উত্তপ্ত করিলে ইহা ঘনীভূত হইয়া নীচে পড়িয়া যায়। এই অবস্থায় প্রোটিনকে denatured প্রোটিন বলে। উত্তাপের সাহায্যে এই প্রকারে ঘনীভূত হওয়া প্রোটিনের একটি স্বাভাবিক গুণ।

প্রোটিনের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয়তা—প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা বয়স ও নারী-পুরুষ ভেদে বিভিন্ন প্রকার হইতে দেখা যায়। আমাদের দেহের বৃদ্ধি জন্মকাল হইতে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। সুতরাং এই সময় প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাপেক্ষা বেশী। শরীরের দৈনন্দিন ক্ষয়পূরণ ছাড়াও দেহের বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই এই সময় প্রোটিনের এত বেশী প্রয়োজনীয়তা। পঁচিশ বৎসর পরে যখন দেহের বৃদ্ধি প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসে তখন প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তাও কমিয়া যায়। এইজন্যই প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তুলনায় একজন কিশোর বা যুবকের প্রোটিনের প্রয়োজন বেশী।

সাধারণতঃ নারী এবং পুরুষের মধ্যে নারীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা পুরুষের তুলনায় কম। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদান কালে) এই প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি পায়। একজন সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক

পুরুষের দৈনন্দিন প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় ৫৫ গ্রাম। দেশ এবং অবস্থা ভেদে এই প্রয়োজনীয়তাও কম বেশী হইতে দেখা যায়। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চ (ICMR) ১৯৮১ সালে আমাদের দেশের অধিবাসীদের জন্য যে পরিমাণ প্রোটিন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

পুরুষ (১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর)……৫৫ গ্রাম দৈনিক
নারী (১৮ বৎসর হইতে ৬০ বৎসর)……৪৫ „ „
কিশোর (১৩ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর)……৫১'৭ „ „
কিশোরী (১৩ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর)……৪৩'৩ „ „
বালক ও বালিকা যথাক্রমে
(১০ বৎসর হইতে ১২ বৎসর)……৪২'৫ এবং ৪২'১ গ্রাম
বালক ও বালিকা যথাক্রমে
শিশু (৭ বৎসর হইতে ৯ বৎসর)……৩৫'৬ গ্রাম
শিশু (৪ হইতে ৬ বৎসর)……২৯'৪ গ্রাম দৈনিক

অন্যান্য দেশের তুলনায় এই পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইলেও আমাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া শরীর রক্ষার জন্য এই পরিমাণ প্রোটিনই উপযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করা হইয়াছে।

খাদ্য হইতে প্রোটিন গ্রহণের নীতি—আমাদের শরীর গঠনের জন্য প্রথম শ্রেণীর (First class) প্রোটিনের একান্ত প্রয়োজন, কারণ এই সকল প্রোটিনের মধ্যে শরীর গঠনের উপযোগী প্রয়োজনীয় (essential) অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় প্রোটিনের সমস্তই প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন হইতে হইবে এমন কোন কথা নাই, বিশেষতঃ যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যে এই জাতীয় প্রোটিন পাওয়া যায়; যেমন—মাছ, মাংস; ডিম ইত্যাদি, সেগুলি অত্যন্ত দুমূ'ল্য, সাধারণ লোকের প্রায় আয়ত্তের বাহিরে। সুতরাং দেহের গঠন ও সংরক্ষণের জন্য প্রোটিনের দৈনন্দিন প্রয়োজন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীর প্রোটিন হইতেই সংগ্রহ করা কর্তব্য। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনও দেহ গঠনে সহায়তা করে। সুতরাং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে ভাত, ডাল, আটা ইত্যাদি খাইলে অর্থাৎ কিছুটা সম্পূর্ণ কিছুটা অসম্পূর্ণ মিশ্র প্রোটিন খাইলে আমাদের দৈনন্দিন প্রোটিনের অভাব পূরণ হইবে। মোটের উপর এমনভাবে খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড সব কয়টি থাকে। বিভিন্ন ডালে বিভিন্ন অনুপাতে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি থাকে। সুতরাং আর্থিক অবস্থা ভাল না হইলে কিছু মাছ মাংস ইত্যাদির সহিত বিভিন্ন ধরনের ডাল খাইয়া প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যায়। কিন্তু কেবলমাত্র ডাল, বাদাম, আটা ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন দ্বারা শরীর রক্ষা করা যায় না। উহাদের সহিত কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ শিশু যুবক; গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর খাদ্যে কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন অপরিহার্য।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে 1 গ্রাম মিশ্র প্রোটিন এবং তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ হওয়া উচিত প্রাণিজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রোটিন।

শিশুদের আবার (১-৩ বছর পর্যন্ত) প্রয়োজন গড়ে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ২ গ্রাম হিসাবে এবং তার দুই-তৃতীয়াংশ বা কমপক্ষে অর্ধেক হওয়া উচিত ডিম-ছানা-দুধ-মাছ-মাংস জাতীয় সম্পূর্ণ প্রোটিন।

অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় জননীর প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণের উপর নবজাতকের ওজন নির্ভর করে।

প্রোটিনের কাজ (functions) ঃ (১) গঠন ও বৃদ্ধি—প্রোটিনের প্রথম ও প্রধান কাজ হইল দেহের বা দেহের কোষ গঠনে সাহায্য করা। আমাদের দেহের অস্থি, পেশী, বিভিন্ন দেহযন্ত্র, রক্তকণিকা হইতে শুরু করিয়া দাঁত, চুল, এমন কি নখ পর্যন্ত সমস্ত কঠিন পদার্থের অধিকাংশই প্রোটিন দ্বারা তৈরী।

(২) ক্ষয়পূরণ—আমাদের কোষগুলির বিপাকক্রিয়া চলে বিরামহীনভাবে। একদিকে যেমন কোষগুলি ক্ষয় পায় তেমনি আবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ার কাজ চলিতে থাকে। ভ্রূণ অবস্থায়, শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে নতুন কোষ সৃষ্টির কাজ চলে সবচেয়ে বেশী। তবে তাহার পরেও কোষের প্রোটিন নিয়মিত ক্ষয় পায় আবার তাহা পূরণ হয়। সব বয়সেই দেহের ক্ষয়পূরণের কাজটি সম্পূর্ণ করে প্রোটিন। দেহে কোন ক্ষত হইলে কিংবা কোন অংশ কাটিয়া রক্তপাত হইলে সেখানে নতুন কোষ সৃষ্টি করার ভার নেয় প্রোটিন। সুতরাং জন্ম হইতে শুরু করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সমস্ত লোকেরই প্রোটিনের প্রয়োজন।

(৩) প্রতিরোধ শক্তি অর্জন—প্রোটিনের তৃতীয় কাজ হইল দেহের প্রতিরোধ শক্তি গড়িয়া তোলা। বাহির হইতে অসংখ্য রোগজীবাণু নানাভাবে এবং নানা পথে আমাদের দেহে প্রবেশ করিয়া নানা রকম ব্যাধি জন্মাইবার চেষ্টা করে। এইসব রোগ-জীবাণুকে প্রতিরোধ করার জন্য দেহে তাহাদের বিরোধী পদার্থ বা antibody সৃষ্টি হয়। উহারাই রোগ প্রতিরোধক শক্তি গড়িয়া তোলে। খাদ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রোটিনের অভাব হইলে অ্যান্টিবডি সৃজন ব্যাহত হয় এবং রোগ প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পায়। প্রোটিনের অপুষ্টিতে যাহারা ভোগে তাহারা সহজেই সংক্রামক রোগের শিকার হয়।

মনন শক্তির স্ফুরণ—শুধু দৈহিক গঠন ও বৃদ্ধিতে নয় মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রেও প্রোটিন অপরিহার্য। যেসব শিশুরা প্রোটিনলাভে বঞ্চিত মানসিক দিক হইতে তাহারা অনগ্রসর থাকে। পরবর্তী কালে উপযুক্ত প্রোটিন খাওয়াইয়া তাহা সর্বদা সংশোধন করা যায় না।

(৫) অন্যান্য কাজ—আমাদের রক্তের মধ্যে হিমোগ্লোবিন নামক প্রোটিন বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। প্লাজমা বা রক্তরসের প্রোটিন দেহে জলের সমতা বজায় রাখে।

খাদ্যে প্রোটিনের অভাবের ফল (deficiency)—প্রোটিন দেহ গঠন ও সংরক্ষণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। প্রোটিনের ঘাটতি এনজাইম সংশ্লেষে বিঘ্ন ঘটায়, খাদ্য ঠিকমত পরিপাক হয় না, বদহজম হয়। সুতরাং সকল বয়সের খাদ্যেই প্রোটিন থাকা আবশ্যক।

শিশুর খাদ্যে প্রোটিনের অভাব হইলে উহার দেহের বৃদ্ধি স্তিমিত হয়, ওজন হ্রাস পায়, ত্বক্ ও চুলের রং ফ্যাকাশে হয়, ঘ্যান ঘ্যান করে, পাতলা দাস্ত এবং মৃদু ধরনের অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মানসিক দিক হইতেও শিশু পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে।

প্রোটিন-ক্যালরির অভাবজনিত এই ব্যাধিটির নাম কোয়াশিয়রকার। সাধারণতঃ ১-৪ বছরের শিশুরাই ইহার শিকার হইয়া থাকে। পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইবার পূর্বে এই ব্যাধিটির কিছু আবছা লক্ষণ দেখা দেয় যেমন পেটের গোলমাল, শিশু বাড়ে না, পেট হয়ত সামান্য ফোলা—এই অবস্থাকে প্রাক কোয়াশিয়রকার বলে।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রোটিনের অভাবে শোথ রোগ (oedema) হইবার সম্ভাবনা থাকে। দরিদ্র শ্রেণীর মায়েদের মৃতবৎসা, গর্ভপাত, অসময়ে অপরিণত শিশুর জন্ম, অ্যানিমিয়া ইত্যাদির হার বেশী হওয়ার কারণ প্রোটিন-ক্যালরি ঘাটতি।

খাদ্যে প্রোটিনের আধিক্যের ফল—প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করাও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উদ্বৃত্ত প্রোটিন শরীরের কোন উপকারে আসে না। উহা শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থের সৃষ্টি করিয়া মাথা ধরা, অবসাদ, আবার কখনও কখনও বাত রোগের (Rheumatism) সৃষ্টি করিতে পারে।

প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনামূলক আলোচনা

প্রাণিজ-প্রোটিন	উদ্ভিজ্জ প্রোটিন
(১) এই শ্রেণীর প্রোটিন প্রাণিজগৎ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যথা—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি।	(১) এই শ্রেণীর প্রোটিন উদ্ভিদ জগৎ হইতে সংগ্রহ করিতে হয়। যথা—ডাল, আটা, বাদাম ইত্যাদি।
(২) ইহাতে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ দেহপ্রোটিন নির্মাণের উপযোগী অনুপাতে বর্তমান থাকে।	(২) ইহাতে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো-অ্যাসিডসমূহ দেহপ্রোটিন নির্মাণের উপযোগী অনুপাতে বর্তমান থাকে না।
(৩) এই শ্রেণীর প্রোটিন দেহ গঠনে ও ক্ষয়পূরণে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য ইহাদের প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন বলে।	(৩) দেহ গঠনে এবং ক্ষয়পূরণে এই শ্রেণীর প্রোটিন তেমন উপযোগী নয়, এইজন্য ইহাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন বলে। সয়াবীনে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়।
(৪) এই শ্রেণীর খাদ্য অগ্নিমূল্য। এইজন্য সাধারণের পক্ষে সংগ্রহ করা কষ্ট-সাধ্য।	(৪) এই শ্রেণীর খাদ্য অপেক্ষাকৃত সস্তা। এইজন্য সাধারণ লোক সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে।
(৫) প্রোটিন ছাড়াও এই শ্রেণীর খাদ্যে খনিজ লবণ ও ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।	(৫) খনিজ লবণ ও ভাইটামিন অপেক্ষাকৃত কম থাকে।।

প্রাণিজ-প্রোটিন ছাড়া দেহের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্ভব নয়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের মধ্যে একমাত্র সয়াবীন প্রাণিজ প্রোটিনের চাহিদা কিছুটা পূরণ করিতে পারে। দুধের পরিবর্তে সয়াবীনের দুধ ও ছানা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু সয়াবীনের দুধে এক প্রকার দুর্গন্ধ থাকায় উহার ব্যবহার জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করে নাই।

6. **পুষ্টির জন্য স্নেহ পদার্থ** (Fats and oils in nutrition—elementary principles) ঃ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে স্নেহপদার্থ সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিতে পারে। পরিমাণে কম খাইয়া খাদ্যে অধিক ক্যালরি পাইতে হইলে স্নেহপদার্থের

ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিদের খাদ্যে তাই অবশ্যই কিছু ফ্যাট বা স্নেহপদার্থ থাকা উচিত।

স্নেহ পদার্থের রাসায়নিক সংগঠন ঃ খাদ্যের স্নেহ পদার্থ সাধারণতঃ সরল, যৌগিক ও বহু কার্বন দ্বারা গঠিত এক জটিল পরমাণুবলয় বা স্টেরল নামক পদার্থের একটি মিশ্রণ। তবে সেই মিশ্রণে সরল স্নেহপদার্থের পরিমাণ সর্বাধিক। সরল স্নেহ পদার্থকে বিশ্লিষ্ট করিলে একটি অ্যালকোহল এবং বিভিন্ন প্রকারের ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়। অ্যালকোহলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সরল স্নেহপদার্থকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) মোমজাতীয় স্নেহ বা wax, ইহার অ্যালকোহল অণুতে অনেকগুলি কার্বন অণু ও একটি বা দুটি অ্যালকোহল জাতীয় হাইড্রক্সিল বর্গের উপস্থিতি দেখা যায়। মৌমাছির মোম এই শ্রেণীর উদাহরণ। (২) প্রকৃত চর্বি পদার্থ বা ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride)। এই শ্রেণীর স্নেহপদার্থে প্রতিটি অণু এক অণু গ্লিসারল নামক তিনটি অ্যালকোহল জাতীয় হাইড্রক্সিলবর্গ সমন্বিত অ্যালকোহল ও তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিড-দ্বারা গঠিত। এইরূপ একটি অণুকে জল বিশ্লিষ্ট করিলে প্রথমে এক অণু ফ্যাটি অ্যাসিড বিচ্যুত হইয়া এক অণু ডাই-গ্লিসারাইড (digliceride) গঠিত হয় এবং এই ডাইগ্লিসারাইড একই প্রক্রিয়ায় পর্যায়-ক্রমে ভাঙিয়া গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

প্রাকৃতিক ট্রাইগ্লিসারাইডে বিভিন্ন প্রকার ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতি দেখা যায়। তছাড়া অধিকাংশ প্রাকৃতিক ফ্যাটি অ্যাসিডে জোড় সংখ্যক কার্বন অণু দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই কার্বন অণুর সংখ্যা ১০-এর অধিক হইলে তাহাকে বৃহদণু ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয়। ইহা সাধারণতঃ জলে অদ্রবণীয়। দশের কম কার্বনযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডকে ক্ষুদ্রাণু ফ্যাটি অ্যাসিড বলা হয় এবং এগুলি অধিকাংশই জলে দ্রবণীয়।

সংপৃক্ত ও অসংপৃক্ত স্নেহ (Saturated and unsaturated fat) ঃ যে সকল স্নেহ পদার্থে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সহিত কেবলমাত্র ১টি বণ্ড (single bond) দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাদের সংপৃক্ত স্নেহ বলে। পরন্তু যেসকল স্নেহ পদার্থে কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সহিত এক বা একাধিক ডবল বণ্ড (double bond) দ্বারা যুক্ত থাকে তাহাদের অসংপৃক্ত স্নেহপদার্থ বলে।

কঠিন স্নেহ (fat) এবং তেল (oil) চিনিবার সহজ উপায় ঃ

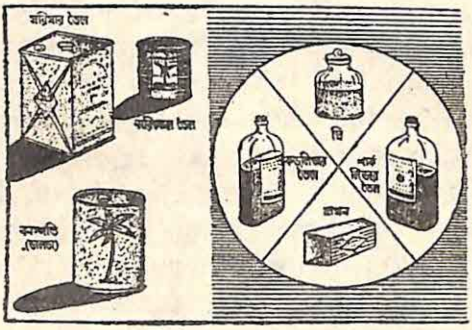
সাধারণভাবে আমরা স্নেহ পদার্থকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া থাকি—(১) কঠিন স্নেহ (fat) এবং তরল স্নেহ বা তেল (oil)। যে সকল স্নেহপদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায় (room temperature) এবং চাপে কঠিন আকৃতির হয় তাহাদিগকে কঠিন স্নেহ বা fat বলে ; যথা—বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, মাখন, বনস্পতি ইত্যাদি। স্নেহপদার্থ স্বাভাবিক উষ্ণতায় এবং চাপে তরল অবস্থায় থাকিলে উহাকে তেল বা oil বলে। যথা—সরিষার তেল, নারিকেল তেল ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে কঠিন স্নেহ এবং তরল স্নেহ পদার্থের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নাই। সব রকমের স্নেহ পদার্থের মূল রাসায়নিক উপাদান এক। একই স্নেহপদার্থ ঋতুভেদে কখন তরল কখন কঠিন আকার ধারণ করিতে পারে। আমাদের দেশে শীতকালে নারিকেল তেল জমিয়া কঠিন হইয়া যায়। সুতরাং ঐ সময় উহাকে কঠিন স্নেহ বা

fat বলা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে কিন্তু নারিকেল তেল তরল অবস্থায়ই থাকে। সুতরাং তখন উহাকে তরল স্নেহ বা oil বলে। অনুরূপভাবে ঘৃতকেও কঠিন এবং তরল উভয় প্রকার স্নেহদ্রব্যের মধ্যেই গণ্য করা যাইতে পারে।

উৎপত্তি অনুসারেও স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) উদ্ভিজ্জ স্নেহ (Vegetable fat) এবং (২) প্রাণিজ স্নেহ (Animal Fat)।

উদ্ভিদ্ জগৎ হইতে উৎপন্ন স্নেহপদার্থ উদ্ভিজ্জ স্নেহ নামে পরিচিত, যথা—সরিষার তেল, নারিকেল তেল, বনস্পতি ইত্যাদি।



উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ প্রাণিজ স্নেহ পদার্থ

প্রাণিজগৎ হইতে উৎপন্ন স্নেহ পদার্থকে প্রাণিজ স্নেহ বলা হয়, যথা ঘি, মাখন, মাছের তেল (কডলিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল), জন্তুর চর্বি ইত্যাদি। প্রাণিজ স্নেহে ভাইটামিন 'এ, ডি, ই, এবং কে,' পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ স্নেহে সাধারণতঃ এই জাতীয় ভাইটামিন দেখা যায় না। মাখন এবং চর্বি 'এ', এবং 'ডি', ভাইটামিনের উৎসরূপে গণ্য হয়।

স্নেহ পদার্থের উৎস ঃ স্নেহের পরিমাণ অনুযায়ী স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(১) প্রথম শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে শতকরা প্রায় একশত ভাগই স্নেহ। ইহারা স্নেহপ্রধান খাদ্য এবং স্নেহের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস-কেন্দ্র। ঘৃত (ghee), মাখন (butter), বিভিন্ন রকমের তেল, যেমন—বাদাম, সরিষা, তিল তেল, কড মাছের তেল, শার্কলিভার অয়েল, বনস্পতি ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে মাখন ব্যতীত প্রায় সমস্তই বিশুদ্ধ স্নেহ।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহজাতীয় খাদ্যে স্নেহের পরিমাণ শতকরা ৪০ হইতে ৬০ ভাগ। বিভিন্ন প্রকারের বাদাম (nuts), যেমন—চীনা বাদাম, কাজু বাদাম, পেস্তা (pistachio), আখরোট (wal nut), নারিকেল ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নেহ-পদার্থের অন্তর্গত।

(৩) তৃতীয় শ্রেণীর খাদ্যে স্নেহপদার্থের পরিমাণ খুবই সামান্য। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, যকৃত ইত্যাদি তৃতীয় শ্রেণীর স্নেহ পদার্থের উদাহরণ।

স্নেহ পদার্থের গুণাগুণ ঃ স্নেহ পদার্থ কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। উহাতে অক্সিজেন কম থাকে কিন্তু কার্বন ও হাইড্রোজেন খুব বেশী পরিমাণে থাকাতে উহাদের সাহায্যে প্রচুর কর্মশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট অথবা ১ গ্রাম প্রোটিনের দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশী তাপ উৎপন্ন করিতে সক্ষম।

স্নেহপদার্থ জলে অদ্রবণীয়। কাপড় কাচা সোডার জলীয় দ্রবণে স্নেহ ফুটাইলে সাবান এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিকে Saponification বলে। কোন কোন স্নেহ আলো বাতাসের সংস্পর্শে নষ্ট হইয়া যায়। মাখন অনেকদিন আলো ও বাতাসের সংস্পর্শে থাকিলে একটু অম্লস্বাদযুক্ত (rancid) হইয়া পড়ে।

বনস্পতি ঃ উদ্ভিজ্জ তেলে হাইড্রোজেন গ্যাস চালনা করিয়া বনস্পতি ঘি প্রস্তুত করা হয়। এই উদ্ভিজ্জ তেলে ভাইটামিন প্রায় নাই বলিলেই চলে। সামান্য পরিমাণ ভাইটামিন 'এ' কোন কোন উদ্ভিজ্জ তেলে দেখা যায়। তাহাও বনস্পতি প্রস্তুত করার সময় নষ্ট হইয়া যায়। ইহা ছাড়া স্নেহ পদার্থ যে সকল ফ্যাটি অ্যাসিড দ্বারা গঠিত তাহাদেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। তবে কখনও কখনও ভাইটামিন 'এ' মিশ্রিত করিয়া বনস্পতির খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

স্নেহপদার্থের দৈনন্দিন প্রয়োজন ঃ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে কিছু কিছু স্নেহ-পদার্থ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু কতটুকু থাকা অত্যাবশ্যক তাহা এখনও সঠিকরূপে নির্ণীত হয় নাই। তবে আমাদের দৈনিক প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তির শতকরা প্রায় ২০ হইতে ২৫ ভাগ স্নেহপদার্থ হইতে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। এই হিসাবে একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক লোকের প্রত্যহ ৭০-৮০ গ্রাম (ICMR এর সুপারিশ অনুযায়ী ৪০-৪৫ গ্রাম) স্নেহজাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য। দেহের অভ্যন্তরে একটু ফ্যাট সঞ্চিত না থাকিলে সামান্য অসুখেই মানুষ শীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়ে।

খাদ্য হইতে স্নেহপদার্থ গ্রহণের নীতি ঃ প্রাণিজ এবং উদ্ভিজ্জ উভয় প্রকার স্নেহপদার্থেরই তাপ উৎপাদন ক্ষমতা সমান। তবে প্রাণিজ স্নেহ যেমন মাখনে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' প্রচুর পরিমাণে দ্রবীভূত থাকে। এইজন্য প্রতিদিনকার খাদ্যের সঙ্গে কিছুটা দুধ এবং মাখন খাওয়া উচিত।

বর্তমানে পুষ্টিবিদ্‌রা মনে করেন যেসব ফ্যাটে সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বেশী থাকে তাহা রক্তের কোলেস্টেরল বাড়ায়। কোলেস্টেরলের আধিক্য ঘটিলে ধমনীর গায় কোলেস্টেরল সঞ্চিত হয় বা পলি পড়ে। ফলে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং ধমনীর স্থিতিস্থাপকতা কমিয়া যায়। ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ ঘি, মাখন, জান্তব চর্বি, বনস্পতি কিংবা ডিম বেশী পরিমাণে খাইলে রক্তনালীর রক্তজমাটবাঁধাজনিত ব্যাধির আশঙ্কা থাকে। অল্প পরিশ্রমী লোকেদের তাই সম্পৃক্ত স্নেহপদার্থ গ্রহণে সংযমী হওয়া দরকার। কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তিদের বেলা অবশ্য এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

ফ্যাট এবং তেলের পার্থক্য

ফ্যাট	তেল
যথা ঘি, মাখন, জান্তব চর্বি	যথা সরিষা, বাদাম, তিল ইত্যাদি [নারিকেল তেল ও বনস্পতি বাদে]
(১) সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী	সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ কম
(২) ক্যালরি মূল্য সমান	ক্যালরি মূল্য সমান

	ফ্যাট	তেল
(৩)	সমস্ত জান্তব ফ্যাটে যেমন মাখন, পাঁঠার চর্বি ইত্যাদিতে এবং সমস্ত জান্তব তেলে যেমন কড-লিভার, শার্ক লিভার ইত্যাদিতে ভাইটামিন 'এ' 'ডি' 'ই' এবং 'কে' পাওয়া যায়। তবে ঘি প্রস্তুতির সময় অনেকটা নষ্ট হয়।	বনস্পতি এবং নারিকেল তেল সহ সকল প্রকার তেল ভাইটামিন বর্জিত, বনস্পতিতে কখনও 'এ' যোগ করা হয়।
(৪)	অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে রক্তের কোলেষ্টেরল বাড়ায়	কোলেষ্টেরল বাড়ায় না
(৫)	গলনাঙ্ক বেশী—কক্ষ তাপে (room temperature) কঠিন অবস্থায় থাকে।	গলনাঙ্ক কম—কক্ষ তাপে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

7. **ভাইটামিন ও খনিজলবণ—উহাদের উৎপত্তি, কাজ ও পরিমাণ** (Vitamins and Minerals—Their sources, functions and requirements)

শরীর গঠনে প্রোটিনের পরেই খনিজ পদার্থ বা ধাতব লবণের স্থান। খাদ্যদ্রব্য পোড়াইলে ছাইয়ের মত অবশিষ্ট যে অংশটুকু পড়িয়া থাকে উহাই উক্ত খাদ্যে খনিজ লবণের পরিমাণ। আমাদের দেহের মোট ওজনের ৪ ভাগ হইল খনিজ পদার্থ। উহার মধ্যে আবার তিন-চতুর্থাংশ ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। পরিমাণের মাপকাঠিতে খনিজলবণকে সংখ্যাগুরু (major বা macro elements) এবং সংখ্যালঘু (minor বা trace elements) এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম ও লৌহ এই আটটি প্রধান বা সংখ্যাগুরু। পরন্তু আমাদের দেহে ম্যাঙ্গানীজ, তাম্র, আয়োডিন, জিঙ্ক, কোবাল্ট ও ফ্লোরিন আছে যৎসামান্য পরিমাণে। তাই উহাদের ট্রেস এলিমেণ্ট বলা হয়। অবশ্য পরিমাণে সামান্য হইলেও স্বাস্থ্যরক্ষায় উহাদের গুরুত্ব অসীম।

মানব দেহে খনিজ পদার্থ

পদার্থের নাম	দৈহিক ওজনের শতকরা কত ভাগ
ক্যালসিয়াম	১·৫—২·২
ফসফরাস	০·৮—১·২
পটাসিয়াম	০·৩৫
সালফার	০·২৫
সোডিয়াম	০·১৫
ক্লোরিন	০·১৫
ম্যাগনেসিয়াম	০·০৫
লৌহ	০·০০৪
ম্যাঙ্গানীজ	০·০০০৩
তাম্র	০·০০০১৫
আয়োডিন	০·০০০০৪

ইহাদের মধ্যে আবার ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম, লৌহ এবং ম্যাগনেসিয়াম প্রধান ক্ষার জাতীয় পদার্থ অর্থাৎ ইহাদের সাহায্যে দেহের ক্ষারীয় ভাব (alkalinity) বজায় থাকে। ম্যাঙ্গানীজ ও তাম্রও ক্ষারীয় পদার্থ তবে উহাদের পরিমাণ সামান্য। অ্যাসিড উৎপাদক পদার্থগুলির মধ্যে ফসফরাস ও ক্লোরিন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ক্ষার এবং অ্যাসিড উৎপন্নকারী পদার্থসমূহ উপযুক্ত অনুপাতে খাদ্যদ্রব্যে থাকিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।

খনিজ পদার্থগুলির কাজ ঃ (১) দেহের উপাদান গঠনে অংশ নেয়। (২) খাদ্য হইতে শক্তি অর্জনে সাহায্য করে। (৩) পেশী সঙ্কোচনে সহায়তা করে। (৪) দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষা করে এবং (৫) বিভিন্ন এনজাইম ও কো-এনজাইমকে সক্রিয় রাখে।

প্রধান প্রধান কাজের ভিত্তিতে খনিজ পদার্থগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) অস্থি, পেশী, রক্ত ইত্যাদি গঠনে যাহারা সক্রিয় অংশ নেয় যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, সালফার, ম্যাঙ্গানীজ ও তামা প্রধান।

(২) দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় যাহারা অংশ নেয় যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন ইত্যাদি।

(৩) খাদ্য হইতে শক্তি মুক্ত করিতে এবং অন্যান্য কাজে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে যাহারা সাহায্য করে যেমন সালফার, ফসফরাস, আয়োডিন ইত্যাদি।

খনিজ পদার্থগুলির কাজকর্ম চলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সঙ্গে একযোগে অস্থি ও দাঁতের গঠনে সাহায্য করে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ক্লোরিন শুধু দেহের জলীয় অংশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান নয়, পেশী সঙ্কোচনের জন্যও উহাদের প্রত্যেকের সঠিক পরিমাণে উপস্থিত থাকা দরকার। ইহারা আমাদের রক্তের আস্রবণের চাপ (Osmotic pressure) এবং pH-এর সমতা রক্ষা করিতে সাহায্য করে।

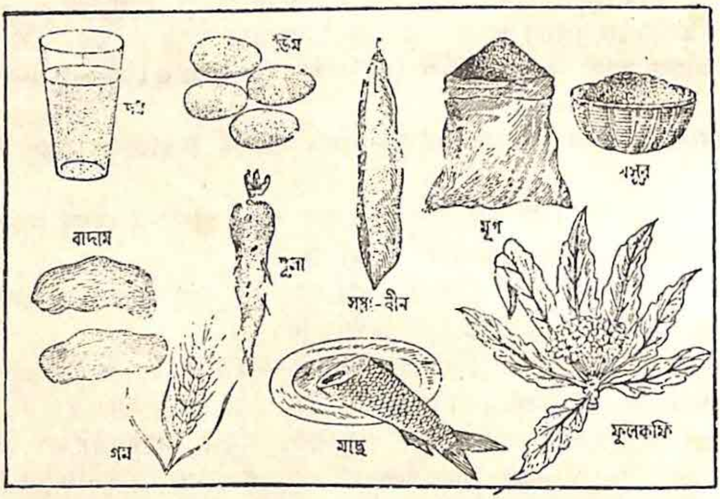
খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হইল এই যে শৈশবে, কৈশোরে, গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি অবস্থায় দেহ যখন গঠন ও বৃদ্ধির মুখে তখন প্রতিদিনের এবং প্রতিবারের খাদ্যে পর্যাপ্ত খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। বিশেষতঃ খাদ্যে ক্যালসিয়াম, লৌহ এবং আয়োডিনের উপস্থিতি অপরিহার্য। এই উপাদানগুলির অভাব হইলে একদিকে যেমন গঠন ব্যাহত হয় অপরদিকে তেমনি নানারকম অসুস্থতা ঘটিতে পারে, যেমন ক্যালসিয়াম ও ভাইটামিন ডি-এর অভাবে রিকেট, লৌহের অভাবে অ্যানিমিয়া এবং আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড (goitre) ইত্যাদি রোগ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য রন্ধনের ত্রুটির ফলে প্রায়ই আমাদের খনিজ পদার্থের ঘাটতি পড়ে।

ক্যালসিয়াম (Calcium)

মানবদেহে যতটা ক্যালসিয়াম আছে তাহার শতকরা ৯৯ ভাগ থাকে দাঁতে এবং হাড়ে। অস্থির উপাদানে শতকরা ৪ ভাগ হইল ক্যালসিয়াম। বাকি শতকরা ১ ভাগ থাকে রক্তে এবং দেহের জলীয় অংশে এবং কোমল তন্তুতে। ভাইটামিন ডি-এর সহিত ক্যালসিয়ামের যোগসূত্র আছে। 'ডি'র অভাবে দেহে ক্যালসিয়াম শোষিত হয় না ফলে

রিকেট রোগ দেখা দেয়। ক্যালসিয়ামের শোষণে ও বিপাকে প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন বিশেষভাবে সাহায্য করে।

কাজ ঃ ক্যালসিয়ামের প্রধান কাজ হইল (৩) ফসফরাসের সঙ্গে একযোগে অস্থি-র ও দাঁতের উপাদান গঠন করা। (২) রক্তে জমাট বাঁধান এবং (৩) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া অব্যাহত রাখা। (৪) খাদ্যের স্নেহপদার্থ এবং লৌহঘটিত লবণ শরীরের গ্রহণে সহায়তা করিয়া দেহের পুষ্টিবিধানে সহায়তা করা। (৫) কোন কোন এনজাইমকে



সক্রিয় রাখা এবং (৬) জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দীর্ঘায়ুলাভে সাহায্য করা। কোন কারণে প্যারাথাইরয়েড হরমোন অকেজো হইলে রক্তে ক্যালসিয়ামের সমতা থাকে না এবং বিষক্রিয়া দেখা দেয়।

উৎস ঃ দুধ, দই, গুঁড়া দুধ, পনীর, ডিমের কুসুম, বাদাম, বিভিন্ন প্রকারের ফল ও সবুজ শাকসবজি। ইহাদের মধ্যে পনীর ও দুধই ক্যালসিয়ামের শ্রেষ্ঠ উৎস। পালংশাকে অকজালিক অ্যাসিড আছে বলিয়া উহার ক্যালসিয়াম শরীরের কোন কাজে আসে না।

দৈনিক প্রয়োজনীয়তা ঃ একজন সুস্থ, স্বাভাবিক কর্মক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষের দৈনিক প্রায় ০·৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়, বাড়ন্ত শিশুদের দৈনিক প্রায় ০·৬ গ্রাম এবং গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী নারীর দৈনিক প্রয়োজন ১·০ গ্রাম। নারী এবং শিশুর ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন অন্যান্যদের তুলনায় বেশী।

অভাবের ফল ঃ (১) প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থি-র পুষ্টি ব্যাহত হয় এবং দাঁত ক্ষয় হইয়া পানসে হয়। (২) ক্যালসিয়ামের শোষণ এবং অস্থিতে সঞ্চিত হওয়ার কাজে ভাইটামিন ডির উপস্থিতি প্রয়োজন। উহাদের ঘাটতির ফলে রিকেট রোগ হইতে পারে। (৩) শারীরিক দৌর্বল্যও এই লবণটির অভাব সূচিত করে।

ফসফরাস (Phosphorus)

দেহের উপাদানের মধ্যে পরিমাণ হিসাবে ক্যালসিয়ামের পরেই ফসফরাসের স্থান।

কাজ : যেসব জৈবক্রিয়ায় ফসফরাস অংশ গ্রহণ করে সেগুলি এই :

(১) ক্যালসিয়ামের সাহায্যে হাড় ও দাঁতের কাঠামো তৈরি করে।

(২) খাদ্যদ্রব্য হইতে শক্তি মুক্ত করিতে সাহায্য করে।

(৩) দেহের জলীয় অংশের সমতা রক্ষায় সাহায্য করে।

(৪) কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ-পদার্থের বিপাকক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সহযোগী এনজাইমরূপে কাজ করে।

(৫) পেশী সঙ্কোচনে সাহায্য করে।

(৬) জীবকোষ সৃষ্টি এবং দেহের বৃদ্ধির জন্যও ইহার প্রয়োজন হয়।



উৎস : দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ফসফরাস পাওয়া যায়। তাছাড়া ডাল, বাদাম, গম, বাজরা, রাগী, জোয়ার, পালংশাক, মুলা, গাজর, ফুলকপি ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

দৈনিক প্রয়োজন : শিশু এবং সন্তানসম্ভবাদের ক্যালসিয়ামের সমতুল ফসফরাস প্রয়োজন। বয়স্কদের খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ১ : ২ অনুপাতে থাকা চাই। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে ফসফরাসের প্রাচুর্যের জন্য সাধারণতঃ শরীরে ইহার অভাব লক্ষিত হয় না। ফসফরাস ও ক্যালসিয়ামঘটিত খাদ্যদ্রব্য একত্রে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

অভাবের ফল : ক্যালসিয়ামের অভাবে ফসফরাস অস্থি ও দাঁতের পুষ্টিসাধন করিতে পারে না। ভাইটামিন-ডি এর অভাবে ফসফরাস শোষিত হইতে পারে না এবং উহার ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

লৌহ (Iron)

দেহের অসংখ্য কোষে কোষে খাদ্যকণাগুলিকে জারিত এবং আত্মস্থ করার জন্য লৌহের প্রয়োজন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ ব্যক্তির দেহে লৌহ থাকে ৩ হইতে ৫ গ্রাম। ইহা ট্রেস এলিমেন্টের অন্যতম। তথাপি মানবদেহে ইহার গুরুত্ব অসীম।

কাজ : হিমোগ্লোবিন নামে একটি রঞ্জক পদার্থ রক্তের লাল রঙ সৃষ্টি করে। হিমোগ্লোবিন থাকে রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে। হিমোগ্লোবিনের অন্যতম মূল উপাদান লৌহ। বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করিয়া এই হিমোগ্লোবিন দেহের বিভিন্ন কোষে প্রেরণ করে এবং খাদ্যকণাগুলি অক্সিজেনের সঙ্গে জারিত হইয়া শক্তি মুক্ত করে। হিমোগ্লোবিনে লৌহের অভাব ঘটিলে অক্সিজেনেরও অভাব ঘটে এবং বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়। তখন দৌর্বল্য, অবসাদ এবং কাজে অনিচ্ছা দেখা দেয়। (২) সামান্য পরিমাণ লৌহ কোন কোন এনজাইম গঠনে অংশ গ্রহণ করে।

লৌহের যে অংশ আমাদের শরীর গ্রহণ করিতে পারে না তাহা মলমূত্র, ঘাম এবং মেয়েদের মাসিক রক্তক্ষরণের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়।

লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য ঃ নিম্নলিখিত খাদ্যে লৌহঘটিত লবণ পাওয়া যায় ঃ—যকৃত, মাংস, ডিম, মাছ, বিভিন্ন প্রকারের ডাল, ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল, আটা, বাজরা, জোয়ার, রাগী, পালং শাক, তিল, পেঁয়াজকলি, মূলাশাক, তরমুজ, সয়াবীন, টমাটো, লাল শাক, নটে শাক, গুড়, বিন, উচ্ছে, করলা ইত্যাদি। কলেছাঁটা চাউল এবং ময়দায় খুব সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়।

লৌহঘটিত লবণের দৈনিক প্রয়োজন ঃ একজন সুস্থ, স্বাভাবিক কর্মক্ষম, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের দৈনিক খাদ্যে লৌহের পরিমাণ প্রায় ২৪ মিলিগ্রাম হওয়া প্রয়োজন। সাধারণতঃ নারী ও বর্ধিষ্ণু বালক বালিকাদের লৌহের প্রয়োজন পুরুষ অপেক্ষা বেশী। নারীর এই লৌহঘটিত অতিরিক্ত লবণের প্রয়োজন হয় দুইটি কারণে—(১) মাসিক রক্তস্রাবের সময় দেহ হইতে প্রচুর রক্ত বাহির হইয়া যায়। এই ক্ষয় পূরণ করার জন্য অতিরিক্ত লৌহঘটিত খাদ্যের প্রয়োজন। গর্ভবতী নারী তাহার সন্তানকে যে লৌহঘটিত খাদ্য অনবরত সরবরাহ করে তাহার এই ঘাটতি পূরণের জন্য অতিরিক্ত লৌহঘটিত খাদ্য প্রয়োজন।

একজন প্রসূতি নারীর দৈনিক প্রায় ৪০ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন। বর্ধিষ্ণু বালক বালিকার দেহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রক্তের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। এই অতিরিক্ত রক্ত প্রস্তুতির জন্য বালক বালিকার খাদ্যে লৌহের পরিমাণ বেশী হওয়া দরকার। তাহাদের দৈনিক প্রায় ২০-২৫ মিলিগ্রাম লৌহ প্রয়োজন।

লৌহের ঘাটতি পূরণের জন্য ৩-৪ মাস বয়স হইতেই শিশুদের ডিমের কুসুম এবং কিছু লৌহপ্রধান খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। নতুবা তাহারা অ্যানিমিয়ার কবলে পড়িবে কারণ শুধুমাত্র দুধে লৌহের পরিমাণ কম।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য তাম্র ব্যতীত লৌহ কাজ করিতে পারে না। আমাদের দেহে ১২ মিলিগ্রাম লৌহের প্রয়োজন হইলে অন্ততঃ ২ মিলিগ্রাম তাম্র প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় লৌহের সঙ্গে তাম্রের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়।

অভাবের ফল ঃ খাদ্যে লৌহঘটিত লবণের অভাব হইলে রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমিয়া যায়। ফলে বায়ু হইতে অক্সিজেন শরীরের বিভিন্ন অংশে পেঁছায় না। ইহাতে শরীর দুর্বল ও শ্রান্ত মনে হয় এবং পরিশেষে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। প্রোটিন খাদ্যের গুরুতর ঘাটতি হইলে লৌহাভাব জনিত হাইপোক্রোমিক অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে।

যেসব কারণে লৌহের অভাবজনিত অ্যানিমিয়া দেখা দেয় সেগুলি এই ঃ

(১) অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ যেমন কাটিয়া গেলে, অর্শ কিংবা ঋতুকালীন অতিরিক্ত রক্তস্রাবের ফলে,

(২) শৈশবে যখন রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন লোহার ঘাটতি হইলে,

(৩) দেহ কোন কারণে যেমন পেটের গোলমালে লৌহ শোষণে অসমর্থ হইলে,

(৪) প্রোটিনের গুরুতর অভাব হইলে।

আয়োডিন (Iodine)

মানবদেহে আয়োডিনের পরিমাণ ১২-১৫ মিলিগ্রাম। ইহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ থাইরয়েড গ্রন্থিতে অবস্থান করে। থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে ক্ষরিত হরমোনের নাম থাইরক্সিন। আয়োডিন অন্যান্য প্রোটিনের সঙ্গে থাইরক্সিনের মধ্যে থাকিয়া থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

উৎস ঃ সামুদ্রিক মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ও সবজিতে পাওয়া যায়।

দৈনিক প্রয়োজন ঃ ১০০-১৫০ মিলিগ্রাম।

অভাবের ফল ঃ কোন কোন এলাকার জলে এবং মাটিতে আয়োডিনের অভাব হইলে স্থানীয় অধিবাসীদের খাদ্যে এবং পানীয়ে আয়োডিনের অভাব দেখা যায়। আয়োডিন ঘাটতির ফলে গলগণ্ড, মিক্সিডিমা এবং ভ্রূণ ও শিশুদের দেহে ক্রেটিনিজম নামক গুরুতর ব্যাধি দেখা দেয়। আয়োডিনের অভাবের ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি যখন থাইরক্সিন সংশ্লেষে অক্ষম হয় তখন শিশুদের বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়, ফলে শিশুর শারীরিক ও মানসিক গঠন স্তিমিত হয়, বুদ্ধি অপরিণত হয় এবং শিশুটি বামন (dwarf) হয়। ইহাকেই বলে ক্রেটিনিজম। থাইরয়েড গ্রন্থির প্রোটিন উপাদানে ঘাটতি হইলে বয়স্কদের মিক্সিডিমার উৎপত্তি ঘটে। এই রোগে ন্যূনতম বিপাকক্রিয়া কমিয়া যায়, হাত পা ফোলে, চোখের চামড়া ঝুলিয়া পড়ে, চুল ঝরিয়া যায় এবং শারীরিক ও মানসিক স্থবিরত্ব আসে।

খাদ্যে ব্যবহৃত লবণের সঙ্গে আয়োডিন মিশ্রিত করিয়া লইলে আয়োডিনের অভাব দূর হয়।

7. ভাইটামিন (Vitamin)

উনবিংশ শতাব্দীতেই ভাইটামিনের অস্তিত্ব প্রথম আবিষ্কৃত হয়। খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ ও ধাতব লবণের প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতেই স্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু 1881 খ্রীঃ লুনিন যখন খাদ্যে ঐ সকল উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করিয়াও একটি ইঁদুরকে বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না, সেইদিন হইতে বৈজ্ঞানিকদের ভাবজগতে পরিবর্তন দেখা দিল। এই সময় জাপানী নৌ-সেনাদের মধ্যে বেরিবেরির প্রাদুর্ভাব হয়। বেরিবেরি কথাটির অর্থ হইল 'অতি দুর্বল'। এই রোগে ক্রমশঃ হাত পা দুর্বল হইয়া অবশেষে নাবিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জাপানী নৌবহরের প্রধান ডাক্তার টাকাকী লক্ষ্য করিলেন যে ইংরেজ এবং আমেরিকান নাবিকেরা এই রোগে আক্রান্ত হয় না এবং তাহাদের খাদ্য তালিকা জাপানী নাবিকদের খাদ্য তালিকা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। জাপানী নাবিকদের খাদ্যের একটি প্রধান অংশ ছিল কলেছাঁটা চাউল এবং ইহাই যে বেরিবেরি রোগের মূল কারণ এই ধারণা তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। সুতরাং তিনি নাবিকদের খাদ্যে কলে-ছাঁটা চাউলের পরিমাণ কমাইয়া বিভিন্ন ডাল, শস্যকণা, ইস্ট ইত্যাদির পরিমাণ বাড়াইয়া দিলেন। খাদ্যতালিকার এই পরিবর্তনের ফলে নাবিকদের মধ্যে বেরিবেরি রোগ ক্রমশঃ কমিয়া গেল। টাকাকী এই রোগ দূরীভুত করিতে পারিলেও উহার কারণ কিন্তু তিনি সঠিকরূপে নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

এই সময় 1897 খ্রীঃ ওলন্দাজ চিকিৎসক আইখম্যান যবদ্বীপে একটি জেলের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। জেলের কয়েদীদের কলেছাঁটা চাউল খাইতে দেওয়ায় তাহারাও জাপানীদের মত বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা যাইত। জেলের মুর্গীগুলিও এই চাউল খাইয়া 'পলিনিউরাইটিস' নামে এক অদ্ভুত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

এই রোগের ফলে মুর্গীগুলির ঘাড় বাঁকিয়া যাইত এবং তাহারা খোঁড়াইয়া হাঁটিত ; অবশেষে দুর্বল হইয়া একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হইত। অবস্থা দেখিয়া আইখম্যান বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ তিনি একদিন লক্ষ্য করিলেন যে অসুস্থ মুর্গীগুলির মধ্যে কয়েকটি বেশ সোজাভাবে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে কয়েকদিন যাবৎ মুর্গীগুলিকে কলেছাঁটা চাউলের পরিবর্তে সস্তাদামের ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের ভাত দেওয়া হইতেছে। তিনি উভয় প্রকার চাউলই খুব ভাল ভাবে লক্ষ্য করিলেন, কলে-ছাঁটা চাউল বেশ সাদা ধবধবে, কিন্তু ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের গায়ে লালচে মত কুঁড়ার একটি পাতলা আবরণ থাকে এবং কলে-ছাঁটা চাউলের মত উহা তত পরিষ্কার নয়। তিনি এই লালচে মত কুঁড়ার পাতলা আবরণটি পৃথক করিয়া লইলেন এবং জলে গুলিয়া রোগগ্রস্ত কয়েকটি মুর্গীকে খাওয়াইয়া দিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই রোগগ্রস্ত মুর্গীগুলি এই জল খাইয়া সুস্থ হইয়া উঠিল। এদিকে কয়েদীদেরও ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল খাইতে দেওয়ায় তাহারা আরোগ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং আইখম্যান এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ঢেঁকি-ছাঁটা চাউলের মধ্যে একটি অত্যাবশ্যক বস্তু আছে যাহা মানুষের বেরিবেরি এবং পাখীদের 'পলিনিউরাইটিস' রোগ প্রতিরোধ বা উপশম করিতে সহায়তা করে।

এদিকে বৈজ্ঞানিক হপ্‌কিন্সও 1906 সালে বিভিন্ন প্রাণীর উপর পরীক্ষা করিয়া প্রায় অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তিনি লক্ষ্য করিলেন যে শুদ্ধ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ এবং খনিজ-লবণ-যুক্ত খাদ্যে প্রাণী সকল শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু খাদ্য তালিকায় নিয়মিত একটু দুধের ব্যবস্থা করিলে রোগের উপসর্গ দূরীভূত হয়। সুতরাং দুধের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা এই রোগ প্রতিরোধ করিয়া দেহ সুস্থ রাখিতে সহায়তা করে।

অবশেষে 1912 খ্রীঃ বৈজ্ঞানিক ফুঙ্ক ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল হইতে এমন একটি জিনিস পৃথক্ করিতে সমর্থ হইলেন যাহা মানুষের বেরিবেরি এবং পাখীদের 'পলিনিউরাইটিস' রোগের প্রতিষেধক। তিনি এই নূতন পদার্থটির নাম দিলেন ভাইটামিন (Vitamine)। ফুঙ্ক মনে করিতেন যে এই নূতন গবেষণালব্ধ পদার্থটি প্রোটিনের অন্তর্গত অ্যামিনো অ্যাসিডের অনুরূপ। এইজন্য 'ভাইটা' (Vita যাহার অর্থ জীবন) কথাটির শেষে অ্যামিনো অ্যাসিডের 'অ্যামিন' (amine) কথাটি যুক্ত করিয়া ভাইটামিন (Vitamine) শব্দটির সৃষ্টি করেন। কিন্তু পরে দেখা গেল যে সমস্ত ভাইটামিনই অ্যামিন নয়, সুতরাং এখন ইংরেজী Vitamine শব্দটির শেষের e বর্জন করিয়া উহা Vitamin আকারে লেখা হয়।

এই ভাবে বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে বৈজ্ঞানিকগণ এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, খাদ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ পদার্থ এবং লবণসমূহ ব্যতীত আরও

এমন একটি সূক্ষ্ম উপাদানের প্রয়োজন যাহার অভাবে শরীর সহজেই বেরিবেরি, স্কার্ভি, রিকেটস্, পেলেগ্রা প্রভৃতি নানা রোগে আক্রান্ত হয় অথবা বিভিন্ন সংক্রামক রোগপ্রবণ হয়। ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলিতে আমরা খাদ্যের এই সূক্ষ্ম উপাদানটিকেই বুঝি।

অন্যান্য উপাদানের তুলনায় খাদ্যে ইহার প্রয়োজন অতি সামান্য। ভাইটামিনের সাহায্যেই দেহসংগঠক প্রোটিন এবং বিভিন্ন খনিজ লবণ দেহ গঠন সম্পূর্ণ করিয়া থাকে। ভাইটামিনসমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেহ গঠনে অংশ গ্রহণ না করিলেও ইহাদের অভাবে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন বা দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি বিভিন্ন ক্রিয়াগুলি সুসম্পন্ন হইতে পারে না। জীবদেহের এই সকল বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-কলাপ ইহাদের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া ভাইটামিনসমূহকে **জৈবিক অনুঘটক** (Biological catalyst) বলে। ইট, চুন, বালি ইত্যাদি গৃহনির্মাণের প্রধান উপাদান হইলেও এই সকল উপাদানসমূহ একত্রিত করিয়া গৃহের আকৃতিদান করিতে রাজমিস্ত্রি এবং সূত্রধরের প্রয়োজন হয়। দেহনির্মাণে ভাইটামিনসমূহ এই রাজমিস্ত্রী এবং সূত্রধরের কাজ করিয়া থাকে।

গৃহনির্মাণে যেমন কাজের প্রকারভেদে কেহ রাজমিস্ত্রি, কেহ বা সূত্রধর, তেমনি দেহের মধ্যেও ভাইটামিনসমূহের কাজের তারতম্য অনুসারে ইহাদের বিভিন্ন নামকরণ করা হইয়াছে। যে ভাইটামিন প্রধানতঃ চক্ষু, ফুসফুস্, পাকস্থলী এবং অন্ত্রের উপরে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাকে **ভাইটামিন "এ"** (Vitamin A) নামে অভিহিত করা হয়। মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র এবং বিভিন্ন মাংসপেশীর উপর ক্রিয়াশীল ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "বি"** (Vitamin B); আন্তঃকোষ সংযোজক পদার্থের রক্ষণাবেক্ষণকারী (inter cellular cementing substance) ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "সি"** (Vitamin C) এবং দাঁত ও হাড়ের উপর ক্রিয়াশীল ভাইটামিনকে **ভাইটামিন "ডি"** (Vitamin D) নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া **ভাইটামিন "ই"** (Vitamin E) **এবং ভাইটামিন "কে"** (Vitamin K)-এর অস্তিত্বও প্রমাণিত হইয়াছে।

এই সকল ভাইটামিনের মধ্যে কতগুলি আবার একাধিক ভাইটামিনের মিশ্রণে সংগঠিত। ইহাদের মধ্যে ভাইটামিন "বি"-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিনের মধ্যে "এ", "ডি", "ই" এবং "কে" স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয় এবং জলে অদ্রাব্য ; ভাইটামিন "বি" এবং "সি" জলে দ্রবণীয়।

ভাইটামিন 'এ'

ভাইটামিন 'এ' দুই শ্রেণীর—ভাইটামিন $এ_১$ বা রেটিনল এবং $এ_২$। প্রথমটিতে ডবল বণ্ড থাকে এবং দ্বিতীয়টিতে ডবল বণ্ড থাকে না। উভয়ের রাসায়নিক সংগঠনে এইটুকুই পার্থক্য।

উৎস : যে সকল খাদ্যে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন এ পাওয়া যায় : কড মাছের তেল (Cod liver oil), শার্ক মাছের তৈল (Shark liver oil), বিভিন্ন প্রকার তৈলজাতীয় মাছ (যথা, ইলিশ মাছ), ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি, যকৃৎ, বৃক্ক (kidney), বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, দুধ ইত্যাদিতে। আর পাওয়া যায় বিটা ক্যারটিন আকারে বিভিন্ন

শাকসব্‌জিতে। ম্‌লতঃ এই ভাইটামিনটির উৎস হইল উদ্ভিদের ক্যারটিন। গাঢ় সব্‌জ ও হল্‌দ রঙের সবজি ও ফলে ক্যারটিন পাওয়া যায়। যেমন পালং ও নটে শাক; গাজর; বাঁধাকপি, টমেটো, কড়াইশ্‌ঁটি, পাকা কুমড়া, পাকা আম, পাকা পেঁপে ইত্যাদিতে প্রচুর ক্যারটিন পাওয়া যায়। বিটা ক্যারটিন ভাইটামিন 'এ'র প্‌র্বস্তর বা precursor : তাই উহা প্রো-ভাইটামিন অব ভাইটামিন 'এ' নামেও পরিচিত। এক মলিকিউল বিটা ক্যারটিন দ্‌ই মলিকিউল ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন করে।



কাজ : ভাইটামিন "এ" (১) অন্ধকারে দেখিতে সাহায্য করে, (২) ত্বক্‌ ও শ্লেষ্মাঝিল্লিকে সুস্থ রাখিয়া দেহকে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত হইতে রক্ষা করে; (৩) খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষ্‌ধার উদ্রেক করিতে সহায়তা করে এবং (৪) রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখে। (৫) এতদ্ব্যতীত দেহের প্‌ষ্টি এবং বৃ্‌দ্ধিতেও ভাইটামিন "এ" সহায়তা করিয়া থাকে।

দৈনিক প্রয়োজন : ৪৫ কিগ্রা ওজনের একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক নারীর দৈনিক প্রয়োজন ৭৫০-৩০০০ মাইক্রোগ্রাম। গর্ভাবস্থায়ও ঐ পরিমাণ হইলে চলে তবে স্তন্যদানকালে উহার মাত্রা বাড়াইয়া ১১৫০-৪৬০০ মাইক্রোগ্রাম করা উচিত। ১-৫ বৎসর পর্যন্ত শিশ্‌দের জন্য ৩০০-১২০০ মাইক্রোগ্রাম প্রয়োজন। শিশ্‌দের প্রতিদিন পরিমিত দ্‌ধ, ডিম, মাছ, সামান্য মাখন, গাঢ় সব্‌জ ও হল্‌দ শাকসবজি ও কিছ্‌ ফল দিলে প্রয়োজন মিটিতে পারে।

অভাবের ফল : ভাইটামিন-এর অভাবজনিত নানা রোগ আছে।

(১) এ ভাইটামিনের ঘাটতি হইলে রাতকানা রোগ দেখা দেয় অর্থাৎ রাতে অথবা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা ঘটে।

(২) **জেরোথালমিয়া ও ক্যারাটোম্যালেসিয়া :** 'এ' ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগ। এই সম্বন্ধে পরে বিশদ আলোচনা আছে।

(৩) আবরণী কলার ক্ষয় ঃ ভাইটামিন-এর নিরবচ্ছিন্ন অভাবের ফলে আবরণী কলার কোষগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। ফলে রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে।

এতদ্ব্যতীত এই ভাইটামিনটির অভাবে অস্থি-র বৃদ্ধি স্তিমিত হয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতে প্রজনন ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং স্নায়বিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।

বেশী খাওয়ার অপকারিতা ঃ বেশ কিছুদিন যাবৎ অধিকমাত্রায় ভাইটামিন-এ সেবন করিলে যেমন শিশুদের বেশী করিয়া কডলিভার অয়েল খাওয়াইলে শরীরে বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। বিষক্রিয়ার লক্ষণ হইল ক্ষুধামান্দ্য, মাথাধরা; ত্বক্ খসখসে হওয়া, চুল পড়া, বমি ভাব, হাড়ে কিংবা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা হওয়া, দৈহিক ওজন হ্রাস, চোখের ক্ষত ইত্যাদি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়।

ভাইটামিন ডি (Calciferol)

ভাইটামিন ডি২ এবং ডি৩-এর রিকেট রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে। উহা Anti Rachitic Vitamin নামেও পরিচিত।

উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উৎস ঃ উদ্ভিদের দেহে আরগোস্টেরল (Ergosterol) নামক একটি পদার্থ আছে—উহার উপর সূর্যের আলোক পড়িয়া ক্যালসিফেরল বা ভাইটামিন



ডি২ তৈরি হয়। আমাদের ত্বকে বা প্রাণিদেহে যেমন মাছের শরীরে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি পড়িলে ত্বকের 7-ডিহাইড্রোকোলেস্টেরল নামক পদার্থ ডি৩তে

রূপান্তরিত হয়। খাদ্যে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসঘটিত লবণের অভাব হইলে বা উহারা উপযুক্ত পরিমাণে না থাকিলে রিকেট রোগের সৃষ্টি হয়। কিন্তু খাদ্যে ভাইটামিন ডির অভাব হইলে উপরোক্ত লবণ দুইটি থাকা সত্ত্বেও এই রোগ সৃষ্টি হইতে পারে।

আমাদের দেশে পর্যাপ্ত সূর্যালোক আছে বলিয়া ভাইটামিন ডির অভাবজনিত রোগ কম দেখা যায়।

কাজ : (১) ইহা অন্ত্র হইতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসঘটিত লবণ শোষণে সহায়তা করিয়া দেহের অস্থি ও দাঁতের কাঠামো গঠনে সাহায্য করে। (২) প্যারা-থাইরয়েড হরমোনের কাজে সহায়তা করে।

উৎস : ভাইটামিন ডি বেশী পাওয়া যায় কড মাছ ও শার্ক লিভার অয়েলে। কিছুটা পাওয়া যায় খয়রা মাছ, ডিমের কুসুম, মাখন ও দুধে।

দৈনিক প্রয়োজন : শিশু ও গর্ভবতী মায়েদের ৪০০-৮০০ I.U. প্রয়োজন।

অভাবের ফল : (১) রিকেট—শিশুদের হাড় নরম ও অপরিণত হওয়ার ফলে বৃদ্ধি হয় না, দেহের চাপে বাঁকিয়া যায়। অন্তঃসত্ত্বা নারীর খাদ্যে পর্যাপ্ত ক্যালসিয়াম না থাকিলে সন্তানদের এই রোগের আশঙ্কা থাকে। যথেষ্ট পরিমাণে সূর্যালোকের অভাবেও রিকেট হইতে পারে।

(২) দাঁতের গঠন ব্যাহত হয়, দাঁত উঠিতে বিলম্ব হইতে পারে, উঠিলেও দাঁত অগঠিত থাকে।

(৩) অস্টিয়োম্যালেসিয়া (Osteomalacia বা adult ricket) :

এই রোগে বয়স্কদের হাড় হইতে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস ক্ষয় হইয়া ক্রমশঃ উহা নরম ও দুর্বল হইয়া পড়ে। হাঁটাচলা করিতে কষ্ট বোধ করা এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে ধরা যাইতে পারে। এই রোগে ক্রমশঃ পা দুর্বল হইয়া পড়ে এবং হাতের উপর ভর দিয়া চলিতে হয়। শেষ অবস্থায় পায়ের হাড় ও মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যাইতে পারে। গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারীদের এই রোগের শিকার হইতে দেখা যায়।

প্রধানতঃ ভাইটামিন ডি এবং ক্যালসিয়ামের অভাবের জন্যই এই রোগ হইয়া থাকে। তবে স্নেহপদার্থে ডি ভাইটামিন দ্রবণীয় বলিয়া দেহ যদি স্নেহপদার্থ গ্রহণে অসমর্থ হয় তাহা হইলেও এই রোগ হইতে পারে। প্রত্যহ ২/৩ চামচ কডলিভার খাইলে সহজেই এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে।

অতি সেবনের কুফল : অতিরিক্ত মাত্রায় ভাইটামিন ডি গ্রহণ করিলে বিষক্রিয়া হইতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য; বমিভাব, পাতলা দাস্ত, মাথার পিছনে অসহ্য যন্ত্রণা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয় এবং শেষে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। অতিরিক্ত সেবনে রক্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস বাড়িয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক এবং ধমনীতে জমা হইয়া বিক্রিয়া ঘটায়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়।

ভাইটামিন ই (Tochoferol)

ভাইটামিন-ইর অপর নাম টোকোফেরল (Tocos=child birth,—pheros=to bear)। ইহা একটি অ্যালকোহল বিশেষ।

বিজ্ঞানী ইভানস্ ১৯২২ সালে ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করিয়া নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেন যে খাদ্যে ভাইটামিন-ইর অভাব হইলে স্ত্রী ইঁদুরগুলির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য বহুদিন পর্যন্ত ইহা অনুর্বরতারোধক ভাইটামিন নামেই পরিচিত ছিল। তবে মানুষের ক্ষেত্রে উহার বাস্তবিকই বন্ধ্যাত্ব মোচনের ক্ষমতা আছে কিনা এখন পর্যন্ত তাহা প্রমাণিত হয় নাই। তবে ভাইটামিন-ই দেহে ভাইটামিন-এ সঞ্চিত হইতে এবং স্নেহ-পদার্থ সংরক্ষণে সাহায্য করে। অনেকে মনে করেন ইহা রক্তের লোহিতকণিকা রক্ষায় সাহায্য করে। অকালবার্ধক্যে দেহ মন নিস্তেজ হইয়া পড়িলে এই ভাইটামিন ব্যবহারে যৌবনের আনন্দ ও উৎসাহ ফিরিয়া আসে, এইজন্য এই ভাইটামিনকে 'যৌবন সঞ্জীবনী' নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে।

উৎস ঃ প্রায় সব খাদ্যেই ইহা কম বেশী পাওয়া যায়। শাকসবজি প্রধান উৎস, ডিমের কুসুম, গমের অঙ্কুর, মটরশুঁটি, অঙ্কুরিত দানা ছোলা ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে এবং যকৃতে সামান্য পরিমাণে পাওয়া যায়।



দৈনিক প্রয়োজন ঃ ৫ হইতে ১৫ মিলিগ্রাম।

অভাবের ফল ঃ অপরিণত দেহী শিশু ও বালকদের ক্ষেত্রে এই ভাইটামিনের অভাবে রক্তকণিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শ্বেতকণিকা বিনষ্ট হইতে পারে।

ভাইটামিন কে (Vitamin K)

১৯৩৫ সালে ডাঃ ড্যাম (Dr. Dam) প্রথম লক্ষ্য করেন যে রক্তের ক্ষরণ বন্ধ করিতে হইলে কেবলমাত্র ক্যালসিয়ামের উপস্থিতিই যথেষ্ট নয়, একটি বিশিষ্ট

ভাইটামিনও এই ক্ষরণ বন্ধ করিতে প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই ভাইটামিনকে তিনি ভাইটামিন 'কে' নামে অভিহিত করিয়াছেন। "Kogulations Vitamin," (ইংরাজী Coagulation শব্দের অর্থ জমাট বাঁধা) শব্দটির সংক্ষিপ্ত নামকরণ হইল 'K' ভাইটামিন। শরীরে সাধারণতঃ এই ভাইটামিনের অভাব হয় না, কারণ অন্ত্রের



জীবাণু খাদ্যদ্রব্য হইতে শরীরের মধ্যে এই ভাইটামিন প্রস্তুত করিয়া থাকে। গর্ভবতী নারীকে গর্ভের শেষ মাসে প্রতিদিন 1 মিলিগ্রাম করিয়া ভাইটামিন 'কে' দেওয়া হইলে অত্যধিক রক্তপাতের ভয় থাকে না। ইহার অভাবে পিত্তের স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

সবুজ শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, বাঁধাকপি, ফুলকপি ইত্যাদিতে ভাইটামিন 'কে' প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। চাউল, আটা, বাজরা, জোয়ার ইত্যাদিতে এবং বিভিন্ন প্রকার ফলে ইহা অল্প পরিমাণে থাকে।

ভাইটামিন 'সি' (Vitamin C বা Ascorbic Acid)

প্রয়োজনীয়তা ঃ (১) খাদ্যের ভাইটামিন 'সি' স্কার্ভি (scarvy) রোগের উপশম করে এবং এইজন্য ইহাকে Anti-scorbutic ভাইটামিনও বলা হয়। (২) দাঁত ও হাড়ের পুষ্টিসাধন এবং (৩) রক্তের বিশুদ্ধতা ও স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিতেও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে। (৪) ইহা পাকস্থলী সুস্থ রাখে এবং (৫) বিভিন্ন রোগজীবাণুর হাত হইতে দেহকে রক্ষা করে।

উৎস ঃ আমাদের দৈনিক খাদ্যের একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ প্রধানতঃ টাটকা শাক-সবজি ও সাইট্রাস জাতীয় ফল, যেমন—লেবু, আমলকি, কমলালেবু; মুসাম্বি

১. ডেনমার্কে এই ব্যাপারে প্রথম পরীক্ষা হয়। Kogulation শব্দটি বোধহয় ইংরেজী Coagulation শব্দেরই ডেনিশ প্রতিরূপ।

ইত্যাদিতে, তাছাড়া অংকুরিত ছোলা, মুগ, কুল, টম্যাপারি, লিচু, ন্যাসপাতি, তরমুজ, ফুটি, পেঁপে, আপেল, আঙ্গুর, আনারস ইত্যাদি নানারকম ফলে পাওয়া যায়।

দৈনিক প্রয়োজন ঃ দিনে ৫০ মিলিগ্রাম হইলেই চলে।

অভাবের ফল ঃ শিশুদের যদি এই ভাইটামিনটির অভাব হয় তবে ঘাটতির স্তর অনুযায়ী নানা রকম উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যেমন—মাড়ি ফুলিয়া ওঠা, বৃদ্ধির গতি মন্থর হওয়া, ওজন হ্রাস পাওয়া, গায়ে কালশিরা পড়া, গোড়ালি ও কব্জি ফুলিয়া ওঠা, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি।

বয়স্কদের মাড়ি ফুলিয়া ওঠে, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে, কালশিরা পড়ে, কিটোসিস (Ketosis) নামক চর্মরোগ দেখা দেয়, অ্যানিমিয়া এবং দুর্বলতাও থাকে। ক্ষত সারিতে এবং ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগিতে বিলম্ব হওয়া ভাইটামিন 'সি'র অভাব সূচনা করে।

গুরুতর ঘাটতি হইলে 'স্কার্ভি' নামক রোগ দেখা দেয় এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রকট হয় ঃ—

(১) কিটোসিস নামক চর্মরোগ দেখা দেয়—ইহাতে ত্বক্ শক্ত ও খসখসে হইয়া আসে।

(২) কৈশিক নালির কোষের অভ্যন্তরস্থ সিমেন্ট জাতীয় পদার্থ নষ্ট হওয়ার ফলে দাঁত দিয়া, ক্ষুদ্রান্ত্রে এবং মাংসপেশী ফাটিয়া রক্ত পড়ে।

(৩) অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

(৪) হাড়ে এবং টেন্ডনে ব্যথা হয়।

(৫) রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না। রক্তের অণুচক্রিকা এবং লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। সর্দিকাশির প্রবণতা বাড়ে।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ ইহা সহজেই জলে দ্রবণীয়। সুতরাং জলে ভিজাইয়া রাখিলে কিংবা সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে সহজেই নষ্ট হয়। উপরন্তু এই খাদ্যপ্রাণটি উত্তাপে সংবেদনশীল। সুতরাং রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে কিংবা বারবার খাদ্যদ্রব্য গরম করিলে সহজেই নষ্ট হয়।

শুষ্ক ফল ও তরকারিতে 'সি' ভাইটামিন থাকে না।

ভাইটামিন বি-কমপ্লেকস্

জলে দ্রবণীয় ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি'। বি-কমপ্লেকস্ একটিমাত্র ভাইটামিন নয়। পরন্তু এখানে একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন সত্তার অনেকগুলি ভাইটামিন সম্মিলিত ভাবে রহিয়াছে। পুষ্টিরক্ষায় এই ভাইটামিনগুলির প্রত্যেকের যেমন একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে তেমনি ইহারা সকলে যৌথভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় কাজ করে। একটির অভাবজনিত অপুষ্টির লক্ষণগুলি সুস্পষ্ট হইলেও দলভুক্ত অন্যান্যদের ক্রিয়াকলাপও তাহাতে ব্যাহত হইতে পারে। অর্থাৎ একটির ঘাটতিতে সমগ্র গোষ্ঠীর অপুষ্টি হইতে পারে।

কাজ ঃ ভাইটামিন বি-কমপ্লেকস্ গোষ্ঠীর প্রধান কাজ হইল বিশেষ বিশেষ এনজাইমের অংশ হিসাবে খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থকে বিশ্লিষ্ট করা

এবং উহাদের অন্তর্নিহিত শক্তিকে মুক্ত হইতে সাহায্য করা। খাদ্যের এবং দেহকোষের বিপাকক্রিয়ায় উহারা অচ্ছেদ্য এবং অপরিহার্য অংশ। স্বভাবতঃই এই ভাইটামিন গোষ্ঠীর ঘাটতি হইলে বিপাকক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে এবং নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়।

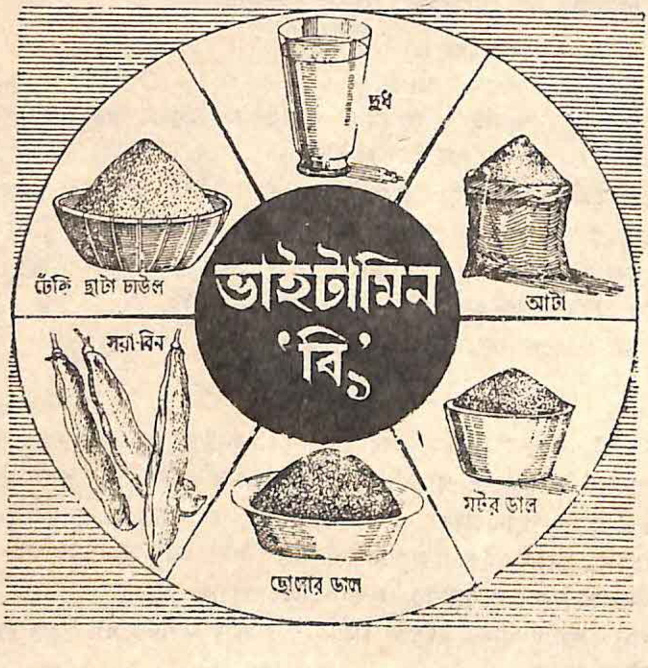
বি-কমপ্লেকস্ গোষ্ঠীভুক্ত ভাইটামিনগুলির মধ্যে পুষ্টির দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল ঃ

(১) বি$_১$ বা থায়ামিন (Thiamine)
(২) বি$_২$ বা রাইবোফ্লাবিন (Riboflavin)
(৩) বি$_৬$ বা পাইরিডক্সিন (Pyridoxine)
(৪) ফোলিক অ্যাসিড (Pteroyglutamic acid)
(৫) নিকোটিনিক অ্যাসিড (Niacin)
(৬) বি$_{১২}$ (Cyanocobalamin)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ এই গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি ভাইটামিন জলে দ্রবণীয়।

ভাইটামিন বি$_১$ (Thiamine)

১৯১২ সালে ক্যাসিমিন ফ্রাঙ্ক ইহা আবিষ্কার করেন। সমস্ত ভাইটামিনের মধ্যে এইটিই সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়।



রাসায়নিক উপাদান ঃ পিরাইমেডিন নিউক্লিয়াস এবং থিয়াজোল রিং-এর সমন্বয়ে গঠিত থায়ামিন। হাইড্রোক্লোরাইড সল্টরূপেও আমরা অনেক সময় ইহা পাইয়া থাকি।

কাজ ঃ (১) থায়ামিনের প্রধান কাজ হইল কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ গ্রহণ করিয়া শক্তি মুক্ত করা। এই শক্তি আমরা শ্রমে ব্যবহার করিয়া থাকি। (২) এতদ্ব্যতীত স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখিতে, (৩) স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় রাখিতে এবং (৪) বিপাক-ক্রিয়ায় অংশ লইয়া দেহের বৃদ্ধিতেও সহযোগিতা করে।

উৎস ঃ শস্যজাতীয় খাদ্য, যেমন—ঢেঁকিছাঁটা চাউল, গম, ছোলা, মটর, বীট, শালগম, ফুলকপি, নাশপাতি, বরবটি ইত্যাদি ফল ও সবজিতে থায়ামিন পাওয়া যায়। দুধ, ডিমের কুসুম এবং মাংসেও থায়ামিন আছে।

দৈনিক প্রয়োজনীয়তা ঃ সাধারণ খাদ্যের প্রতি ১০০০ ক্যালরিতে ০·৪ মিলিগ্রাম হিসাবে গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ থায়ামিন জলে দ্রবণীয়। তাই শাকসবজির সিদ্ধ জল কিংবা ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে এই ভাইটামিন নষ্ট হয়। উচ্চ তাপেও ইহা কিছুটা নষ্ট হয়। চাল ও গমের লাল খোসাটি থায়ামিনসমৃদ্ধ। কলে ছাঁটা চাউল এবং সাদা ময়দায় তাই থায়ামিন থাকে না বলিলেই চলে।

অভাবের ফল ঃ মৃদু ঘাটতি হইলে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, আবেগ প্রবণতা, খিটখিটে মেজাজ, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, দুর্বলতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়। একটু বেশী ঘাটতি হইলে হজমের গোলমাল, মাথাধরা, অনিদ্রা, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি দেখা দেয়। বেশী ঘাটতি হইলে বেরিবেরি নামক রোগে আক্রান্ত হয়। এইজন্য ইহাকে বেরিবেরি প্রতিরোধক ভাইটামিনও বলা হয়। বেরিবেরি আর্দ্র এবং শুষ্ক দুই শ্রেণীর। বেরিবেরি রোগের লক্ষণ অত্যন্ত জটিল। এই রোগে (১) হাত-পা অবশ হইয়া যায়, (২) হৃৎপিডের দুর্বলতা দেখা দেয়, (heart dilution) (৩) কখনও শোথ রোগ বা oedema-র আক্রমণ ঘটে. (৪) স্নায়ুতন্ত্র পীড়িত হইয়া দেহের পঙ্গুতা (paralysis) ও (৫) মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। শেষে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

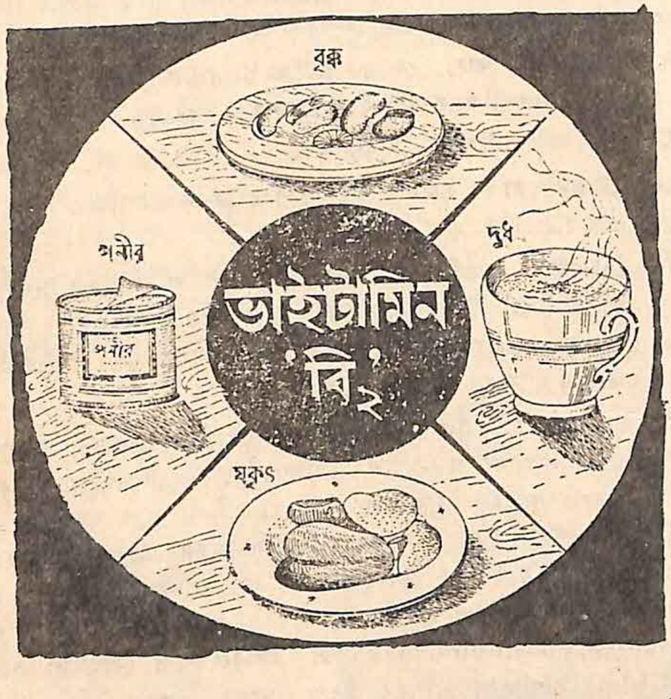
ভাইটামিন বি$_2$ (Riboflavin)

রাসায়নিক উপাদান ঃ ফ্লোবিনের সঙ্গে রাইবোজ শর্করার সংযোগে রাইবোফ্লাবিন গঠিত। ইহা স্বরূপে থাকিতে পারে কিংবা প্রোটিনের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া ফ্লোবোপ্রোটিন হিসাবে আমাদের শরীরে থাকে।

কাজ ঃ ইহার প্রধান কাজ হইল অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কার্বো-হাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়া শক্তি মুক্ত করিতে ও সেই শক্তিকে আত্মস্থ হইতে সাহায্য করা। ইহার সাহায্যে যৌবনকাল বহুদিন পর্যন্ত অটুট রাখিয়া দীর্ঘজীবী হওয়া যায়। ত্বকের সজীবতা, সুষ্ঠু পরিপাক ক্রিয়া এবং স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তির জন্যও এই প্রকার ভাইটামিন প্রয়োজন।

উৎস ঃ দুধ এবং অঙ্কুরিত শস্যে এই ভাইটামিন প্রচুর পরিমাণে আছে। তাছাড়া সবুজ শাকসবজি, কড়াইশুঁটি, বিন, সিম, মাছ, মাংস এবং ডিমেও সন্তোষজনক পরিমাণে পাওয়া যায়।

দৈনিক প্রয়োজনীয়তা ঃ শিশুর খাদ্যে ০·৬ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ১·৩—১·৫ মিগ্রা. হইলেই চলে।



চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঃ রন্ধনের ফলে অল্পই নষ্ট হয় তবে জলে দ্রবণীয়। তাই শাকসবজি সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিলে অনেক ভাইটামিন নষ্ট হয়। শাকসবজি এবং দুধ বেশীক্ষণ রৌদ্র কিংবা আলোকে রাখিয়া দিলেও রাইবোফ্লাবিন নষ্ট হইয়া যাইবে।

অভাবের ফল ঃ খাদ্যে এই ভাইটামিনটির অভাব হইলে জিহ্বার স্ফীতি এবং মেজেন্টা রঙ দেখা দেয়। মুখ ও ঠোঁটের কোণায় ঘা, ত্বক কুঁচকাইয়া আঁশ আঁশ হইয়া যাওয়া এই প্রকার ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। চোখ জ্বালা করা এবং দৃষ্টি-শক্তির অস্পষ্টতাও এই প্রকার ভাইটামিনের অভাবে দেখা দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি স্তিমিত হয় এবং ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়, চুল পড়িয়া যায়।

ভাইটামিন বি$_6$ (Pyridoxine)

এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত তিনটি পদার্থ পাইরিডকসল, পাইরিডকসাল ও পাইরিড-কসামিনের মধ্যে পাইরিডকসাল বেশী সক্রিয়।

কাজ ঃ নিম্নস্তরের প্রাণীদের পক্ষে অপরিহার্য তবে মানুষের পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা সঠিকভাবে জানা যায় নাই। গুরুতর স্নায়ু দৌর্বল্য, অনিদ্রা, খিটখিটে মেজাজ, পেটের যন্ত্রণা এবং চলাফেরার অসুবিধা ইত্যাদি উপসর্গগুলি যখন থায়ামিন,

রাইবোফ্লাবিন এবং নায়াসিনের দ্বারা দূর হয় না তখন বি৬ প্রয়োগে সুফল পাইতে দেখা গিয়াছে।

দৈনিক প্রয়োজন ঃ ০·২-১ মিলিগ্রাম।

উৎস ঃ চাল, গম, মাছ, মাংস, সবুজ সবজি এবং অঙ্কুরিত শস্যে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

অভাবের ফল ঃ যেসব খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থায়ামিন এবং রাইবোফ্লাবিন থাকে সেসব খাদ্যে পাইরিডক্সিনও পাওয়া যায় বলিয়া সচরাচর এই ভাইটামিনটির অভাবজনিত রোগ দেখা যায় না। তবে শিশুখাদ্যে ইহার অভাব হইলে বৃদ্ধি স্তিমিত হয় এবং অ্যানিমিয়া হইতে পারে।

ফোলিক অ্যাসিড (Pteroyglutamic Acid)

রাসায়নিক উপাদান ঃ টাইরোগ্লুটামিক (Pteroylglutamic acid), টেরিডিন (pteridine), প্যারা অ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিড (para amino benjoic acids) এবং গ্লুটামিক অ্যাসিডের সমন্বয়ে গঠিত এই ভাইটামিন। প্যারা অ্যামাইনো বেনজোয়িক অ্যাসিডটি ফোলিক অ্যাসিডের পূর্বস্তর বা precursor।

কাজ ঃ কোষের নিউক্লিওপ্রোটিন সংশ্লেষের কাজে ফোলিক অ্যাসিড অপরিহার্য। নতুন রক্তকণিকা সৃষ্টিতেও ইহা অংশ নেয়। কোষের নিউক্লিয়াস সৃষ্টিতে এবং কোষ বিভাজনে ইহা সাহায্য করে।

উৎস ঃ মেটে ও মাংসে, গাঢ় সবুজ শাক বিশেষতঃ হিঞ্চে এবং পালং শাকে এই ভাইটামিনটি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। তেল মশলা সহযোগে রান্নার চেয়ে সিদ্ধ খাবারে ফোলিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকে।

অভাবের ফল ঃ মানুষের ক্ষেত্রে ফোলিক অ্যাসিড়ের অভাবের ফলে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া এবং লিউকোপেনিয়া (Leucopenia) অর্থাৎ রক্তে শ্বেতকণিকার সংখ্যা হ্রাস, ওজন হ্রাস এবং দাস্ত হইতে দেখা যায়। পরন্তু বানর ও ইঁদুরের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি স্তিমিত, রক্তাল্পতা এবং শ্বেতকণিকার সংখ্যা হ্রাস পাইতে দেখা যায়।

নিকোটিনিক অ্যাসিড (Niacin)

এই ভাইটামিনটিও বি-কমপ্লেকস্ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এলভিজ্যাম (Elvehjem) এবং তাঁহার সহকর্মীরা প্রথম ইহার নামকরণ করেন।

কাজ ঃ থায়ামিন ও রাইবোফ্লাবিনের মত ইহাও পরোক্ষভাবে কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজমে সাহায্য করে।

উৎস ঃ মাছ, মাংস, ডিমে নায়াসিন থাকে। আস্ত দানাশস্যে এই ভাইটামিনটি থাকিলেও কলে ছাঁটাই করার ফলে ইহার বেশীর ভাগ নষ্ট হইয়া যায়। কিছু কিছু সবুজ শাকেও কিছুটা পাওয়া যায়।

নায়াসিনের জৈবরাসায়নিক পূর্বস্তর হইল অন্যতম অপরিহার্য অ্যামিনো অ্যাসিড ট্রিপটোফ্যান। সুতরাং যে খাদ্যে ট্রিপটোফ্যান আছে তাহাতে নায়াসিনও পাওয়া যাইবে। তবে নায়াসিনে রূপান্তর ঘটাইবার জন্য পাইরিডক্সিনের উপস্থিতি অপরিহার্য।

দৈনিক প্রয়োজন ঃ দৈনিক প্রয়োজন ১৪-১৯ মিলিগ্রাম তবে গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর প্রয়োজন কিছু বেশী।



অভাবের ফল ঃ ঘাটতির ফলে (১) শিশুদের বৃদ্ধি স্তিমিত হয়, (২) অবসাদ, মাথাধরা, ক্ষুধামান্দ্য, ওজন হ্রাস, (৩) জিহ্বা ও মুখে ঘা, (৪) পাতলা দাস্ত, (৫) চর্মরোগ, (৬) অ্যানিমিয়া, (৭) মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও বিকার দেখা দেয়। গুরুতর ঘাটতির ফলে পেলেগ্রা নামে এক বিশেষ ধরনের রোগ হয়। উত্তর প্রদেশ অঞ্চলে যেখানে খাদ্যে ভুট্টার বহুল ব্যবহার আছে সেখানে এই পেলেগ্রা রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ভুট্টার মধ্যে ট্রিপটোফ্যানের অভাব আছে। পেলেগ্রার উপসর্গ হইল (১) শুষ্ক ত্বক্ (dry skin), চর্মে ঘা (dermititis), পাতলা দাস্ত (diarrhoea), বুদ্ধিভ্রংশ (dementia), প্রলাপ বকা (delirium) এবং অবসাদ (depression) সর্বশেষে মৃত্যু (death)। পেলেগ্রা প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে বলিয়া ইহাকে পেলেগ্রা রোগ প্রতিরোধক ভাইটামিনও বলা হয়।

ভাইটামিন বি$_{১২}$ (Cyanocobalamin)

ভিটামিন বি$_{১২}$-এর উপাদান হইল কোবালট ধাতু। কোবালামিনরূপে ইহা মানবদেহে প্রয়োগ করা হয়।

কাজ ঃ (১) লোহিত কণিকা উৎপাদন ও বৃদ্ধির সহায়তা করে।

(২) অস্থিমজ্জার প্রভাব বিস্তার করিয়া শ্বেতকণিকা ও অণু চক্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

(৩) কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও ফ্যাট বিপাকে সহায়তা করে।

দৈনিক প্রয়োজন ১-৩ মাইক্রোগ্রাম।

অভাবের ফল ঃ এই ভাইটামিনটির অতিরিক্ত অভাবে পার্নিসাস অ্যানিমিয়া (pernicious anæmia) এবং মাইক্রোসাইটিক অ্যানীমিয়া, কখন কখন স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় দেখা দেয়। আশ্চর্যের বিষয় যাহারা নিরামিষাশী এবং নিয়মিত দুধ পান করেন না তাহারাও সকলে পার্নিসাস্ অ্যানিমিয়ার কবলে পড়েন না।

[**ভাইটামিন 'পি' (Vitamin P) ঃ** ইহাকে ভাইটামিন 'সি'-এর আনুষঙ্গিক ভাইটামিনও বলা চলে। কারণ আম, জাম, কমলালেবু, টমেটো ইত্যাদি যে সকল খাদ্যে ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায় সেই সকল খাদ্যে এই ভাইটামিনও দেখা যায়।

আমরা অজ্ঞানতাবশতঃ ফল খাইয়া ফলের যে ছিবড়া ফেলিয়া দিই, সেই ছিবড়ার মধ্যেই থাকে ভাইটামিন 'পি'। সুতরাং ফলের খোসা এবং বিচি বাদে ছিবড়াসহ সমস্তটাই খাওয়া উচিত।

আধুনিক যুগে করোনারী থ্রম্বোসিস যে একটি ভয়াবহ রোগ তাহাতে সন্দেহ নাই। করোনারী আর্টারী নামক যে ধমনী হৃৎপিণ্ডের কোষগুলিকে সর্বদা খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে এই রোগে সেই আর্টারীর গায়ে রক্ত জমাট বাঁধিতে থাকে। সম্ভবতঃ রক্তে কোলেস্টেরল নামক একটি অপকারী পদার্থের বৃদ্ধি এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণে রক্তের এই জমাট বাঁধা কার্জটি আরম্ভ হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী খাদ্যের অভাবে ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া একদিন চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গিয়াছে যে রুটিন নামক এক প্রকার পদার্থ করোনারী থ্রম্বোসিসে প্রাথমিক রক্তের এই জমাট বাঁধা দোষটি নিরাময় করিতে পারে। এই রুটিনের অপর নাম হইল ভাইটামিন 'পি'। প্রত্যহ ছিবড়াসহ কিছু কিছু ফল খাইলে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়। থ্রম্বোসিসের প্রাথমিক অবস্থায় ভাইটামিন 'পি'-এর সঙ্গে ভাইটামিন 'ই' জাতীয় খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিলে বেশ সুফল পাওয়া যায়।]

পরের দুই পাতায় প্রধান প্রধান ভাইটামিনসমূহ এবং উহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া হইল ঃ

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ	কাজ	উৎস	অভাবের ফল	বৈশিষ্ট্য	দৈনন্দিন প্রয়োজনের পরিমাণ
ভাইটামিন 'সি' অ্যাসকরবিক অ্যাসিড।	দেহের অসংখ্য কোষগুলিকে স্বস্থানে সুদৃঢ় অবস্থায় রাখে; রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বাড়ায়; ক্ষতপূরণে অংশ নেয়; এনজাইম ও হরমোন গঠনে অংশ নেয়। ক্যালসিয়াম এবং লৌহ অবশোষণে সাহায্য করে।	প্রতি ১০০ গ্রামে আমলকি ৬০০ মিলিগ্রাম পেয়ারা এবং সজনা ডাঁটার ফুল ১৮০-২০০ " বাঁধাকপি কচি নটেশাক ১০০-১৫০ " কমলালেবু, পেঁপে, আনারস ও টমেটো ২৫-৬০ " অন্যান্য ফল ও সবজি ১৫ মি.গ্রা.র কম অঙ্কুরিত ছোলা এবং মুগেও পাওয়া যায়।	অ্যানিমিয়া ও স্কার্ভি	সহজেই জলে দ্রবণীয়, আলো এবং উত্তাপে সহজে নষ্ট হয়।	শিশুদের ২০ মিলিগ্রাম; বয়স্কদের ৪০ মিলিগ্রাম এবং প্রসূতি অবস্থায় ৮০ মি. গ্রা. প্রয়োজন।

ভাইটামিন বি কমপ্লেকস:	কাজ	উৎস ১০০ গ্রাম ওজনে পাওয়া যায়	অভাবের ফল	বৈশিষ্ট্য	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
বি-ওয়ান থায়ামিন	কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে সাহায্য করিয়া তাপ ও শক্তি মুক্ত করে, স্বাভাবিক ক্ষুধা বজায় রাখে, স্নায়ুতন্ত্র সুস্থ রাখে।	ডাল ও বাদামে ০·২০-১·০০ মি.গ্রা. খাদ্যশস্যে খোসাসমেত ০·২১-০·১৮ „ খোসা ফেলিয়া ০·০৬-০·২০ „ শূকরের মাংস ০·৫৪ „ যকৃতে ০·৩৬ „ অন্যান্য মাংস, মাছ ও ডিমে ০·০১-০·১৮ „ সবজি ও ফল ঃ টাটকা শুঁটি ও বিনে ০·২৫-০·৩৪ „ অন্যান্য তরকারি ও ফলে ০·০১-০·২৫ „ দুধে ০·০৫ „	বেরিবেরি সহজেই পরিশ্রান্ত হওয়া; কাজে অনুৎসাহ এবং মনমরা ভাব ইত্যাদি।	জলে দ্রবণীয়। গরমে এবং উচ্চ-তাপে শতকরা ২৫-৭৫ নষ্ট হয়। রান্নায় সোডা বা ক্ষার ব্যবহার করিলেও নষ্ট হয়।	বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন পরিমাণে প্রয়োজন। সাধারণ নিয়ম প্রতি ১০০০ ক্যালরিতে ০·৫ মি.গ্রা. হিসাবে। ICMR-এর চার্ট দ্রষ্টব্য।
বি-টু রাইবোফ্লাবিন	অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড ও কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে অংশ নিয়া শক্তি মুক্ত করিতে এবং সেই শক্তিকে আত্মস্থ হইতে সাহায্য করে। রক্তের লোহিত কণিকা গঠনে রাইবোফ্লাবিনের ভূমিকা আছে।	প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে যকৃতে ০·৭০ মি.গ্রা. ডালে ০·১৮-০·৮৫ „ বাদামে ০·১৫-০·৩০ „ দুধে ০·১০-০·১৯ „ মাছ, মাংস, ডিমে ০·০৪-০·৪৪ „ খাদ্যশস্যে ০·০৬-০·২৯ „ তরকারি ও ফলে, মূলা শাক, আতা ইত্যাদিতে ০·৩৫-০·৪৫ „ অধিকাংশ অন্যান্য সবজি ও ফলে ০·০১-০·২০ মি.গ্রা.	চক্ষু, ত্বক এবং স্নায়ুগুলি আক্রান্ত হয়। মুখের কোণায় ঘা, জিহ্বার স্ফীতি, চোখ জ্বালা করা এবং অস্পষ্ট দৃষ্টি ইত্যাদি।	জলে দ্রবণীয়। রান্নায় অল্পই নষ্ট হয় তবে সবজির সিদ্ধজল ফেলিয়া দিলে অনেক অপচয় ঘটে।	বয়স্কদের চাই ১·৪-২·৩ মি.গ্রা.র মধ্যে। অন্তঃস্বত্ত্বা এবং প্রসূতি নারীদের একটু বেশী প্রয়োজন ICMR-এর চার্ট দ্রষ্টব্য।

ভাইটামিন বা খাদ্যপ্রাণ	কাজ	উৎস	অভাবের ফল	বৈশিষ্ট্য	দৈনিক প্রয়োজনের পরিমাণ
নিকোটিনিক অ্যাসিড বা নায়াসিন	ফ্যাটের সংশ্লেষে সাহায্য করে। ত্বকের সুস্থতা বজায় রাখে। উদর, অন্ত্র এবং স্নায়ুতন্ত্রের কাজ অব্যাহত রাখে।	প্রতি ১০০ গ্রামে ইস্ট ৪০ মিগ্রা যকৃত ১৮ ,, চীনাবাদাম ১৪ ,, গরু, পাঁঠা এবং শূকরের মাংসে ৩-৭ ,, খাদ্যশস্যে ২-৫ ,, টাটকা মাছে ১-৩ ,, ডালে ১-৩ ,, সবজি এবং ফলে ২ মি.গ্রা.র কম	জিহ্বা ও মুখে ঘা। অ্যানিমিয়া। পেলেগ্রা।	জলে দ্রবণীয়।	বয়স্কদের ১৬-২৬ মি.গ্রা.র মধ্যে। অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি নারীর প্রয়োজন স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশী। ICMR-এর চার্ট দ্রষ্টব্য।
বি-সিক্স পাইরিডক্সিন	হিমোগ্লোবিন প্রস্তুতিতে সাহায্য করে। এনজাইমের জারণ-বিজারণেও অংশ নেয়।	চাল, ডাল, গম, মাছ, মাংস এবং সামান্য পরিমাণে দুধ ও সবজিতে।	চর্মরোগ, চোখের প্রদাহ, শিশুখাদ্যে এই ভাইটামিনটির অভাব হইলে অ্যানিমিয়া এবং স্তিমিত বুদ্ধি দেখা দিতে পারে।		১২ বৎসরের পর হইতে প্রাপ্ত বয়স্ক পর্যন্ত সকলের ২ মিলিগ্রাম। শিশুদের প্রয়োজন-আরও কম। গর্ভিণী এবং প্রসূতিদের ২.৫ মি.গ্রা.।
ফোলিক অ্যাসিড	রক্তের লোহিত কণিকার গঠনে অংশ নেয়।	মেটে ও মাংসে, গাঢ় সবুজ শাক বিশেষত হিঞ্চে ও পালংশাকে এবং রুই, ট্যাংরা ও শোল প্রভৃতি মাছে।	অ্যানিমিয়া।	জলে দ্রবণীয়।	১বৎসর পর্যন্ত শিশুদের ২.৫ মাইক্রোগ্রাম তারপর ১০০ ,, গর্ভাবস্থায় ৩০০ ,, প্রসূতি অবস্থায় ১৫০ ,,
বি-টুয়েলভ কোবালামিন	নিউক্লিক অ্যাসিড ও নিউক্লিও প্রোটিন তৈরী করিতে। পিউরিনের বিপাকে এবং অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকাদের পরিণত অবস্থায় আনিতে কোবালামিন প্রয়োজন। স্নায়ুকলার বিপাকেও ইহা অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।	যকৃতে, ডিমে এবং দুধে পাওয়া যায়। উদ্ভিদে ইহার অস্তিত্ব এখনো ধরা পড়ে নাই।	পারনিসাস অ্যানিমিয়া মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয়।		১-৩ মাইক্রোগ্রাম।

৪. জলের সমতা (Water Balance)

প্রাণধারণের জন্য অক্সিজেনের পরেই জলের প্রয়োজন। মানুষের দৈহিক ওজনের ⅔ অংশ জল এবং ইহা প্রত্যেক দেহকোষের অত্যাবশক এবং অপরিহার্য অংশ। পেশীতে ৫০%, চর্মে এবং কোষবহিঃস্থ কলায় ২০% এবং রক্তে প্রায় ৭% জল দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের দৈহিক ওজনের ৬০ শতাংশ এবং স্ত্রীলোকের দৈহিক ওজনের প্রায় ৫০ শতাংশ জলীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত।

জলের কাজঃ দেহকোষের যাহা কিছু রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ চলে জলের মাধ্যমে। প্রাণিদেহের স্বাভাবিক সক্রিয়তার জন্য জল অপরিহার্য। জলের সাহায্যেই নানা সামগ্রী দেহের এক অংশ হইতে অন্য অংশে বাহিত হইয়া থাকে। খাদ্যকণাগুলি জলে দ্রবীভূত বা মিশ্রিত অবস্থায় ক্ষুদ্রান্ত্রের অজস্র কোষের মধ্য দিয়া শোষিত হইয়া রক্তে মিশিয়া যায়। রক্তস্রোত মারফত কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসে পরিবাহিত হয় এবং ত্যাজ্যপদার্থসহ খনিজদ্রব্যগুলি বৃক্কে অর্থাৎ কিডনিতে যায়। প্রস্রাবের শতকরা ৯৭ ভাগই জল। সেই জলের সঙ্গে দেহের বর্জ্যপদার্থ বাহির হইয়া যায়। জল আছে বলিয়াই মলত্যাগ সম্ভব। নতুবা আমাদের দারুণ কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগিতে হইত। ত্বক এবং শ্বাসের মারফত বাষ্পীভূত হইয়া জল আমাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। দেহে জল আছে বলিয়াই বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সংঘাত হয় না এবং দেহ সঞ্চালন করা সম্ভব হয়।

কোন কারণে দেহে জলের অভাব হইলে অত্যন্ত তৃষ্ণা পায় এবং যথাসময়ে ঐ তৃষ্ণা দূর করিতে না পারিলে দেহ অবসন্ন ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পরে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

দেহ হইতে সর্বদাই স্বেদ, মূত্র এবং নিঃশ্বাসের সহিত জল বাহির হইয়া যাইতেছে এবং যদিও বিপাকক্রিয়ার ফলে দেহে প্রতিনিয়ত জল সৃষ্টি হইতেছে তবুও ইহা প্রয়োজনের তুলনায় কম এবং একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক দুই লিটার জলপান করা অত্যাবশ্যক।

জলপানের প্রয়োজনীয়তাঃ খাদ্যের সহিত অধিক পরিমাণে জলপান করা উচিত নয় কারণ তাহাতে খাদ্যরস এবং পাচকাম্লরসগুলি অত্যন্ত তরল হইয়া পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটায়। এইজন্য খাদ্যগ্রহণের ২/৩ ঘণ্টা পরে খাদ্যের পরিপাক ক্রিয়া যখন অনেকটা অগ্রসর হইয়া থাকে তখনই জল গ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্রে প্রবেশ করে এবং রক্তে শোষিত হইয়া যায়।

জলের অভাবেঃ অতিরিক্ত ঘাম হইতে থাকিলে মূত্রের পরিমাণ কম হয় এবং ঐ সময় যথেষ্ট পরিমাণে জল পান না করিলে কতগুলি খনিজ পদার্থ মূত্রে অধঃক্ষিপ্ত হইয়া বৃক্কগহ্বরে অথবা মূত্রাশয়ে প্রস্তরে পরিণত হইতে পারে। গৃহীত জল অপেক্ষা অধিক পরিমাণে জল দেহ হইতে নিঃসৃত হইলে দেহে জলাভাব (dehydration) ঘটিয়া থাকে। বারবার বমি, প্রচুর রক্তপাত, ঘন ঘন পাতলা দাস্ত, অত্যধিক ঘাম কিংবা উচ্চতাপের জ্বর কিংবা অন্য কোন কারণে দেহ হইতে অস্বাভাবিক জল বাহির হইয়া গেলে জলের সোডিয়াম ইত্যাদি খনিজ লবণ বাহির হইয়া যায় এবং উহাদের ভারসাম্য নষ্ট হয়। এইরকম অবস্থায় পেশীর দুর্বলতা ও অবসাদ জাগে। পেশীতে

টান ধরে, ক্ষুধামান্দ্য দেখা দেয়। দেহের জলীয় অংশের শতকরা ১০ ভাগ বাহির হইয়া গেলে অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। তখন রক্ত সংবহনে ব্যাঘাত ঘটিবে, খাদ্য ঠিকমত শোষিত হইবে না, তাপ বৃদ্ধি পাইবে, বৃক্কের কাজ গুরুতরভাবে ব্যাহত হইবে, অম্লক্ষারের সমতা নষ্ট হইয়া অ্যাসিডোসিস সৃষ্টি হইবে। পরন্তু দেহে জলীয়াংশ বৃদ্ধি পাইলে একপ্রকার নেশা (water intoxication) হয়। ফলে মাথাধরা, গাবমি দুর্বলতা এবং টলমল অবস্থা দেখা দেয়।

জলের সমতা (Water Balance) : মানুষের শরীরে জলের সমতা নির্ভর করে জলগ্রহণ ও রেচনের উপর। জলগ্রহণের প্রধান উৎস হইল—(১) পানীয়—জল, চা, কফি, শরবত, দুধ ইত্যাদি আকারে। (২) পথ্যনিহিত জল যেমন তরিতরকারি, ভাত, মাছ, মাংস ইত্যাদি হইতে। (৩) বিপাকক্রিয়াজাত জল—কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট ও প্রোটিনের জারণ বিক্রিয়ার ফলে শরীরে কিছু জল উৎপন্ন হয়। দেহে দৈনিক ২৫০০ মিলিলিটার মত জল গৃহীত হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় রেচনের পরিমাণও অনুরূপ। মূত্ররূপে, স্বেদক্ষরণরূপে ত্বক ও ফুসফুসের মাধ্যমে এবং মলের মাধ্যমে জল নিঃসৃত হইয়া থাকে।

গ্রহণ		বর্জন বা রেচন	
পানীয় জলরূপে	—১২০০ মি. লিটার	মূত্রের সহিত	—১৪০০ মিলিলিটার
খাদ্যের সহিত	—১০০০ ,, ,,	মলের সহিত	— ২০০ ,, ,,
বিপাকীয় জল	— ৩০০ ,, ,,	স্বেদক্ষরণের মাধ্যমে	— ১০০ ,, ,,
		ত্বক ও ফুসফুসের ,,	৪০০ ,, ,,
	২৫০০ মিলিলিটার গৃহীত হয়		২৫০০ মিলিলিটার বর্জিত হয়

বর্জনের চেয়ে জলগ্রহণের পরিমাণ বেশী হইলে তাহাকে ধনাত্মক জলসাম্য (positive balance) ও গ্রহণের চেয়ে বর্জনের পরিমাণ বেশী হইলে তাহাকে ঋণাত্মক জলসাম্য (negative balance) বলে। গর্ভাবস্থায়, রোগমুক্তির পর, শৈশবের ক্রমবৃদ্ধি এবং খাদ্যে স্নেহ অথবা প্রোটিনের আধিক্য ইত্যাদি অবস্থায় ধনাত্মক জলসাম্য দেখা যায়। পরন্তু রক্তপাত, বমি, উদরাময়, লালাক্ষরণ, স্বেদক্ষরণ, মধুমেহ ও অ্যাডিসনরোগে, অচেতন অবস্থায় এবং অস্ত্রোপচারের পরবর্তী সময়ে ঋণাত্মক জলসাম্য দেখা যায়।

দেহে জলসাম্যের নিয়ন্ত্রণে তৃষ্ণা, বৃক্ক, উষ্ণতা, আর্দ্রতা, খাদ্য, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য, হাইপোথ্যালামাস ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তৃষ্ণা : যখনই দেহে জলের পরিমাণ হ্রাস পায় তখনই সাধারণতঃ পিপাসা পায় এবং আমরা জল পান করিয়া দেহের জলের চাহিদা পূরণ করি। এইভাবে দেহে জলের সমতা বজায় থাকে।

বৃক্ক ঃ দেহে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং জলের পরিমাণ হ্রাস পাইলে মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। আবহাওয়ার উষ্ণতা এবং আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাইলে চর্ম, স্বেদগ্রন্থি এবং শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে দেহ হইতে প্রচুর পরিমাণে জল নির্গত হয়। দেহ তরলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের (নুন) হ্রাসবৃদ্ধিতে জলসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। দেহ হইতে সোডিয়ামের রেচন বৃদ্ধি পাইলে জলের রেচন বৃদ্ধি পায়। অধিক স্নেহজাতীয় খাদ্যের বদলে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন বেশী খাইলে দেহ অধিক জল ধরিয়া রাখিতে পারে। তেমনি স্নেহপদার্থ বেশী খাইলে জলের রেচন বৃদ্ধি পায়। হাইপোথ্যালামাস ADH হরমোনের ক্ষরণের মাধ্যমে জলের সাম্যাবস্থা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। ADH বৃক্কের রেচন নালিকা হইতে জলের পুনঃ বিশোষণ বৃদ্ধি করে।

বৃক্কের কার্যক্ষমতা কোন কারণে নষ্ট হইয়া গেলে দেহের মধ্যে অতিরিক্ত জল জমা হইতে থাকে এবং হাত-পা ফুলিয়া শোথ রোগের (Oedema) সৃষ্টি হয়। দেহে যখন অতিরিক্ত জল হয় তখন ADH নামক হরমোনটি অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় এবং মূত্রের পরিমাণ হ্রাস পায়। এইরূপে বৃক্ক দেহের মোট জলের পরিমাণ নির্দিষ্ট রাখিতে সাহায্য করে।

তৃতীয় অধ্যায়

C. প্রাত্যহিক খাদ্যে পুষ্টি

(Nutrition in everyday Meal)

1. ডায়েটেটিকস্, ইহার অর্থ (Dietetics, its meaning)

যে কোন খাদ্য খাইলেই শরীর সুস্থ থাকে না, শরীরের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। শরীরের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে খাদ্য পরিবেশনের রীতিকে Dietetics বলে। এইজন্য খাদ্য ও খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সম্বন্ধে এবং উপাদানগুলি দেহের মধ্যে কিভাবে কাজ করে সেই সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

প্রমাণ খাদ্য ও সুষম খাদ্য ঃ কোন একজন ব্যক্তির খাদ্যে প্রত্যহ কত তাপ-মূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হইবে তাহা প্রধানতঃ ঐ ব্যক্তির বয়স এবং শারীরিক পরিশ্রমের উপরেই নির্ভর করে। একটি শিশু অপেক্ষা একটি বালকের অধিক তাপমূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। আবার একজন কেরানী অপেক্ষা একজন মজুরের খাদ্যের তাপমূল্য অধিকতর হওয়া আবশ্যক; কারণ, মজুরের শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণ কেরানী অপেক্ষা অনেক বেশী। কোন এক ব্যক্তির খাদ্যে যদি ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনীয় তাপমূল্য সম্পূর্ণ বজায় থাকে তবে ঐ খাদ্যই ঐ ব্যক্তির পক্ষে **প্রমাণ খাদ্য** (Standard diet)। একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির পক্ষে দৈনিক—

৫৫ গ্রাম প্রোটিন,
৪৫ গ্রাম স্নেহ,
৫২০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট,
৩০ গ্রাম খনিজ লবণ,
এবং ৪-৪½ পাইন্ট জল

প্রমাণ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। কারণ, উক্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য হইতে তাহার দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় তাপমূল্য পাওয়া যায়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ২৮০০ ক্যালরি তাপ-মূল্যের খাদ্য প্রয়োজন হয়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহই তাপ উৎপাদক খাদ্য। সুতরাং শুধু মাত্র ঐ তিন প্রকার খাদ্য খাইয়াই যদি ঐ ব্যক্তি তাহার প্রয়োজনীয় তাপ-মূল্যের অভাব পূরণ করে তবে সে শীঘ্রই বেরিবেরি, স্কার্ভি, রক্তাল্পতা, শ্বাসকষ্ট, রাত্র্যান্ধতা প্রভৃতি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হইবে। এইরূপ খাদ্যে শিশুদের দাঁত ও হাড় পরিপুষ্ট হইবে না এবং উহারা রিকেট্স্ রোগে আক্রান্ত হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও স্নেহ ছাড়াও এমন কতগুলি উপাদান থাকা অত্যাবশ্যক যাহাদের অভাবে শরীর উপরোক্ত বিভিন্ন রোগে সহজেই আক্রান্ত হয়। কোন এক বা একাধিক খাদ্যোপাদানের অভাবেই এই সকল রোগের উদ্ভব হয় বলিয়া উহাদের অভাব-জনিত রোগ (Deficiency diseases) বলে।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের অভাবেই এই সকল রোগের সৃষ্টি হয়। দুধ, ডিম, সবুজ শাকসবজি, টমেটো ও বিভিন্ন প্রকারের ফল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন ও খনিজ লবণ পাওয়া যায়। সুতরাং প্রত্যহ এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে বলিয়া এই সকল খাদ্যদ্রব্যকে **রক্ষাকারী খাদ্য** (Protective food) বলে।

সুতরাং খাদ্যে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিবার জন্য যেমন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের প্রয়োজন তেমনি শরীর সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য ভাইটামিন ও খনিজ লবণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক। যে খাদ্যে শরীর সুস্থ এবং সবল থাকে তাহাকেই **যথোপযুক্ত খাদ্য** (Adequate diet) বলে।

প্রমাণ খাদ্য দেহে তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া দেহে পুষ্টি, বৃদ্ধি ও কর্মক্ষমতা অব্যাহত রাখে এবং যথোপযুক্ত খাদ্য দেহকে রোগমুক্ত করিয়া উহাকে সুস্থ এবং সবল রাখে। এই দুই প্রকার খাদ্যের মিলনেই **সুষমখাদ্য** (Balanced diet) প্রস্তুত হয়। সুতরাং যে খাদ্য দ্বারা আমাদের দেহের স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং যাহা শরীরে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি সরবরাহ করিয়া শরীর সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখে তাহাকেই **সুষম খাদ্য** (Balanced diet) বলে। সুষম খাদ্যে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে।

2. পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকা
(Daily Food Pattern)

সংসারের ব্যয়ের সীমার মধ্যে পরিবারের প্রতিটি লোকের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী উপযুক্ত সুষম খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করাকেই 'খাদ্য-পরিকল্পনা' বলে। খাদ্য পরিকল্পনার সময় দৈহিক পুষ্টি, পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত রুচি এই তিনটি দিকই বিবেচনা করিতে হয়। এখানে পুষ্টির কথাই আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্টির দিক ঃ যে কোন পরিবারের খাদ্য-পরিকল্পনায় সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে গৃহের প্রত্যেকটি লোকের যেন প্রয়োজনীয় দৈহিক তাপ ও শক্তি রক্ষিত হয়। খাদ্য পরিকল্পনায় এই পুষ্টির দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রথম বিবেচনার বিষয়। পরিবারের পুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে খাদ্যতালিকা প্রস্তুতির পূর্বে প্রত্যেক পরিবারে কতখানি খাদ্য-উপাদান দরকার তাহা জানা উচিত।

আমরা জানি যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই পরিমাণ খাদ্যকে খাদ্যের (standard diet) একক ধরিয়া পরিবারের বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যকে **এক ব্যক্তি-মূল্য** (Man-value) বলে। একজন ভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ঐ মাপকাঠিতে প্রকাশ করিলে উহাই ঐ নারী বা পুরুষের ব্যক্তি-মূল্য (Man-value, Factor, Index or Co-efficient) বলিয়া ধরা হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রায় ২৫০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রয়োজন এবং ইহা ৩০০০ ক্যালোরী খাদ্যের প্রায়

০·৮৩ অংশ $\left(\frac{২৫০০}{৩০০০}=\frac{২৫}{৩০}=\frac{৫}{৬}=০·৮৩\right)$। সুতরাং একজন নারীর ব্যক্তি-মূল্য বা factor হইতেছে ০·৮৩।

এইরূপে বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যক্তি-মূল্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

	ব্যক্তি-মূল্য (Man-value)
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম পুরুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালকের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৯
১০ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮
৮ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৭
৬ হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৬
৩ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৫
২ হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৪

একটি পরিবারের দৈনিক মোট খাদ্যের পরিমাণ ঐ পরিবারের মোট ব্যক্তি-মূল্যের (Total man-value) সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়। পরিবারের লোকসংখ্যা এবং তাহাদের বয়স জানা থাকিলে ইহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। মনে কর, একটি পরিবারে স্বামী, স্ত্রী এবং ৫, ৭ ও ১০ বৎসরের তিনটি বালক-বালিকা আছে। এই পরিবারের খাদ্যের মোট ব্যক্তি-মূল্য নিম্নরূপ

স্বামীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ	১·০	ব্যক্তি-মূল্য (Man-value)
স্ত্রীর ,, ,, ,,	০·৮৩	,, ,,
৫ বৎসরের বালক-বালিকার ,,	০·৫	,, ,,
৭ ,, ,, ,,	০·৬	,, ,,
১১ ,, ,, ,,	০·৮	,, ,,
মোট খাদ্যের পরিমাণ	৩·৭৩	,, ,,

এই ব্যক্তি-মূল্য হইতে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি-মূল্যের খাদ্যে ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ৪৫০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। এই হিসাবে ৩·৭৩ ব্যক্তি-মূল্যের খাদ্যে,

প্রোটিনের	পরিমাণ	১০০ × ৩·৭৩ = ৩৭৩	গ্রাম
স্নেহপদার্থের	,,	১০০০ × ৩·৭৩ = ৩·৭৩	,,
কার্বোহাইড্রেটের	,,	৪৫০ × ৩·৭৩ = ১৬৭৮·৫	,,

অর্থাৎ ঐ পরিবারের দৈনিক মোট ৩·৭৩ × ৩০০০ ক্যা. বা ১১১৯০ ক্যা. তাপমূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন এবং ঐ খাদ্যে ৩৭৩ গ্রাম প্রোটিন, ৩৭৩ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ১৬৭৮·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকিবে। এই পরিবারের খাদ্য প্রস্তুতির সময় লক্ষ্য করিবে যেন খাদ্য-দ্রব্যে উক্ত পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ বর্তমান থাকে; এই সকল খাদ্যোপাদান এক প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হইতে গ্রহণ করিলে দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ লবণসমূহ স্বাভাবিক উপায়েই ঐ খাদ্যে বর্তমান থাকিবে এবং কখনও উহাদের অভাব হইবে না। এই জন্যই খাদ্যতালিকা প্রস্তুতিতে প্রধানতঃ খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের পরিমাণই নির্ণয় করিতে হয়।

তোমরা জান প্রোটিনের আবার শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় প্রাণিজ প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ এবং দেহ গঠনের সমস্ত উপাদান প্রাণিজ প্রোটিনেই বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকের খাদ্যতালিকায় কিছুটা প্রাণিজ প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করিবে।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নির্বাচন প্রোটিন নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি এই বিষয়েও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত পরিবারের মোট ১৬৭৮·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের অভাব যদি শুধু চিনি, মিছরি প্রভৃতি বিশুদ্ধ শর্করা জাতীয় দ্রব্যাদির সাহায্যে পূরণ করা হয় তাহা হইলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া উদরাময় রোগের সৃষ্টি হইবে। তাই ভাত, রুটি, চিনি, মিছরি, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন মিশ্র খাদ্যের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা মিটাইলে ঐ সকল খাদ্যের অন্যান্য উপাদানসমূহও দেহের কাজে আসিবে।

স্নেহপদার্থ নির্বাচনেও একটু সতর্ক হইলে ঐ স্নেহপদার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'র অভাবও কিছু কিছু পূরণ হইতে পারে।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ নির্বাচন করিয়া খাদ্যের ভাইটামিনের কথা বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ, বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য হইতে খাদ্যের ঐ প্রধান তিনটি উপাদান নির্বাচন করিলে ভাইটামিনের অভাব অনেকটা এমনিতেই পূরণ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ভাইটামিনের জন্য সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদিও দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা কর্তব্য।

উপরোক্ত খাদ্যোপাদান ব্যতীত খাদ্য পরিকল্পনায় জলেরও স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। জল আমাদের রক্তের তারল্য বজায় রাখে, দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং হজমে ও দেহের ক্লেদ নিঃসরণে সহায়তা করে।

3. **খাদ্যের মূল বিভাগ এবং বিভিন্ন খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা ঃ** শস্যকণা, ডাল, বাদাম, মূল, কন্দ, সবুজ শাকসবজি ; অন্যান্য তরকারি, ফল, মাংস ও মাছ, ডিম, দুগ্ধ, দুগ্ধজাত খাদ্য, স্নেহপদার্থ, চিনি ও গুড়।

(Basic food groups and the study of different foods : cereals, pulses, nuts and beans, roots and tubers, green leafy vegetables, and other vegetables, fruits, meat and fish, eggs, milk and milk products, fats and oils, sugar and jaggery.

খাদ্যের বিভিন্ন বিভাগ (Basic food groups) ঃ সুষম খাদ্যে প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট, স্নেহ, ভাইটামিন এবং লবণ ইত্যাদির প্রত্যেকটিই উপযুক্ত অনুপাতে বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এই সকল খাদ্যোপাদানসমূহ আবার বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে বিভিন্ন পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন খাদ্যে একটি, আবার কোন কোন খাদ্যে একাধিক উপাদান থাকে। উদাহরণস্বরূপ চিনি এবং দুধের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথমটিতে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া অন্য কোন খাদ্যোপাদান নাই। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে প্রায় সকল উপাদানই বর্তমান। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে হইলে এই সকল খাদ্যের উপাদান সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান খুবই সামান্য। এইজন্যই খাদ্য বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্যসমূহ নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যহ ঐ সকল বিভাগ হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন যাহাতে অতি সাধারণ লোকও তাহার খাদ্যে প্রত্যেকটি উপাদান পাইতে পারে।

খাদ্যের পাঁচটি বিভাগ (Basic five groups) ঃ খাদ্যদ্রব্যসমূহ প্রয়োজনীয় পাঁচটি উপাদানের কোন একটির প্রাচুর্য অনুযায়ী পাঁচটি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এই পাঁচটি বিভাগ হইতেছে ঃ

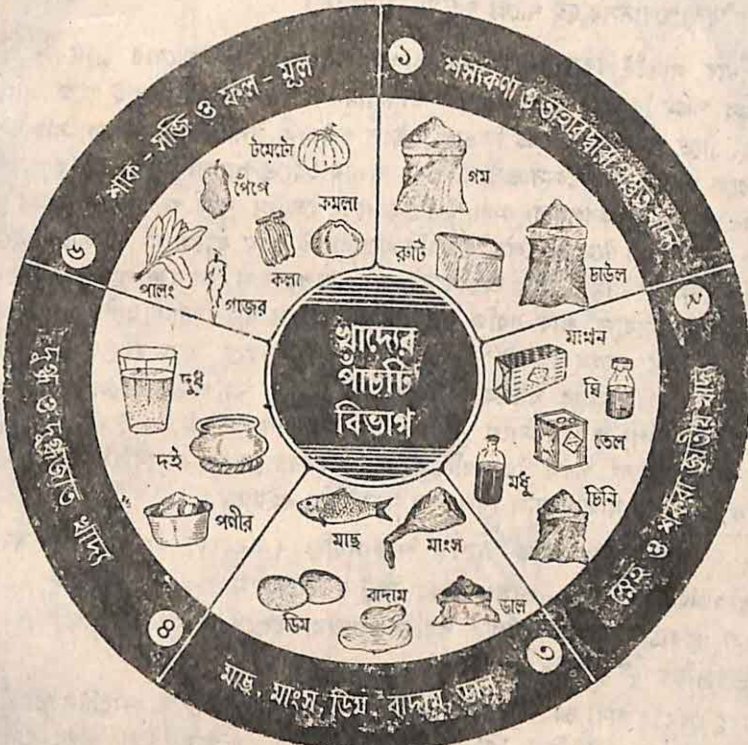
(১) **বিভিন্ন প্রকারের শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য (Grain products) ঃ** যথা—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আটা, ময়দা, রুটি, ভাত ইত্যাদি। আমাদের খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করাই এই বিভাগীয় খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া কিছু কিছু প্রোটিন, ভাইটামিন 'বি' এবং লৌহও এই সকল খাদ্যে পাওয়া যায়। কার্বো-হাইড্রেট আমাদের দেহে তাপ উৎপন্ন করে। সুতরাং এই শ্রেণীর খাদ্যের সাহায্যে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করা হয়।

(২) **স্নেহ এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য (Fats and sugars) ঃ** যথা—ঘি, মাখন, মাছের তেল, বিভিন্ন জন্তুর চর্বি, তৈল, চিনি, মধু, দুগ্ধশর্করা (Lactose), গ্লুকোজ ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যও আমাদের দেহে প্রধানতঃ তাপই সরবরাহ করে। প্রথম শ্রেণীর খাদ্য অপেক্ষা এই শ্রেণীর কয়েকটি খাদ্যের প্রতি একক ওজনে অধিকতর তাপ উৎপন্ন হয়। মাখন, চর্বি ইত্যাদি প্রাণিজ স্নেহের সাহায্যে দেহের ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি'র অভাবও কিছু পরিমাণে পূরণ হয়।

(৩) মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম ও ডাল (Meat, fish, poultry, eggs, nuts and mature legumes) ঃ খাদ্যে প্রোটিনের যোগান দেওয়াই এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া দেহের ভাইটামিনের অভাবও এই শ্রেণীর খাদ্যের দ্বারা অনেকটা পূরণ হয়।

(৪) দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য (Milk and its products) ঃ বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দই, পনীর গুঁড়া দুধ ইত্যাদি।



এই শ্রেণীর খাদ্যে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন এবং প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। দেহের অস্থি গঠনে ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এইজন্য এই শ্রেণীর খাদ্য প্রত্যহই কিছু কিছু খাদ্য-তালিকাভুক্ত করা কর্তব্য। ইহা ছাড়া অন্যান্য ভাইটামিন এবং খনিজ লবণও এই শ্রেণীর খাদ্য সরবরাহ করে।

(৫) শাক-সব্জি ও ফলমূল (Vegetables and Fruits) ঃ বিভিন্ন প্রকারের সবুজ শাক-সব্জি, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি, এবং বিভিন্ন প্রকারের ফল ও কন্দ জাতীয় তরকারি, যথা—মুলো, শালগম, টমেটো, কমলালেবু, পাতিলেবু, পেয়ারা, আনারস, আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, শশা ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য খাদ্যের ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের অভাব পূরণ করা। প্রথম চার শ্রেণীর খাদ্যের দ্বারা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের

অভাব পূরণ হইবে এবং যদিও এই সকল খাদ্যে কিছু কিছু ভাইটামিন পাওয়া যায় তবুও ভাইটামিনের চাহিদা পুরাপুরিভাবে এই সকল খাদ্যের দ্বারা মিটিবে না। এই জন্যই প্রতিদিন এই শেষোক্ত শ্রেণীর খাদ্য কিছু কিছু গ্রহণ করা কর্তব্য। ইহা ছাড়া এই সকল খাদ্যের সেলুলোজ কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখে।

খাদ্যদ্রব্যসমূহ এমনভাবে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে যে প্রত্যহ যদি প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য খাদ্য তালিকাভুক্ত করা হয় তাহা হইলে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহই খাদ্যে বর্তমান থাকিবে।

খাদ্যের সাতটি বিভাগ (Basic seven groups)ঃ খাদ্যের উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের পঞ্চম বিভাগে সকল প্রকার ভাইটামিনবহুল খাদ্যদ্রব্য একই সঙ্গে সন্নিবেশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিভাগ হইতে খাদ্যদ্রব্য উপযুক্ত সতর্কতার সহিত গ্রহণ না করিলে খাদ্যে কোন কোন ভাইটামিনের অভাব হইতে পারে। মনে কর, কোন ব্যক্তি এই বিভাগ হইতে কেবলমাত্র কলা, পেঁপে, শশা, লেট্যুস শাক ও আলু তাহার খাদ্য-তালিকাভুক্ত করিয়া টমেটো, লেবু ইত্যাদি একেবারেই গ্রহণ করিল না। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির খাদ্যে ভাইটামিন 'সি'র অভাব হইবে। অপরপক্ষে সে যদি পালং শাক, লেট্যুস শাক ইত্যাদি সবুজ শাক-সবজি তাহার খাদ্য হইতে বাদ দিয়া টমেটো, লেবু ইত্যাদি অন্যান্য খাদ্যের সাহায্যে এই বিভাগের অভাব পূরণ করে তাহা হইলে তাহার খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'র অভাব ঘটিবে। কিন্তু শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে সকল প্রকার ভাইটামিনই উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্যে থাকা আবশ্যক। এই জন্যই উপরোক্ত পাঁচটি বিভাগের প্রধানতঃ পঞ্চম বিভাগটিকে ভাইটামিনের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি বিভাগে ভাগ করিয়া মোট সাতটি মূল বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

(১) **সবুজ ও পীত বর্ণের শাক-সবজি** (Leafy, green and yellow vegetables)ঃ যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, নটে শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের সবুজ বর্ণের সবজি, গাজর, হলদে কুমড়া ইত্যাদি পীতবর্ণের তরিতরকারিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

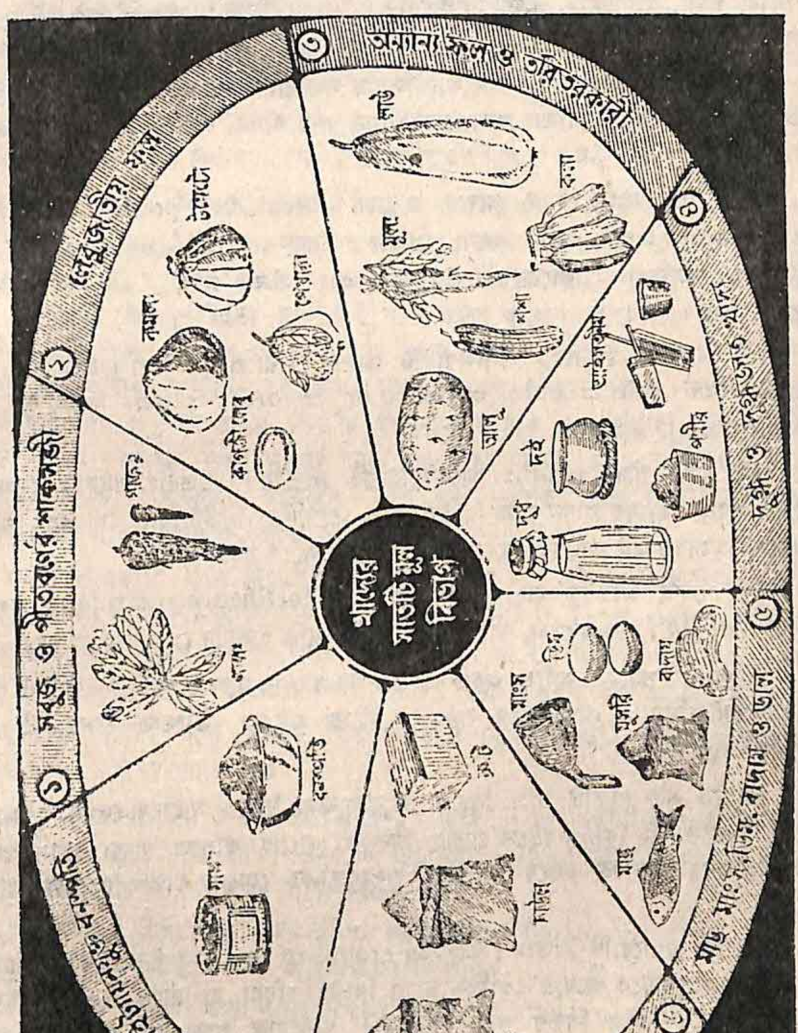
এই শ্রেণীর খাদ্য ভাইটামিন 'এ'-র অভাব পূরণ করে। ইহাতে ক্যারটিন (carotine) নামক একপ্রকার ভাইটামিন 'এ' উৎপন্নকারী পদার্থ থাকে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'ও এই শ্রেণীর খাদ্যে পাওয়া যায়।

(২) **লেবু জাতীয় ফল** (Citrus Fruits)ঃ যথা—কমলালেবু, কাগজি লেবু, টমেটো ইত্যাদি।

খাদ্যে ভাইটামিন 'সি'র অভাব পূরণ করাই এই বিভাগের খাদ্যের প্রধান্ উদ্দেশ্য। ভাইটামিন 'সি' উত্তাপের সাহায্যে নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং এই বিভাগের খাদ্যদ্রব্য কাঁচা এবং টাট্‌কা অবস্থায় খাওয়াই ভাল। পেয়ারা (Guava) ভাইটামিন 'সি'র একটি অতি উৎকৃষ্ট উৎস। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'এ'-ও এই শ্রেণীর খাদ্যে পাওয়া যায়।

(৩) **অন্যান্য ফল ও কন্দজাতীয় তরি-তরকারি** (Other fruits and vegetables)ঃ যথা—আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, আঙ্গুর, বেদানা, আনারস, ন্যাশপাতি, লাউ, ঢেঁড়স, সজনা, মূলা, পেঁয়াজ, আলু, শালগম ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য কোন একটি নির্দিষ্ট ভাইটামিনের অভাব পূরণের জন্য গ্রহণ



করা হয় না। সাধারণতঃ খাদ্যের বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের অভাব পূরণে সাহায্য করাই এই বিভাগীয় খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

(৪) **মাখন ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য** (Milk including all its recognised forms other than butter) : যথা—বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দই, পনীর, ছানা, আইসক্রীম, গুঁড়াদুধ ইত্যাদি। মাখন, ঘি দুগ্ধজাত হইলেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়।

উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন এবং ক্যালসিয়াম সরবরাহ করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ছাড়া বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন এবং খনিজ লবণও এই শ্রেণীর খাদ্যে কিছু কিছু পাওয়া যায়।

(৫) **মাছ, মাংস, ডিম, বাদাম ও ডাল** (Meat, fish, poultry eggs, nuts and mature legumes) : খাদ্যে প্রোটিন সরবরাহ করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাইটামিন এবং খনিজ লবণও এই সকল খাদ্যে পাওয়া যায়।

(৬) **বিভিন্ন প্রকারের শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য** (Bread stuffs and cereals, whole grain, enriched or restored) : যথা– চাউল, গম, যব, আটা, পাঁউরুটি ইত্যাদি।

এই সকল খাদ্য প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। সুতরাং খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের প্রধান কাজ। ইহা ছাড়া প্রোটিন, ভাইটামিন 'বি' এবং খনিজ লবণের অভাবও এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা কিছুটা পূরণ হইয়া থাকে।

(৭) **স্নেহ জাতীয় খাদ্য** (Butter and fortified margarine) : যথা— মাখন, ঘি, চর্বি, মাছের তেল, ভাইটামিনযুক্ত বনস্পতি ইত্যাদি।

খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের মূল উদ্দেশ্য। প্রাণিজ স্নেহ খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'ও সরবরাহ করিয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ স্নেহ এই দিক হইতে নিকৃষ্টতর।

খাদ্যের এই সাতটি মূল বিভাগ পূর্বপৃষ্ঠায় চিত্রের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে প্রত্যহ খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিলে খাদ্যে কোন প্রকার ভাইটামিনের অভাবই হইবে না এবং অভাবজনিত রোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

খাদ্যের এগারোটি বিভাগ (Eleven groups of food) : উপরোক্ত মূল সাতটি বিভাগের কয়েকটিকে আবার একাধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া বর্তমানে খাদ্যদ্রব্যসমূহকে মোট এগারটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উপরোক্ত পঞ্চম বিভাগে মাছ, মাংস ইত্যাদির সহিত ডাল, বাদাম প্রভৃতিও রহিয়াছে। প্রথমতঃ, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং এই তুলনায় খাদ্যের ডাল, বাদাম প্রভৃতির প্রোটিন অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। দ্বিতীয়তঃ, মাছ, মাংস ইত্যাদির প্রাণিজ প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অতিশয় অগ্নিমূল্য, অপরপক্ষে ডাল, বাদাম প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সস্তা। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ডাল ইত্যাদির সাহায্যেই অল্প ব্যয়ে অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা সহজসাধ্য। এই সকল কারণে ডাল ও বাদাম অন্যান্য প্রোটিনজাত খাদ্য হইতে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ভাত, রুটি

ইত্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণে ডাল ও কিছু বাদাম গ্রহণ করিয়া অল্প ব্যয়ে দরিদ্র ব্যক্তি তাহার প্রোটিনের অধিকাংশ অভাব দূর করিতে পারে।

আবার প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে ডিম অন্যান্য প্রোটিনজাত খাদ্য হইতে একটু স্বতন্ত্র কারণ ডিমে প্রচুর ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। এইজন্যই শুধু ডিমের সাহায্যেই একটি ভিন্ন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। প্রত্যহ একটি করিয়া ডিম গ্রহণ করিলে ভাইটামিন 'এ'র অভাব যথেষ্ট পরিমাণে দূর হইবে।

উপরোক্ত সাতটি বিভাগের তৃতীয় বিভাগে অন্যান্য ফল ও তরি-তরকারির সহিত আলুও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আলু প্রধানতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। প্রত্যহ খাদ্যের সহিত আমরা যে পরিমাণ আলু গ্রহণ করিয়া থাকি তাহাতে আমাদের কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা অনেকটাই পূরণ হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'র পরিমাণ আলুতে অল্প হইলেও প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ আলু গ্রহণ করায় এই ভাইটামিনের অভাব অনেকটা এই খাদ্য হইতে পূরণ হইয়া থাকে। রাঙা আলু (Sweet potatoes) শ্বেতসার জাতীয় উপাদান ছাড়াও ভাইটামিন 'এর' একটি উৎকৃষ্ট উৎস। সুতরাং অল্প মূল্যে আলু ও রাঙা আলু হইতে কার্বোহাইড্রেট, ভাইটামিন 'এ' ও 'সি'র অভাব অনেকটা পূরণ করা যাইতে পারে বলিয়া ইহাদের সাহায্যে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তোমরা ভালভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিবে উপরোক্ত মূল সাতটি বিভাগে চিনি, গুড়, মিছরি, সিরাপ ইত্যাদি শর্করা জাতীয় খাদ্য স্থান পায় নাই। কিন্তু প্রত্যহই আমরা এই জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকি এবং ইহারা খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধির প্রধান সহায়ক। এইজন্য ইহাদের সাহায্যে একটি নূতন বিভাগের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

এইভাবে খাদ্যের মূল সাতটি বিভাগ হইতে মোট এগারটি বিভাগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(১) বিভিন্ন শস্যকণা ও তাহার দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য (Grain products) ঃ যথা—চাউল, গম, যব, ভুট্টা, আটা, ময়দা, পাঁউরুটি ইত্যাদি। ইহারা খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট সরবরাহ করিয়া খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করে।

(২) আলু ও রাঙা আলু (Potatoes and Sweet Potatoes) ঃ ইহারা খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' সরবরাহ করে।

(৩) বিভিন্ন প্রকারের ডাল ও বাদাম (Dry mature beans, peas and nuts) ঃ যথা—মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর ইত্যাদি ডাল এবং বাদাম প্রভৃতি। খাদ্যের প্রোটিন ও 'বি' ভাইটামিনের অভাব পূরণ করাই এই শ্রেণীর খাদ্যের প্রধান কাজ। বাদাম জাতীয় খাদ্য স্নেহপদার্থের অভাবও কিছুটা পূরণ করিয়া থাকে।

(৪) **লেবু জাতীয় ফল** (Citrus Fruits) ঃ যথা—কমলালেবু, কাগজিলেবু, টমেটো ইত্যাদি। এই শ্রেণীর খাদ্য আমাদের ভাইটামিন 'সি'র অভাবই প্রধানতঃ পূরণ করিয়া থাকে।

(৫) **সবুজ ও পীতবর্ণের শাকসবজি** (Green and yellow vegetables) ঃ যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, নটে শাক, পুঁই শাক ইত্যাদি ; গাজর, হলদে কুমড়ো

প্রভৃতি পীতবর্ণের তরকারি। খাদ্যে ভাইটামিন 'এ' সরবরাহ করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

(৬) **অন্যান্য ফল ও তরিতরকারি** (Other fruits and vegetables): যথা—আম, জাম, কাঁঠাল, আঙুর, বেদানা, ন্যাশপাতি, কলা, শশা, লাউ, ঢেঁড়স, সজনা, শালগম, মূলা, পেঁয়াজ প্রভৃতি। ইহারা বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিন ও খনিজ লবণ সরবরাহ করে।

(৭) **মাখন ব্যতীত দুগ্ধ ও অন্যান্য দুগ্ধজাত খাদ্য** (Milk and its products other than butter): যথা—বিভিন্ন প্রাণীর দুধ, দই, গুঁড়া দুধ, ছানা, পনীর, আইসক্রীম ইত্যাদি। মাখন ও ঘি দুগ্ধজাত হইলেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত নয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম এই শ্রেণীর খাদ্য হইতে প্রধানতঃ পাওয়া যায়।

(৮) **ডিম** (Eggs): যথা—হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম ইত্যাদি। ইহা খাদ্যের প্রোটিন ও ভাইটামিন 'এ'-র অভাব প্রধানতঃ পূরণ করিয়া থাকে।

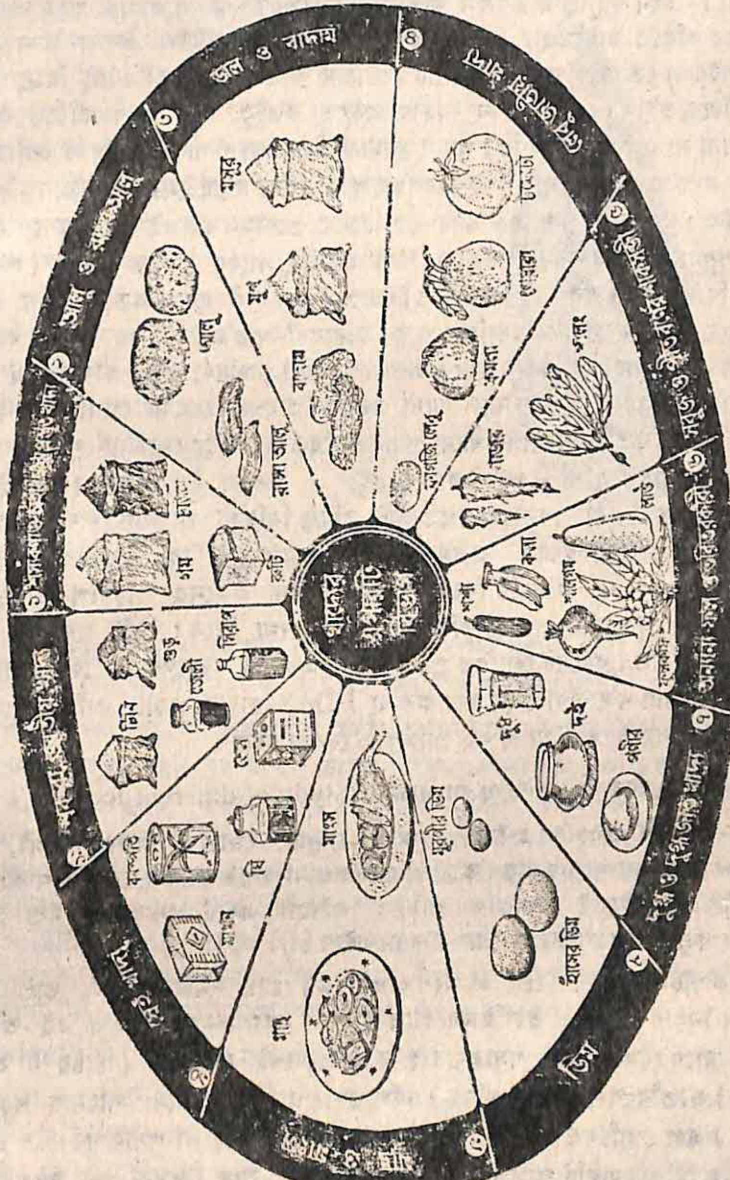
(৯) **মাছ, মাংস ইত্যাদি** (Lean meat, poultry and fish): এই শ্রেণীর খাদ্য প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন সরবরাহ করে।

(১০) **স্নেহ খাদ্য** (Fats): যথা—মাখন, ঘি, চর্বি, বনস্পতি, বিভিন্ন প্রকারের তেল ইত্যাদি। খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের প্রধান কাজ।

(১১) **শর্করা জাতীয় খাদ্য** (Sugars, syrups, molasses and preserves): যথা—চিনি, গুড়, মিছরি, মধু, সিরাপ, জেলী ইত্যাদি। খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করাই ইহাদের কাজ।

এই এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই দৈনিক কিছু কিছু করিয়া খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে খাদ্যে কোন উপাদানেরই অভাব ঘটিবে না এবং দেহ সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম থাকিবে। সাধারণ লোকের পক্ষে এইজন্যই এই খাদ্য বিভাগ বিশেষ উপকারী। তবে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিরামিষাশী আছে যাহারা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাইতে পছন্দ করে না। সুতরাং তাহাদের খাদ্য হইতে উক্ত এগার প্রকার খাদ্যের অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর খাদ্য বাদ দিতে হইবে। উক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্য বাদ দিবার ফলে উহাদের খাদ্যে প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব যেন না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ডিম প্রধানতঃ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ও ভাইটামিন 'এ' এবং মাছ, মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন খাদ্যে সরবরাহ করে। সুতরাং এই সকল উপাদানের অভাব অন্যান্য খাদ্য হইতে পূরণ করিতে হইবে। দুধ, ছানা ইত্যাদি সপ্তম শ্রেণীর খাদ্যে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। সুতরাং প্রোটিনের অভাব পূরণ করিবার জন্য এই ব্যক্তিকে অধিক পরিমাণে এই সকল খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। ভাইটামিন 'এ'র অভাব দুধ, ছানা ইত্যাদি হইতে পূরণ হইবে না। এইজন্য ঐ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর পরিমাণে পঞ্চম শ্রেণীর খাদ্য অর্থাৎ সবুজ শাক-সবজি গ্রহণ করিয়া ভাইটামিন 'এর অভাব পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং ঐ এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই যে আমাদের প্রত্যহ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে এমন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে প্রত্যেকের রুচি ও অভ্যাস অনুযায়ী আমরা

অনায়াসেই ঐ বিভিন্ন বিভাগ হইতে ছাট কাট করিয়া দৈনিক সুষম খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিতে পারি।



এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে যে খাদ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহাদের বিশেষ কোন জ্ঞান নাই তাহারাও অনায়াসেই প্রত্যেকটি খাদ্যোপাদান উপরোক্ত খাদ্য বিভাগের সাহায্যে সহজেই পাইতে পারে। কিন্তু এই সকল খাদ্যোপাদানসমূহও আবার একটি নির্দিষ্ট

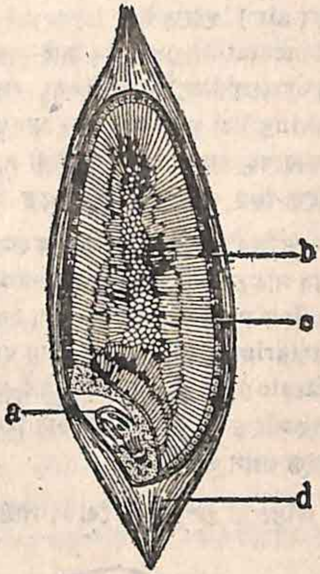
পরিমাণে ব্যক্তি বিশেষের খাদ্যে থাকা আবশ্যক। এই সকল উপাদান কোন খাদ্যের কতটুকু হইতে পাওয়া যাইবে তাহা জানা থাকিলে গৃহিণীদের আর কোন অসুবিধাই থাকে না। মনে কর, তুমি একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী সুস্থ পুরুষের সুষম খাদ্যের আয়োজন করিতে যাইতেছ। ঐ ব্যক্তির খাদ্যে যাহাতে সকল উপাদানই বর্তমান থাকে সেইজন্য তোমাকে খাদ্যের এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতেই কিছু কিছু খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু কোন্ বিভাগ হইতে কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে তাহা জানা না থাকিলে ঐ ব্যক্তির খাদ্যে প্রয়োজনীয় সকল উপাদান নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ করা সম্ভব হইবে না। উদাহরণস্বরূপ ঐ ব্যক্তির প্রোটিনের প্রয়োজনের কথাই ধরা যাউক। তাহার প্রায় ৫৫ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন। এই প্রোটিন তোমাকে তৃতীয়, সপ্তম, অষ্টম ও নবম বিভাগের খাদ্য হইতেই পূরণ করিতে হইবে (খাদ্যের এগারটি বিভাগ লক্ষ্য কর)। এই সকল বিভাগের কোন্‌টি হইতে কতটুকু খাদ্য গ্রহণ করিয়া এই ৫৫ গ্রাম প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করিবে? তৃতীয় বিভাগের খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে এবং অপরাপর বিভাগ হইতে অল্প পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া এই ৫৫ গ্রাম প্রোটিনের অভাব পূরণ করিলে খাদ্যে অত্যাবশ্যক প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব হইবে। কারণ, তৃতীয় বিভাগের খাদ্যে প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনই পাওয়া যায়। ফলে দেহের যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হইবে। সুতরাং উক্ত পরিমাণ প্রোটিনের চাহিদা উপরোক্ত কয়েকটি বিভাগের প্রত্যেকটি হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়াই পূরণ করিতে হইবে। অতএব প্রত্যেকটি লোকের দৈনিক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন খাদ্যোপাদান এবং এই এগারটি বিভাগের খাদ্য-দ্রব্যের ওজনের পরিমাপ জানা না থাকিলে গৃহিণীদের সুষম খাদ্য প্রস্তুতিতে অসুবিধা দেখা দিবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য বিভিন্ন বয়সের লোকের প্রতিদিন এই এগারটি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগ হইতে যে পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য গ্রহণ করা কর্তব্য ICMR তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছে। সুষম খাদ্যের অংশে এই তালিকাটি দেওয়া হইল।

বিভিন্ন প্রকার খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা (Study of different foods)

খাদ্য-শস্য (Cereals) ঃ চাউল, গম, যব, ভুট্টা, জোয়ার, বাজরা, রাগী, জৈ (Oat) ইত্যাদি খাদ্য-শস্যের অন্তর্গত। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যের বৃহত্তম অংশ আমরা এই শ্রেণীর খাদ্য হইতেই গ্রহণ করিয়া থাকি। এইরূপ একটি শস্যকণাকে মধ্য দিয়া লম্বালম্বি কাটিলে পরপৃষ্ঠার চিত্রের ন্যায় দেখাইবে।

শস্যকণাটির ভ্রূণে (চিত্রের 'a' অংশ লক্ষ্য কর) প্রায় সমস্ত প্রোটিন, ভাইটামিন এবং লবণ নিবদ্ধ থাকে। ইহা ছাড়া কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ পদার্থও এই অংশে অল্প পরিমাণে দেখা যায়। শস্যকণার প্রায় অধিকাংশই শ্বেতসার (চিত্রের 'b' অংশ লক্ষ্য কর) জাতীয় পদার্থ দ্বারা গঠিত। শ্বেতসার ব্যতীত সামান্য পরিমাণ শর্করা (Sugar) এবং প্রোটিনও এই 'b' চিহ্নিত অংশে পাওয়া যায়। শস্যকণার 'a' এবং 'b' অংশকে ঘিরিয়া একটি পাতলা আবরণ (চিত্রের 'c' অংশ) থাকে, এই অংশটিকে 'ব্রান' (Bran) বলে। এই ব্রান-চিহ্নিত অংশে শস্যকণার কিছু ভাইটামিন, প্রোটিন এবং লবন দেখিতে পাওয়া যায়। সমগ্র শস্যকণাটি ঘিরিয়া একটি পুরু আস্তরণ থাকে। এই আস্তরণটিকে তুঁষ বা ভুষি (husk) বলে (চিত্রে 'd' অংশ)।

খাদ্যশস্য ও শস্যকণার সাহায্যে আমরা আমাদের কার্বোহাইড্রেটের অভাবই সাধারণতঃ পূরণ করিয়া থাকি। প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ ইহাতে অতি সামান্যই থাকে। ইহা ছাড়া এই সকল প্রোটিন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীরও নয়, অধিকাংশই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন। সুতরাং শুধু মাত্র এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি হইতে পারে না। বিভিন্ন খনিজ লবণের মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু শস্যকণার লৌহ শরীর গ্রহণ করিতে পারে না। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ইহাতে অনেক কম; উপরন্তু ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস উপযুক্ত অনুপাতে না থাকায় ইহা দেহের গ্রহণোপযোগী নয়।



সকল খাদ্যশস্যেই ভাইটামিন 'ই'-র প্রাচুর্য দেখা যায়; ভাইটামিন 'বি'-র পরিমাণও মন্দ নহে। কিন্তু সকল প্রকার খাদ্যশস্যেই ভাইটামিন 'এ', 'সি' এবং 'ডি'-র অভাব লক্ষিত হয়।

প্রায় সকল প্রকার খাদ্যশস্যেই কিছু না কিছু স্নেহ পদার্থ দেখা যায়। চাউল এবং গম অপেক্ষা জোয়ার, বাজরা, জৈ-তে স্নেহ পদার্থের পরিমাণ বেশী।

গম: গম হইতে সাধারণতঃ আটা এবং ময়দা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। শস্যকণার শুধুমাত্র বাহিরের অংশ (চিত্রের 'd' অংশ লক্ষ্য কর) আটা প্রস্তুত করিবার সময় বাদ দেওয়া হয়। সুতরাং গমের প্রায় সমস্ত প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থই আটায় বর্তমান থাকে। গমের প্রোটিনের পরিমাণ চাউল অপেক্ষা বেশী। তাই মাছ, মাংস, ঘি, ছানা প্রভৃতির সঙ্গে ভাত ও আটার রুটি দুইই অল্পাধিক পরিমাণে খাইলে উপকার হয়। আটার বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে কিছু উৎকৃষ্ট প্রোটিন, প্রচুর 'বি' ভাইটামিন এবং ম্যাঙ্গানিজ (Manganese) লবণ পাওয়া যায় কিন্তু ভাইটামিন 'এ'র অভাব ইহাতে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। উপযুক্ত পরিমাণে উৎকৃষ্ট প্রোটিন এবং ভাইটামিন 'এ' না থাকায় শুধু আটার সাহায্যে শরীর রক্ষা করা যায় না।

পাউরুটি: আটা এবং ময়দা হইতে বিভিন্ন প্রকার রুটি, বিস্কুট, কেক ইত্যাদি হইয়া থাকে। গমের মধ্যে গ্লায়াডিন (gliadin) এবং গ্লুটেলিন (gluteline) নামক দুইটি প্রোটিন দেখা যায়। জলের সাহায্যে এই প্রোটিন এক প্রকার আঠাল পদার্থে পরিণত হয়। এই জন্যই আটা, ময়দা জলে মাখিয়া উহার সাহায্যে সহজেই রুটি, লুচি ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। চাউল, জই, রাই, যব ইত্যাদির সাহায্যে এই প্রকার রুটি প্রস্তুত করা যায় না। কারণ, ইহাদের মধ্যে ঐ আঠাল প্রোটিন না থাকায় উহা সহজেই ভাঙিয়া যায়।

প্রাচীন কালে র্নটি প্রস্তুত প্রণালী আধ্নিক প্রণালী হইতে একটু স্বতন্ত্র ছিল। ময়দা ভাল করিয়া জলে মাখাইয়া প্রথমে একটি তাল (dough) প্রস্তুত করা হইত। পরে এই তাল কিছ্নক্ষণের জন্য একটি উত্তপ্ত স্থানে ফেলিয়া রাখা হইত। ইহার ফলে বায়ন (air) হইতে ঈস্ট (yeast) ঐ তালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহা গাঁজাইয়া (fermentation) কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করিত। এই গ্যাস স্ন্টির ফলে ঐ তালটি ফ্নলিয়া ফাঁপিয়া স্পঞ্জের আকৃতি ধারণ করিত। সেঁকিবার সময় (baking) ঐ গ্যাস আয়তনে আরও বৃদ্ধি পাইত, ফলে র্নটি নরম ও ফাঁপা হইত। এই কারণেই এখনও গৃহে র্নটি বা ল্নচি প্রস্তুত করিতে হইলে আটা বা ময়দা জলে মাখাইয়া কিছ্নক্ষণ ফেলিয়া রাখিতে দেখা যায়।

শ্নধ্নমাত্র বায়্নর উপর ঈস্টের জন্য নির্ভর না করিয়া আজকাল পাঁউর্নটি প্রস্তুতিতে ময়দার সহিত ঈস্ট মেশানো হয়। কখনও কখনও ঈস্টের পরিবর্তে বেকিং পাউডারও (baking power) ব্যবহার করা হয়। বেকিং পাউডার সাধারণতঃ টারটারিক অ্যাসিড (Tartaric acid) বা পটাসিয়াম হাইড্রোজেন টারটারেট (Potassium hydrogen tartarate)-এর সহিত সোডি-বাই-কার্ব (Sodium bicarbonate) মিশানো হয়। ময়দার সহিত এই বেকিং পাউডার মিশাইয়া জল দিলেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

পাঁউর্নটি প্রস্তুতিতে বেকিং পাউডারের পরিবর্তে ঈস্ট ব্যবহার করিলে উহার খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি পায়। ঈস্ট ভাইটামিন 'বি'-এর উৎকৃষ্ট উৎসস্থল। স্নতরাং পাঁউর্নটি ময়দা দ্বারা প্রস্তুত হইলেও ইহাতে ভাইটামিন 'বি' পাওয়া যায়। তবে এই ভাইটামিনের পরিমাণ সামান্যই। সমপরিমাণ আটায় ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী 'বি' ভাইটামিন থাকে। অপরদিকে বেকিং পাউডার ক্ষার জাতীয়। স্নতরাং এই ক্ষারের সংস্পর্শে র্নটির 'বি' ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।



পাঁউর্নটির ভিতরটা ফাঁপা এবং ফাঁপা অংশ গ্যাসে পূর্ণ থাকে। ইহা প্রধানতঃ কার্বো-হাইড্রেট জাতীয় খাদ্য, তবে অন্যান্য খাদ্যোপাদানও ইহাতে কিছ্ন দেখা যায়। একটি পাঁউর্নটির বিভিন্ন উপাদান-সমূহের মোটাম্নটি পরিমাণ উপরের চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

আটা অধিক দিন রাখিয়া দিলে নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য আজকাল আটা অপেক্ষা ময়দার প্রচলন বেশী। কিন্তু ময়দা প্রস্তুত করিবার সময় গমের একমাত্র 'b' অংশ ছাড়া অবশিষ্ট 'a', 'c' এবং 'd' অংশসমূহ (শস্যকণার চিত্র দেখ) নষ্ট হইয়া যায়। 'b' অংশের প্রধান উপাদান শ্বেতসার এবং সামান্য পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন, স্নতরাং

ময়দায় প্রোটিন, ভাইটামিন, লবণ এবং স্নেহ পদার্থ নাই বলিলেই চলে। এইজন্য ইহার খাদ্য-মূল্য আটা, চাউল, জোয়ার, বাজরা ইত্যাদির তুলনায় অনেক কম।

চাল ঃ চাল আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহার প্রায় শতকরা ৭৬ ভাগই শ্বেতসার। এই শ্বেতসার অতিশয় সহজপাচ্য। ইহাতে স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিনের পরিমাণ অত্যন্ত কম এবং এই প্রোটিন দ্বিতীয় শ্রেণীর। সাধারণতঃ ডালরূপেই আমরা উদ্ভিজ্জ প্রোটিন গ্রহণ করিয়া থাকি কিন্তু চাল, আটা, গম প্রভৃতিতে প্রোটিনের অংশ ডাল হইতে পরিমাণে কম হইলেও ভাত রুটি আমরা ডালের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ করি বলিয়া উহাদের সঙ্গে গৃহীত প্রোটিনের পরিমাণও উপেক্ষণীয় নয়। দেহ সংগঠনের পক্ষে চালের প্রোটিন গমের প্রোটিন অপেক্ষা অধিক উপযোগী। আবার গমের প্রোটিনের পরিমাণ চাল হইতে বেশী বলিয়া মাছ, মাংস. ডিম, দুধ প্রভৃতির সঙ্গে ভাত ও আটার রুটি দুইই অল্পাধিক পরিমাণে খাইলে উপকার হয়।

অন্যান্য খাদ্যশস্যের তুলনায় 'বি' ভাইটামিনও চালে অপেক্ষাকৃত কম, বিশেষতঃ কলে ছাঁটা চাউলে ঐ ভাইটামিন প্রায় কিছুই থাকে না। এইজন্য কলে ছাঁটা চাউল যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের 'বেরিবেরি' রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। ঢেঁকি ছাঁটা চালে শস্যের '*a*' এবং '*c*' অংশ (শস্যকণার চিত্র দেখ) বজায় থাকে। সুতরাং এই প্রকার চালে 'প্রোটিন', 'বি' ভাইটামিন এবং খনিজ পদার্থসমূহ বজায় থাকে। ভাতের মাড়ে প্রচুর শ্বেতসার, প্রোটিন, 'বি' ভাইটামিন এবং খনিজ দ্রবীভুত অবস্থায় থাকে। সুতরাং ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে ভাতের খাদ্যমূল্য অনেক কমিয়া যায়।

নিম্নে চাউল এবং অন্যান্য খাদ্যশস্যের পুষ্টিমূল্য তুলনা করা হইল—

ডাল ঃ আমাদের দেশে অড়হর, মসুর, ছোলা, মুগ, মটর, কলাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের ডাল দেখিতে পাওয়া যায়। ডালের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। গমের দ্বিগুণ এবং কলে-ছাঁটা চাউলের প্রায় চতুর্গুণ প্রোটিন ডালে আছে। যে কোন শস্যকণার (cereals) তুলনায় অনেক বেশী এবং অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন ইহাতে পাওয়া যায়। শস্যকণার প্রোটিনের অভাব ডালের দ্বারা অনেকটা পূরণ হইতে পারে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন-প্রধান খাদ্যের তুলনায় ডালে প্রোটিনের পরিমাণ কম নহে। কিন্তু এই প্রোটিন মাছ, মাংস ইত্যাদির প্রোটিনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। এক ছটাক যে কোন প্রকার ডালে প্রোটিনের পরিমাণ ১ ছটাক মাংসের প্রোটিনের সমান, ১ ছটাক ডিমের প্রোটিনের দ্বিগুণ এবং ১ ছটাক দুধের প্রোটিনের প্রায় সাত গুণ। সুতরাং আমাদের মত দরিদ্র দেশে অল্প ব্যয়ে ডাল হইতেই অধিকাংশ প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। কিন্তু ডালের প্রোটিনে এবং সব রকম উদ্ভিজ্জ প্রোটিনেই কোন কোন অ্যামিনো অ্যাসিডের পরিমাণ খুব কম থাকে। এইজন্য ইহার সহিত কিছু সম্পূর্ণ অর্থাৎ প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ করিতে হয়। বিভিন্ন রকম ডালে আবার বিভিন্ন রকমের অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে। তাই প্রতিদিন একরকম ডাল না খাইয়া একেক দিন একেক রকম ডাল কিংবা একদিনেই দুই তিন রকম ডাল মিশ্রিত করিয়া মিশ্র ডাল খাওয়া উচিত। চাল এবং ডালের প্রোটিন পরস্পরের পরিপূরক। চালে এবং গমে ঘাটতি আছে লাইসিন ও ট্রিপটোফ্যানের এবং ডালে ঘাটতি আছে মেথিওনিন ও ট্রিপটোফ্যানের।

শিশু ও কিশোরদের বৃদ্ধির পক্ষে লাইসিন অত্যাবশ্যক। লিভারের কোষগুলি সক্রিয় রাখার জন্য আবার মেথিওনিন প্রয়োজন। লাইসিন পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় ডালে, ডিমে এবং দুধে। ট্রিপটোফ্যান পাওয়া যায় দুধে এবং মেথিওনিন ডিমে। সুতরাং ভাত বা/এবং রুটির সঙ্গে ডাল, ডিম ও দুধ খাইলে একের ঘাটতি অন্যে পূরণ করে। খিচুড়ি কেবল উপাদেয় নয়, ইহার পুষ্টিমূল্যও বেশী।

প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে

খাদ্যশস্য	ক্যালরি	প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট
	গ্রাম হিসাবে		
চাল ঢেঁকিছাঁটা	৩৪৯	৮.৫	৭৭.৪
চাল কলেছাঁটা	৩৪৫	৬.৪	৭৯.০
গমের আটা	৩৪১	১২.১	৬৯.৪
সাদা পাঁউরুটি	২৪৫	৭.৮	

প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	কার্বোহাইড্রেট
	গ্রাম হিসেবে		
ছোলার ডাল	৩৮৫	২০.৮	৫৯.৮
মটর	৩৫৪	২৪.৫	৭১.০
মুগ	৩৫৮	২৭.৫	৫৯.৯
অড়হড়	৩৫৭	২২.৩	৫৭.৬
মসুর	৩১৬ ৩৭১	২০.৫ ২৫.১	৫৯.৯
মাসকলাই	৩২৬	২২.৯	৫৯.৬
সয়াবীন	৩৫০ ৩৫৩	৩৪.৯ ৪৩.২	১২.০ ২০.৯

ডাল রান্না করিতে খরজল ব্যবহার করিলে ডাল ভাল সিদ্ধ হয় না এবং ঐ ডাল পরিপাক করিতেও অসুবিধা হয়। এইজন্য মৃদু জলে ডাল রান্না করিতে হয়।

লৌহ এবং ফসফরাসঘটিত লবণ ডালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া অন্যান্য খনিজ লবণ ইহাতে সামান্যই আছে। সমস্ত প্রকার ডালেই 'বি' ভাইটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ভাইটামিন 'এ' এবং 'সি' ইহাতে নাই বলিলে চলে। কিন্তু অঙ্কুরিত ছোলা বা ডালে ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' পাওয়া যায়।

মাসকলাই, ছোলার ডাল এবং সয়াবীন লৌহের একটি প্রধান উৎস বলা যায়। ডালের মধ্যে উচ্চ হারে আত্মস্থ (absorbed) হয় যথাক্রমে অড়হড়, মাসকলাই, ছোলার ডাল, মটর, মুগ ও মসুর ডাল। রান্না করিবার সময় ডালের ভাইটামিন 'বি' কিছুটা নষ্ট হয়।

অংকুরিত ছোলা (Sprouted gram) ঃ অংকুরিত ছোলাও একপ্রকার ডাল। সুতরাং ডালের ন্যায় ছোলাতেও যথেষ্ট প্রোটিন থাকে। কিন্তু এই প্রোটিন মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রোটিনের তুলনায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর। একশত গ্রাম ছোলার ডালে ২০.৮ গ্রাম প্রোটিন, ৫.৬ গ্রাম স্নেহ, ৫৯.৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৫৬ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ৯.১ মিলিগ্রাম লৌহ, ৩৩১ মিলিগ্রাম ফসফরাস আছে। ইহা ছাড়া প্রচুর পরিমাণ ভাইটামিন 'বি' ছোলার ডালে আছে। অংকুরিত ছোলা আবার দুইটি কারণে ডাল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। প্রথমতঃ, রান্নার ফলে ডালের 'বি' ভাইটামিন কিছুটা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু অংকুরিত ছোলা কাঁচা খাওয়া হয় বলিয়া এই ভাইটামিনটি নষ্ট হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতঃ যে কোন ডালে ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' প্রায় নাই বলিলেই চলে। কিন্তু অংকুরিত ছোলাতে আবার এই দুইটিও পাওয়া যায়। এই কারণে অনেক লোক অংকুরিত ছোলা খাইয়া থাকে। নিম্নে ১০০ গ্রাম অংকুরিত ছোলার সঙ্গে ১০০ গ্রাম চীনাবাদামের খাদ্যোপাদানের তুলনা করা হইল ঃ

	প্রোটিন	স্নেহ	কার্বো-হাইড্রেট	ক্যালসিয়াম মিলিগ্রামে	লৌহ মিলিগ্রামে	ফসফরাস মিলিগ্রামে	ভাইটামিন
চীনাবাদাম (কাঁচা)	২৬.৭	৪০.১	২০.৩	৫০	০.৩	৪৪০	'বি'
ঐ ভাজা	৩১.৫	৩৯.৮	১৯.৩	৫০	১.৬	৩৯০	ঐ
অংকুরিত ছোলা	১৭.১	৫.৩	৬১.২	১৯০	৯.৮	২৪০	'এ' 'বি' 'সি'

বিভিন্ন প্রকারের বাদাম (Nuts and beans) ঃ সকল প্রকার বাদামেই প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে। এক আউন্স ডিমের তুলনায় এক আউন্স বাদামে অনেক বেশী প্রোটিন থাকে। কিন্তু এই প্রোটিন মাছ, মাংস বা ডিমের প্রোটিনের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বা প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন নয়। তবে ডাল, আটা ইত্যাদি প্রোটিনের

তুলনায় ইহা উৎকৃষ্টতর। প্রোটিন বাদে বাদামে যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহ ও ভাইটামিন 'বি' পাওয়া যায়। যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহ থাকার জন্য বাদাম বেশী খাইলে পরিপাকে গোলমাল দেখা দেয়। প্রতিদিন কিছু কিছু বাদাম খাইলে প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের চাহিদা অনেকটা পূরণ হয়। মাছ, মাংস বা ডিমের তুলনায় ইহা অনেক সস্তা। সুতরাং গরীব জনসাধারণের সুষম খাদ্য প্রস্তুতিতে ইহা একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারে।

চীনা বাদাম (ground nuts): সকল প্রকার বাদামেই প্রচুর প্রোটিন পাওয়া যায়। চীনাবাদামও প্রোটিনের একটি অন্যতম উৎস। এক পাউণ্ড ডিমের তুলনায় এক পাউণ্ড বাদামে অনেক বেশী প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিন খাদ্যশস্য এবং ডালের প্রোটিন অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। তবে মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্টতর। তাই মাছ, মাংস, ডিম ও দুধের অভাব শুধু চীনাবাদাম দিয়া পূরণ করা যায় না। বাদামে আবার স্নেহের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী থাকে। অধিক পরিমাণ বাদাম খাইলে তাই পরিপাক করিতে কষ্ট হয়।

কন্দ জাতীয় তরকারি (Roots and Tubers): এই জাতীয় তরকারি সাধারণতঃ মাটির নীচে উৎপন্ন হয়। আলু, মূলা, পেঁয়াজ, কচু, ওল, বীট, গাজর ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের মধ্যে আলু প্রধানতঃ শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য। পেঁয়াজ এবং গাজরে সামান্য পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট আছে। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রোটিনও পাওয়া যায়, কিন্তু এই প্রোটিন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর নয়। খাদ্যশস্য (Cereals) হইতে ইহাতে ভাইটামিন 'বি'-এর পরিমাণ কম থাকে। বীটে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। গাজর এবং রাঙা আলু বাদ দিলে এই শ্রেণীর খাদ্যে ভাইটামিন 'এর' পরিমাণও সামান্যই। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ খনিজ লবণ এবং সামান্য ভাইটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

সবুজ শাক-সবজি (Green Leafy Vegetables): বিভিন্ন প্রকার তরি-তরকারির মধ্যে বাঁধাকপি, পালং শাক, কলমী শাক, নটে শাক, লাউ শাক, কুমড়া শাক, সজনা ফুল, নিমপাতা ইত্যাদি সবজি জাতীয়। এই সকল সবজির প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ জল। তাহা হইলেও খাদ্য হিসাবে ইহাদের গুরুত্ব কম নহে। ইহাদের সবুজ অংশে ক্যারটিন (Carotine) নামে এক প্রকার পদার্থ থাকে। এই ক্যারটিন হইতে আমাদের দেহে ভাইটামিন 'এ' উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই শ্রেণীর খাদ্য ভাইটামিন 'এ'-র একটি বড় উৎস। ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি'ও এই সকল খাদ্য-দ্রব্যে পাওয়া যায়। বিভিন্ন প্রকারের খনিজ লবণ সবুজ শাক-সবজিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এই সকল খনিজ লবণ রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখে। প্রোটিনের পরিমাণ শাক-সবজিতে কম হইলেও এই প্রোটিন শরীরকে খাদ্য-শস্যের নিকৃষ্ট প্রোটিন গ্রহণে সহায়তা করে। সেলুলোজ নামক এক প্রকার দুষ্পাচ্য কার্বো-হাইড্রেট শাক-সবজির একটি উপাদান। ইহা আমরা জীর্ণ করিতে পারি না। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে এই সেলুলোজ আমাদের দেহের কোন উপকারে আসে না। কিন্তু পরোক্ষভাবে ইহা আমাদের অন্ত্রের ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেহকে সুস্থ রাখে। খাদ্যে শাক-সবজির এই সেলুলোজ কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।

অন্যান্য তরকারি (Other Vegetables) : শাক-সবজি ব্যতীত আমরা প্রতিদিন কিছু না কিছু তরকারিও খাইয়া থাকি। উচ্ছে, লাউ, কুমড়া, চালকুমড়া, পটল, ঝিঙে, ঢেঁড়স, কাঁচা পেঁপে, কাঁচকলা, এঁচড়, সিম, বরবটি, কড়াইশুঁটি, থোড়, মোচা, ডুমুর, কাঁঠালবিচি, সজনা ডাঁটা ইত্যাদি তরকারির অন্তর্গত। সব তরকারিতেই খনিজ লবণ এবং ভাইটামিন বিশেষতঃ 'বি' গোষ্ঠীর ভাইটামিন কম বেশী পাওয়া যায়। তাছাড়া ভাত আমাদের প্রধান খাদ্য বলিয়া ভাতের সঙ্গে খাইবার মত কিছু তরকারিও দরকার। মাছ, মাংস, ডিম এমন কি ডাল পর্যন্ত আজ এত মহার্ঘ হইয়া পাড়িয়াছে যে পেট ভরাইবার জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে তরকারি ও শাকপাতার উপর অনেকখানি নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তরকারির ক্যালরি অল্প বলিয়া মেদবহুল লোকেদের খাদ্যে বেশ কিছুটা তরকারি থাকা দরকার।

উচ্ছে, পটল, ডুমুর, সজনা ডাঁটা ইত্যাদিতে ক্যারটিন পাওয়া যায়। সব তরকারিতেই কম বেশী 'বি' ভাইটামিন আছে, তবে উচ্ছে, পটল, ডুমুর, ঢ্যাড়স, বেগুন, মোচা, কাঁঠালবিচি, কুমড়া, ঝিঙে ইত্যাদিতে প্রায় সব কয়টি প্রধান 'বি' ভাইটামিন পাওয়া যায়। বিন, কড়াইশুঁটি, লঙ্কা, উচ্ছে, সজনা ডাঁটা, কাঁঠালবিচিতে যথেষ্ট ফসফরাস পাওয়া যায়। কাঁচকলায় সব কয়টি ভাইটামিন সামান্য পরিমাণে আছে তবে উহাতে লোহার পরিমাণ উপেক্ষণীয়। প্রতি একশত গ্রাম উচ্ছেতে ৯.৪ মিগ্রা, সজনে ডাঁটায় ৫.৩ মিগ্রা এবং বিনে ২.৩ মিগ্রা লোহা পাওয়া যায় পরন্তু মোচায় ১.৬ মিগ্রা, থোড়ে ১.১ মিগ্রা এবং কাঁচকলায় মাত্র ০.৬ মিগ্রা লোহা আছে।

ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের উপস্থিতির জন্য শাকসবজির মত অন্যান্য তরকারিও আমাদের খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ।

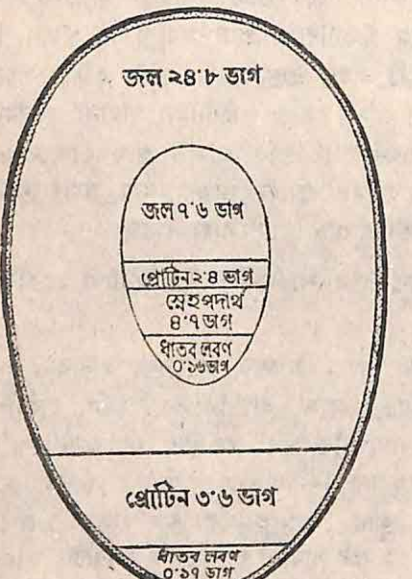
ফল (Fruits) : আমাদের দেশে আম, আতা, আঙ্গুর, আপেল, আনারস, আখ, কলা, কাঁঠাল, জলপাই, জামরুল, ডালিম, তরমুজ, বাতাবিলেবু, বেল, মুসাম্বি, পেয়ারা, লিচু, সবেদা, তালশাঁস, নোনা, নাসপাতি, শশা, পেঁপে, ফুটি, টঁ্যাপারি, কুল ইত্যাদি নানা জাতের এবং নানা স্বাদের বিবিধ ফল জন্মায়। টাটকা ফলে প্রচুর ভাইটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। আম (আলফানজো সর্বোৎকৃষ্ট), আতা, পাকা পেঁপে, কমলালেবু এমন কি টঁ্যাপারির মত সামান্য ফলে প্রচুর ক্যারটিন পাওয়া যায়। সমস্ত ফলে 'বি' গোষ্ঠীর ভাইটামিন কম বেশী পরিমাণে রহিয়াছে। তবে আতা, বেল এবং ঝুনা নারিকেলে প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। ডালিম, মুসাম্বি, নারিকেল ও টঁ্যাপারি ইত্যাদি ফলে আবার যথেষ্ট ফসফরাস আছে। পেয়ারা, টমেটো, কমলালেবু, ল্যাংড়া আম এবং পাকা পেঁপে আবার ভাইটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। ফল হিসাবে ঝুনা নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট। ১০০ গ্রাম নারিকেলে ৬৬২ গ্রাম ক্যালরি পাওয়া যায়, তাছাড়া ফ্যাট, ক্যালসিয়াম (৪০০ মিগ্রা), ফসফরাস (২১০ মিগ্রা) এবং সামান্য প্রোটিনও আছে। ফল হিসাবে কুল, পেয়ারা এবং টঁ্যাপারি উপেক্ষণীয় নয়।

ভাইটামিন এবং খনিজ লবণে সমৃদ্ধ থাকায় ফল আমাদের রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া শরীর সুস্থ রাখে। রোগ প্রতিরোধকারী শক্তির জন্য ফল রক্ষাকারী খাদ্য

হিসাবে গণ্য। সব বয়সেই ফল আমাদের খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। তবে শৈশবে, বার্ধক্যে এবং রোগমুক্তির পর ফলের গুরুত্ব বেশী অনুভূত হয়। মেদবহুল লোকেদের কার্বোহাইড্রেট কমাইয়া এবং ফ্যাট পরিহার করিয়া শাকসবজি ও ফলের উপরে বেশী নির্ভর করা উচিত।

মাংস (Meat): উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের জন্য মাংসের প্রয়োজন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাংসের প্রোটিনে প্রয়োজনীয় সকল অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহই পাওয়া যায়। প্রত্যহ ভাত, ডাল ইত্যাদির সহিত কিছু কিছু মাংস গ্রহণ করিয়া প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। মাংসের চর্বি শুধু স্নেহ পদার্থের অভাবই পূরণ করে না, ইহা খাদ্যে ভাইটামিন 'এ'ও সরবরাহ করে। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'বি', 'সি', 'ডি' এবং 'ই'ও মাংসে অল্প পরিমাণে থাকে। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে এই সকল ভাইটামিনের অভাব পূরণ করিতে হয়। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণ ফসফরাস ঘটিত লবণ এবং সামান্য ক্যালসিয়াম লবণ পাওয়া যায়।

যকৃৎ (Liver): বিভিন্ন প্রাণীর যকৃৎ একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যবস্তু। দেহের উদ্বৃত্ত কার্বোহাইড্রেট ভবিষ্যতের খাদ্য হিসাবে এই যকৃতেই জমানো থাকে। বিভিন্ন প্রকার ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটামিন 'এ' ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'বি', 'সি' এবং 'ডি'ও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যকৃতের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। খনিজ লবণের মধ্যে ম্যাঙ্গানিজ এবং লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়; ম্যাঙ্গানিজ দেহের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। স্নেহ জাতীয় পদার্থও যকৃতে কম নহে। সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন যকৃৎ খাওয়া উচিত।



একটি ৫০ গ্রাম ওজনের ডিমের উপাদানসমূহের পরিমাণ। বাহিরের প্রায় ৬ গ্রাম ওজনের শক্ত আবরণটি চিত্রে দেখান হয় নাই

ডিম (Egg): বিভিন্ন প্রকার প্রাণিজ খাদ্যের মধ্যে ডিম একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য। ডিমের সাদা অংশটি প্রধানতঃ অ্যালবুমেন (Albumen) নামক এক প্রকার প্রোটিন দ্বারা গঠিত। স্নেহ পদার্থ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং লৌহ-ঘটিত লবণ ডিমের কুসুমে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। একমাত্র ভাইটামিন 'সি' বাদে প্রায় সকল প্রকার ভাইটামিনই ইহাতে আছে। ডিমের মধ্যে কোন কার্বোহাইড্রেট থাকে না। একটি মাঝারি আকৃতির ডিমের কুসুম এবং সাদা অংশের উপাদানসমূহের মোটামুটি পরিমাণ চিত্রে দেখানো হইল।

প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট
	গ্রাম হিসাবে		
ডিম			
হাঁস	১৮১	১৩.৫	১৩.৭
মুরগী	১৭৩	১৩.৩	১৩.৩
মাংস			
মুরগী	১০৯	২৫.৯	০.৬
পাঁঠা	১১৮	২১.৪	৩.৬
ভেড়া	১৯৪	১৮.৫	১৩.৫
মেটে (ভেড়ার)	১০৭	২০.০	৩.০

মাছ ঃ মাছ বাঙালীর একটি প্রধান খাদ্য, ইহাতে অধিক পরিমাণে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। মাংস অপেক্ষা মাছ অধিকতর সহজপাচ্য। কেবলমাত্র ভাইটামিন 'সি' বাদে অন্যান্য ভাইটামিনসমূহ প্রায় সমস্তই মাছে পাওয়া যায়। তৈল জাতীয় মাছে, যথা—ইলিশ মাছ এবং সমুদ্রের মাছে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' অধিক পরিমাণে থাকে। যে সকল খনিজ লবণ মাছে পাওয়া যায় তাহার মধ্যে আয়োডিন এবং তাম্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর মাছ আমরা দেখিতে পাই ঃ—

(১) ছোট মাছ, যথা—মৌরলা, বাটা, বাচা, ফ্যাসা, চাঁদা, পুঁটি, পাবদা, ট্যাংরা, রয়না, খলিসা প্রভৃতি।

(২) বড় মাছ, যথা—বোয়াল, চিতল, আড়, রুই, কাতলা প্রভৃতি।

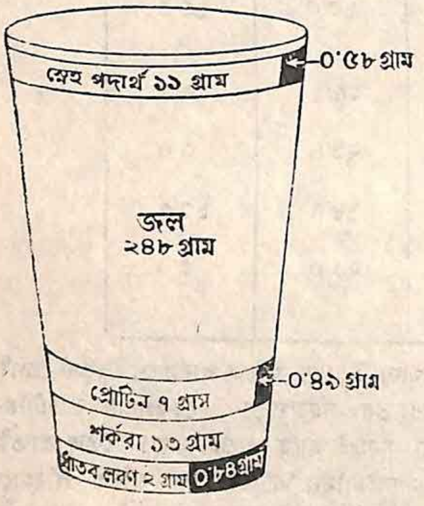
ছোট মাছের তন্তুগুলি অপেক্ষাকৃত নরম এবং ইহাতে স্নেহ-পদার্থ কম থাকে, এই জন্য ছোট মাছ সহজপাচ্য। ইহা ছাড়া ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং আয়োডিন এই শ্রেণীর মাছে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

অধিক স্নেহ পদার্থ এবং অপেক্ষাকৃত শক্ত তন্তুর জন্য বড় মাছ হজম করা অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। আজকাল শহরে সাধারণতঃ বড় বড় মাছ বরফ চাপা অবস্থায় চালান করা হয়। এই জন্য এই সকল মাছের খাদ্যমূল্যও কমিয়া যায়। কিন্তু ছোট ছোট মাছ সাধারণতঃ স্থানীয় পুকুর ইত্যাদি হইতেই সংগ্রহ করিয়া টাটকা অবস্থায় বিক্রি করা হয়। এই জন্য বড় মাছের তুলনায় ছোট মাছের খাদ্যমূল্য বেশী। ইলিশ,

বড়-কৈ, মাগুর, বাইন, পাঙ্গাশ ইত্যাদি চর্বিবহুল মাছ। ইহাদের মধ্যে ভাইটামিন 'এ এবং 'ডি' অধিক পরিমাণে থাকে।

দুধ ঃ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুধ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য। শরীর রক্ষার প্রায় সমস্ত উপাদানসমূহই ইহাতে পাওয়া যায়। যে সকল জন্তুর দুধ আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া থাকি তাহার মধ্যে গরুর দুধই অধিক প্রচলিত। দুধের মধ্যে জলের পরিমাণই সর্বাপেক্ষা অধিক।

দুধের প্রোটিন অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর; ইহাতে দেহ গঠনের সকল অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহই উপযুক্ত অনুপাতে আছে। দুধে লাইসিন ও ট্রিপটোফ্যান পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় ভাত এবং রুটিতে যাহার ঘাটতি আছে। দুধ-ভাত অথবা পায়েস তাই উৎকৃষ্ট খাদ্য কারণ একের অভাব অন্যের দ্বারা পূরণ হয়। ক্যাসিন (Casein) এবং ল্যাক্টো অ্যালবুমেন (Lacto-albumen) এই দুইটিই দুধের প্রধান প্রোটিন। ইহাতে ল্যাক্টোজ (Lactose) নামক কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায়। ইহাকে দুগ্ধ শর্করা বলে। আখের চিনি (Sugar) অপেক্ষা ইহার মিষ্টত্ব অনেক কম, এই ল্যাক্টোজ হইতে অম্ল অ্যাসিড উৎপন্ন হয়; ফলে বিভিন্ন জীবাণুদ্বারা পেটে গ্যাস সৃষ্টি হইতে পারে না। ইহা ছাড়া খাদ্যের ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসঘটিত লবণ দেহের মধ্যে শোষিত হইতে ইহা সাহায্য করিয়া থাকে; দুধের স্নেহ পদার্থ অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর এবং অতিশয় সহজপাচ্য। ইহাতে অস্থি গঠনকারী ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস লবণ যথেষ্ট পরিমাণে এবং উপযুক্ত অনুপাতেই পাওয়া যায়। এই জন্য শিশুর খাদ্যে দুধের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দুধে ভাইটামিন 'এ' এবং 'বি' পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'সি' এবং 'ডি'-এর পরিমাণ ইহাতে সামান্যই।



সাদা অংশের লেখা এক গ্লাস দুধের বিভিন্ন উপাদানের শতকরা যে পরিমাণ অংশ দেহ গ্রহণ করিতে পারে না তাহা কালো চিহ্নিত অংশদ্বারা নির্দেশ করা হইয়াছে। ঐ গ্লাসে দুধের পরিমাণ ২৮১ গ্রাম ধরা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য যে সকল উপাদান খাদ্যে থাকা প্রয়োজন তাহার প্রায় সমস্তই দুধে উপযুক্ত অনুপাতে বিদ্যমান। এইজন্যই দুধ আমাদের আদর্শ খাদ্য (Ideal food) বলিয়া বিবেচিত হয়। দুধের বিভিন্ন উপাদানসমূহ প্রায় সমস্তই দেহ গ্রহণ করিয়া নিজের কাজে লাগাইতে পারে, ইহার অতি সামান্য অংশই নষ্ট হয়। এক গ্লাস দুধের বিভিন্ন উপাদানসমূহের পরিমাণ এবং তাহা হইতে দেহের গ্রহণোপযোগী অংশ চিত্রে দেখানো হইল।

বিভিন্ন খনিজ লবণের মধ্যে লৌহঘটিত লবণ অতি সামান্যই দুধে পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন লৌহঘটিত লবণের চাহিদা ইহার সাহায্যে পূরণ হয় না। ইহা ছাড়া ভাইটামিন 'সি'ও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। এইজন্যই দুধ আদর্শ খাদ্য হইলেও সম্পূর্ণ খাদ্য (Complete food) নহে। গরুর দুধ শিশুর প্রধান খাদ্য হইলে উহার ভাইটামিন 'সি' এবং লৌহঘটিত লবণের অভাব টমেটো, সবুজ শাকসবজি ইত্যাদি হইতে পূরণ করিতে হয়।

প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা
	গ্রাম হিসাবে			
গোদুগ্ধ	৬৭	৩·২	৪·১	৪·৪
মহিষ দুগ্ধ	১১৭	৪·৩	৮·৮	৫·১
ছাগ দুগ্ধ	৭২	৩·৩	৪·৫	৪·৬

মহিষের দুধে প্রোটিনের পরিমাণ গরুর দুধ অপেক্ষা বেশী এবং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ গরুর দুধের প্রায় দ্বিগুণ। এইজন্য মহিষের দুধ হজম করা কষ্টসাধ্য। ছাগল এবং ভেড়ার দুধেও প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থের পরিমাণ গরুর দুধের তুলনায় বেশী। ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' ছাগল ও ভেড়ার দুধে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্যই গরুর দুধ অপেক্ষা এই প্রকার দুধের খাদ্যমূল্য অধিক।

দুগ্ধজাত খাদ্য (Milk Products): দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্য বিশেষতঃ ক্ষীর, ননী, সর, সরভাজা, ছানা, ছানার প্রস্তুত মিষ্টান্ন, দই এবং ঘোল ইত্যাদি বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য। ঘোল এবং ক্ষীর ব্যতীত দুগ্ধের অন্য সব উপাদানই ছানা এবং পনিরে বজায় থাকে। ঘোল হইতে মাখন তোলা হয় বলিয়া ঘোলে 'এ' ভাইটামিন থাকে না এবং ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসও কমিয়া যায় এবং স্নেহ পদার্থ বা ফ্যাট খুব অল্প অবশিষ্ট থাকে। দুধে লৌহের পরিমাণ খুব সামান্য এবং ক্ষীর প্রস্তুতির সময় তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

মাখন (Butter)—দুধের স্নেহ পদার্থের সাহায্যেই মাখন প্রস্তুত হয়। ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি' স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয়। এইজন্য দুধের এই সকল ভাইটামিন-সমূহ মাখনে পাওয়া যায়। তথাপি দুধের ন্যায় মাখনেও ভাইটামিন 'ডি'-এর পরিমাণ অল্প। অন্যান্য ভাইটামিনসমূহ ইহাতে দেখা যায় না। মাখনের বিশেষত্ব এই যে, সকল প্রকার স্নেহ পদার্থের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য।

ঘি (Ghee)—মাখনের জলীয় অংশ বিতাড়িত করিয়া ঘি প্রস্তুত করা হয়। এইজন্য মাখন অপেক্ষা ঘি অধিক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে। খোলা পাত্রে এবং বাতাসের সংস্পর্শে অধিকক্ষণ উত্তপ্ত করিলে মাখনের ভাইটামিন 'এ' অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ঘি প্রস্তুত করিবার সময় যথাসম্ভব ঢাকিয়া প্রস্তুত করা উচিত।

মাখন বা ননী তুলিয়া লইবার পর যে দুধ পড়িয়া থাকে তাহাকে skimmed milk বলে। এই দুধে প্রোটিন, বিভিন্ন খনিজ লবণ, ভাইটামিন 'বি' এবং সামান্য ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়। সুতরাং দেহের পুষ্টির জন্য এই দুধের গুরুত্ব যথেষ্ট।

মাখন ও ঘিয়ের পার্থক্য ঃ মাখন এবং ঘি উভয়ই দুগ্ধজাত খাদ্য এবং স্নেহ প্রধান। তথাপি উভয়ে কিছু পার্থক্য আছে তাহা (১০০ গ্রাম) নীচে দেখান হইল,

	ক্যালরি	ফ্যাট	ভাইটামিন 'এ' (I. U.)
মাখন	৭২৯	৮১.০	৩২০০
ঘি	৮২৮	৯২.০	২০০০

মাখনে জলীয় পদার্থ বেশী। তাই মাখনে ক্যালরি এবং ফ্যাটের পরিমাণ ঘিয়ের তুলনায় কম। মাখনে আবার 'এ' ভাইটামিন বেশী। মাখনে জলীয় পদার্থ আছে বলিয়া সহজেই নষ্ট হয় এবং মাখনের তুলনায় ঘি বেশী দিন সংরক্ষণ করা যায়।

দুগ্ধজাত খাদ্য প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট
গোদুগ্ধ	৬৭	৩.২	৪.১
দই (গোদুগ্ধজাত)	৬০	৩.১	৪.০
ক্ষীর (ঐ)	৪১৩	২০.১	২৫.৯
ছানা (ঐ)	২৬৫	১৮.০	২০.৮
পনির	৩৪৮	২৪.১	২৫.১
ঘোল	১৫	০.৮	১.১

স্নেহ এবং তৈলজাতীয় খাদ্য (Fats and Oils) ঃ হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় মানুষ জানিয়াছে ঘি দুধ মাখন খাইলে শরীর হৃষ্টপুষ্ট হয়, চেহারায় লাবণ্য ও কান্তি আসে। শীতের দেশের মানুষ শরীর গরম রাখার জন্য চর্বি খায়। স্নেহপদার্থে রান্না করা খাবার হয় সুস্বাদু এবং তাহার পুষ্টিমূল্যও বৃদ্ধি পায়। বাস্তবিকই আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে স্নেহ এবং তেলজাতীয় পদার্থের একটি বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

মানবদেহে কার্বোহাইড্রেট ও প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে স্নেহপদার্থ বিশ্লেষিত হওয়া সত্ত্বেও সুষম খাদ্যে ইহার উপস্থিতি আবশ্যক। এই শ্রেণীর খাদ্যের সহিত মিশ্রিত কিছু পরিমাণ স্নেহদ্রাব্য খাদ্যপ্রাণ ও কয়েকটি অপরিহার্য স্নেহজাতীয় অ্যাসিড (Essential fatty acid) খাদ্যের সহিত গৃহীত হয়। মানবদেহে লিনোলেইক (Linoleic) এবং অ্যারাচিডোনিক (Arachidonic) নামক কয়েকটি অসংখ্য অসম্পৃক্ত স্নেহজাতীয় অ্যাসিড সংশ্লেষিত হয় না। এই শ্রেণীভুক্ত স্নেহজাতীয় অ্যাসিড কয়েকটি গুরুতর শারীর বৃত্তীয় কার্য সম্পাদনে অংশ গ্রহণ করে বলিয়া সুষম খাদ্যে এই উপাদানগুলির উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। এগুলি সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ তেল (vegetable oil) এবং কিছু পরিমাণ মাংসপেশীর তন্তু (muscle tissue) এবং

মাছের তেলেও পাওয়া যায়। আমরা সারাদিনে যে ক্যালরি গ্রহণ করি এই অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিডগুলির পরিমাণ তাহার শতকরা চার ভাগের বেশী হওয়া উচিত নয়। এইগুলির অভাবে একজিমা জাতীয় চর্মরোগের প্রকোপ দেখা যায়।

যদিও আমাদের প্রতিদিনকার খাদ্যে কিছু স্নেহজাতীয় উপাদান থাকা দরকার তথাপি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য গ্রহণই বাঞ্ছনীয়। সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য মেদবৃদ্ধি করায়, রক্তে কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং হার্টের উপর চাপ সৃষ্টি করে। তাই শ্রমহীন জীবনে এবং বার্ধক্যে ঘি-মাখন-চর্বিযুক্ত খাদ্য পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। নিম্নে বিভিন্ন তেল-ঘিতে সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের হার দেখানো হইল ঃ

ফ্যাটি অ্যাসিডের হার দেখান হইল ঃ

স্নেহপদার্থের নাম	সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড		অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড	
ভয়সা ঘি	শতকরা	৬৩˙৬	শতকরা	৩৬˙৪
গাওয়া ঘি	,,	৫৯˙৫	,,	৪০˙৫
নারিকেল তেল	,,	৯১˙৫	,,	৮˙৫
বনস্পতি	,,	৯৪˙০	,,	৬˙০
সরিষার তেল	,,	৪˙০	,,	৯৬˙০
বাদাম তেল	,,	১৯˙৪	,,	৮১˙০
তিল তেল	,,	১৩˙৫	,,	৮৪˙৫
সূর্যমুখীর তেল	,,	৬˙০	,,	৯৪˙০
তুলাবীজের তেল	,,	২৩˙৫	,,	৭৬˙৫

সব রকম তেল-ঘিতেই সম্পৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে উহাদের আধিক্যবশতঃ কোনটিকে সম্পৃক্ত আবার কোনটিকে অসম্পৃক্ত আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

সম্পৃক্ত স্নেহ পদার্থ রক্তের কোলেস্টেরল বৃদ্ধি করে

বিভিন্নখাদ্যে কোলেস্টেরল (প্রতি ১০০ গ্রাম)

ডিম (আস্ত)	৫০০	মিলিগ্রাম
ডিমের কুসুম	১৫০০	,,
মাখন	২৫০	,,
ক্রীম	১২০	,,
দুধ	১১	,,
মুর্গীর মাংস	৬০	,,
ভেড়া বা ছাগ মাংস	৭০	,,
ঐ চর্বি	৯৫	,,
মেটে	৩০০	,,

কোন্ কোন্ স্নেহপদার্থ কোলেস্টেরলের উপর কি ধরনের প্রভাব বিস্তার করে ঃ

(১) কোলেস্টেরল বৃদ্ধির সহায়ক—ঘি, মাখন, মাংসের চর্বি, বনস্পতি ও নারিকেল—সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য।

(২) কোলেস্টেরলের উপর প্রভাব নাই—বাদাম তেল, সরিষার তেল, জলপাইএর তেল।

(৩) কোলেস্টেরল কমাইতে সহায়তা করে—সূর্যমুখীর তেল, সয়াবীনের তেল, মাছের তেল, তুলাবীজের তেল।

চিনি ও গুড় (Sugar and Jaggery) ঃ চিনি ও গুড় প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। চিনির শতকরা ১০০ ভাগই কার্বোহাইড্রেট, ইহাতে খাদ্যের অন্য কোন উপাদান থাকে না। ইহাকে বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেটও বলা যায়। যাহারা রোগা, দুর্বল বা অধিক পরিশ্রমী তাহাদের পক্ষে চিনির শরবত মাঝে মাঝে পান করা উপকারী। গুড়কে মিশ্র খাদ্য বলা যায়। যদিও গুড়ের অধিকাংশই কার্বোহাইড্রেট তবুও ইহাতে সামান্য খনিজ লবণ ইত্যাদি থাকে। শরীরের পক্ষে চিনি অপেক্ষা গুড় অধিক উপকারী। দামেও চিনি অপেক্ষা গুড় সস্তা।

অ্যাসিড ও ক্ষারধর্মী খাদ্য ঃ খনিজ লবণের গন্ধক, ক্লোরিন, ফস্ফরাস ইত্যাদি হইতে আমাদের শরীরে অম্ল বা অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। গন্ধক, ক্লোরিন, ফস্ফরাস ইত্যাদি মাছ, মাংস, ডিম, ভাত, ডাল, আটা, রুটি ইত্যাদিতে অধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং এই সকল খাদ্য আমাদের শরীরে অ্যাসিড সৃষ্টি করে। এইজন্য এই জাতীয় খাদ্যদ্রব্যকে **অ্যাসিড উৎপন্নকারী খাদ্য** (Acidic foods) বলা যাইতে পারে। দেহে অ্যাসিড উৎপন্নকারী খাদ্যের আধিক্য ঘটিলে রক্ত দূষিত হয় এবং পরিশেষে **অ্যাসিডোসিস** (Acidosis) নামক রোগের সৃষ্টি হয়।

অপর পক্ষে যে সকল লবণে সোডিয়াম (Sodium), পটাসিয়াম (Potassium) ক্যালসিয়াম (Calcium), ম্যাগনেসিয়াম (Magnesium), লৌহ (Iron) ইত্যাদি থাকে তাহারা ক্ষারধর্মী (alkaline), অর্থাৎ তাহারা শরীরে ক্ষার (alkaline) উৎপন্ন করে। বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, ফল-মূল, যথা—পালং শাক, লেট্যুস শাক, টমেটো, কমলালেবু, কলা, পটল ইত্যাদিতে এই শ্রেণীর ক্ষার উৎপাদনকারী লবণ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং এই জাতীয় খাদ্যে আমাদের দেহে ক্ষার উৎপন্ন হয়। এইজন্য এই প্রকার খাদ্যকে **ক্ষার উৎপন্নকারী** খাদ্য (alkaline foods) বলে।

মাছ, মাংস ইত্যাদির সহিত প্রচুর পরিমাণে তরি-তরকারি, ফল-মূল, শাক-সবজি ইত্যাদি খাইলে মাছ, মাংস ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন অ্যাসিড ফলমূল, শাক-সবজি ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন ক্ষারধর্মী লবণের দ্বারা সহজেই প্রশমিত হইতে পারে। ফলে দেহে অ্যাসিড সৃষ্টি হইয়া অ্যাসিডোসিস রোগ হইতে পারে না। **এইজন্যই মাছ, মাংস, ভাত, রুটি ইত্যাদির সহিত শাক-সবজি, ফলমূল খাইবার রীতি প্রচলিত আছে।**

খাদ্যমূল্য হিসাবে কয়েকটি খাদ্যের তুলনামূলক আলোচনা

	ডিম	শাক-সবজি	ভাত	দুধ	মাছ
প্রোটিন	প্রোটিনের অংশই প্রধান। প্রথম ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন আছে। লাইসিন ও মেথিওনিন আছে।	সামান্য পরিমাণ প্রোটিন আছে।	দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন আছে। লাইসিন ও ট্রিপটোফ্যান ঘাটতি আছে।	অতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন পাওয়া যায়। লাইসিন ও ট্রিপটোফ্যান আছে।	অতি উৎকৃষ্ট ও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন আছে।
কার্বোহাইড্রেট	কার্বোহাইড্রেট নাই।	প্রধান কার্বোহাইড্রেট সেলুলোজ। ইহা কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করে।	প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। ইহার কার্বোহাইড্রেট স্টার্চ।	ইহাতে ল্যাক্টোজকার্বোহাইড্রেট আছে।	কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অতি সামান্য।
স্নেহ পদার্থ	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ মন্দ নয়।	স্নেহ পদার্থ নাই।	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ অতি সামান্য।	স্নেহ পদার্থের পরিমাণ মন্দ নয়।	কোন কোন মাছে স্নেহের পরিমাণ কম। আবার কোন কোন মাছে (ইলিশ মাছ) যথেষ্ট স্নেহ পদার্থ আছে।
ভাইটামিন	ভাইটামিন 'সি' ব্যতীত অন্যান্য সকল ভাইটামিনই ডিমে পাওয়া যায়। ভাইটামিন 'এ', 'বি' ও 'ডি'এর ইহা একটি উৎকৃষ্ট উৎস।	ভাইটামিন 'এ' ইহাতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। শাক-সবজির সবুজ অংশের ক্যারটিন হইতেই দেহে এই ভাইটামিন প্রস্তুত হয়। ভাইটমিন 'বি' ও 'সি' থাকে।	ভাইটামিনের পরিমাণ কম। ঢেঁকি-ছাটা চাউলে 'বি' ভাইটামিন প্রধানতঃ পাওয়া যায়।	ভাইটামিন 'এ' ও 'বি'এর ভাল উৎস। 'সি' ও 'ডি' অল্প পরিমাণে থাকে।	ভাইটামিন 'সি' বাদে অন্যান্য সকল ভাইটামিনই কিছু কিছু আছে। তৈলজাতীয় মাছে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' প্রচুর পরিমাণে থাকে।
ধাতব লবণ	ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহঘটিত লবণ ডিমে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।	ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস, তাম্র ইত্যাদি বিভিন্ন ধাতব লবণ শাক সবজিতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।	লৌহঘটিত ধাতব লবণই ইহাতে অধিক পাওয়া যায়। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদির পরিমাণ সামান্য।	ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ঘটিত লবণ দুধে প্রচুর পরিমাণে এবং অস্থি গঠনের উপযুক্ত অনুপাতেই আছে।	বিভিন্ন প্রকার খনিজ লবণ মাছে পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, আয়োডিন ও খনিজ ঘটিত লবণই প্রধান।

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

A. রন্ধন প্রণালী এবং রান্নাঘরের পরিচ্ছন্নতা

(Cookery and Kitchen Sanitation)

1. **রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং খাদ্যবস্তুর উপর রন্ধনের প্রভাব—খাদ্যমূল্য রক্ষার উপায়** (Methods of cooking and their effects on the nutritive value of foods—measures for the prevention of loss of nutrients.)

রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা

(১) অতি প্রাচীনকালে মানুষ যখন আগুনের ব্যবহার জানিত না, তখন খাদ্য-দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় খাইতে হইত। ক্রমে ক্রমে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আগুন জ্বালাইতে শিখিল। ইহার পর একদিন অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল যে রান্না করিয়া খাদ্য-দ্রব্যকে অধিকতর সুস্বাদু করা যায়। তখনকার দিনে রান্না বলিতে শুধু সেঁকাই (Baking) বুঝাইত। একটি উত্তপ্ত পাথরের উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া তাহা নরম করিয়া লওয়াই ছিল তখনকার দিনের রান্নার পদ্ধতি। তখনও বাসন-কোসনের প্রচলন হয় নাই। সুতরাং আধুনিক যুগের বিভিন্ন ধরনের রান্না তখনকার দিনে সম্ভব ছিল না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ যে কারণে রান্নার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিল আজও অনেক খাদ্য-দ্রব্য ঠিক সেই কারণেই অর্থাৎ অধিকতর সুস্বাদু বা রুচিকর করিবার জন্যই রান্না করা হইয়া থাকে।

(২) এমন অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা কাঁচা অবস্থায় আমাদের খাইবার বাসনা হয় না। রান্না করিবার পর ঐ খাদ্যই আবার উহার বর্ণ ও গন্ধের দ্বারা আমাদের আকৃষ্ট করে। কাঁচা মাছ, মাংস ইত্যাদি খাইবার কথা আমরা চিন্তাও করি না। কিন্তু ঐ মাছ, মাংস যখন বিভিন্ন মশলা দ্বারা রান্না করিয়া পরিবেশন করা হয়; তখন আমাদের খাইবার তীব্র বাসনা জাগে। রান্না করা খাদ্যের গন্ধে বা উহা দর্শন মাত্রই আমাদের মুখে এবং পাকস্থলীতে জারকরসের ক্ষরণ হইতে থাকে। সুতরাং রান্না করা খাদ্যের গন্ধ ও বর্ণ পরোক্ষভাবে আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করে।

(৩) এতদ্ব্যতীত এমন বহু খাদ্য আছে যাহা রান্না না করিলে আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। শস্যকণা বা আলুর শ্বেতসার সাধারণতঃ একটি কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে। কাঁচা অবস্থায় আমাদের লালার মধ্যস্থিত টায়ালিন ঐ শ্বেতসারের উপর কোন ক্রিয়া করে না। রান্না করিলে শস্যকণা বা আলুর শক্ত বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার বাহির হইয়া আসে। এই অবস্থায় টায়ালিন ঐ শ্বেতসার ভাঙিয়া গ্লুকোজ উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য কাঁচা অপেক্ষা রান্না করিয়া খাওয়াই বাঞ্ছনীয়। আবার অনেক প্রোটিন জাতীয় খাদ্যদ্রব্য রান্না করিলে তাহাদের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়। কাঁচা ডাল (pulses) অপেক্ষা সুসিদ্ধ ডাল হইতে আমাদের দেহ অধিকতর প্রোটিন গ্রহণ করিতে পারে। এইজন্য ডাল অতি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাওয়া উচিত। মাংস এবং অনেক তরি-তরকারির তন্তুসমূহ (Fibre) অতিশয় শক্ত থাকে। কাঁচা অবস্থায় পাকস্থলী ঐ সকল তন্তু পরিপাক করিতে পারে না।

রান্নার ফলে ঐ সকল তন্তু নরম হয় এবং খাদ্য পরিপাকে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। সুতরাং রান্না প্রত্যক্ষভাবেও আমাদের পরিপাক ক্রিয়ায় সহায়তা করিয়া থাকে।

(৪) রান্নার অপর উদ্দেশ্য খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করিয়া শরীরকে সুস্থ রাখা। অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় অসংখ্য জীবাণু থাকে। এই সকল জীবাণুর মধ্যে এমন জীবাণুও থাকিতে পারে যাহা দ্বারা আমাদের দেহ সহজেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। দুধ আমাদের একটি প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য। এই দুধ অনেক সময় যক্ষ্মা, টাইফয়েড ইত্যাদি বিভিন্ন রোগজীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হয়। সুতরাং কাঁচা দুধ পান করিলে আমাদের ঐ সকল রোগে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। কাঁচা মাংসের মধ্যেও অনেক সময় কঠিন রোগের জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং উত্তাপের সাহায্যে ঐ সকল রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া তবেই ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করা যাইতে পারে। রান্নার দ্বারা রোগজীবাণু ধ্বংস করিয়া খাদ্যদ্রব্য নির্দোষ করা যাইতে পারে ঃ

রন্ধন প্রক্রিয়া ঃ রান্না করিবার বিভিন্ন পদ্ধতিকে মোটামুটি পাঁচটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে ঃ

(১) ফুটাইয়া সিদ্ধ করা (Boiling)
(২) মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing)
(৩) ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming)
(৪) ঝলসানো বা সেঁকা (Roastlng or Baking)
(৫) ভাজা (Frying)

প্রথম তিনটি প্রক্রিয়া রন্ধনের জলীয় পদ্ধতি (wet cooking) এবং শেষের দুটি শুষ্ক পদ্ধতি (dry method) নামে পরিচিত। জলীয় পদ্ধতিতে খাদ্যের স্বাভাবিক স্বাদ এবং গন্ধ বজায় থাকে। ভাপে সিদ্ধ করা খাদ্যবস্তুর খাদ্যোপাদান সবই প্রায় বজায় থাকে, কয়েকটি ক্ষেত্রে ভাইটামিনে জারিত হয়।

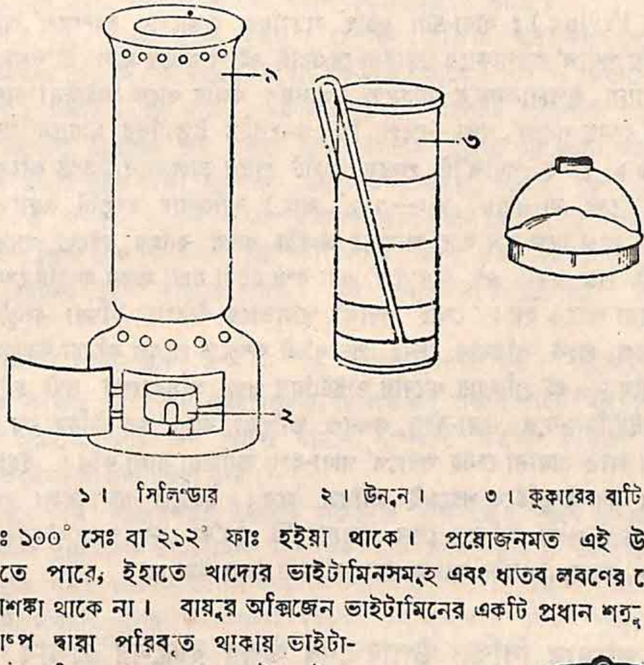
ফুটাইয়া সিদ্ধ করা (Boiling) **ঃ** এই প্রক্রিয়ায় জলের সহিত খাদ্যবস্তু সাধারণতঃ ১০০° সেঃ বা ২১২° ফাঃ উত্তাপে ফুটাইয়া সিদ্ধ করা হয়। ভাত, মাছ, ডাল ইত্যাদি এই পদ্ধতিতেই রান্না করা হইয়া থাকে। ইহার সুবিধা এই যে ফুটন্ত জলের উত্তাপ খাদ্যবস্তুর সর্বত্র সহজেই পেঁছিতে পারে এবং এই উত্তাপ সর্বত্রই প্রায় সমানভাবে পরিচালিত হয়। জলের মাধ্যমে উত্তাপ প্রয়োগ করিবার জন্য খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। তবে এই পদ্ধতিতে রান্না করিলে খাদ্যমূল্য হ্রাস পাইবার আশঙ্কা থাকে। কারণ, ফুটাইবার সময় জলের মধ্যে অনেক খাদ্যোপাদান, দ্রবীভূত ধাতব লবণ, ভাইটামিন 'বি' ও 'সি' এবং কার্বোহাইড্রেট প্রচুর পরিমাণে জলের মধ্যে গলিয়া যায়। সুতরাং রান্নার পর ঐ জল ফেলিয়া দিলে খাদ্যবস্তুর খাদ্যমূল্য কমিয়া যায়। ভাতের মাড় ফেলিয়া দিলে এই জলের সহিত প্রচুর শ্বেতসার, ধাতব লবণ ও ভাইটামিনের অপচয় ঘটে।

মৃদু তাপে সিদ্ধ করা (Stewing) ঃ এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু জলের সহিত ধীরে ধীরে মৃদু তাপে উত্তপ্ত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। জল কখনও ফুটাইতে হয় না এবং জলের উষ্ণতা কখনও ৮২° সেঃ বা ১০০° ফা.-এর উপর বৃদ্ধি করা হয় না

জলের মাধ্যমে উত্তাপ প্রয়োগ করায় খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না। এই প্রক্রিয়ার বড় সুবিধা এই যে খাদ্যবস্তুর প্রোটিন কখনও অত্যধিক কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে না। সুতরাং উক্ত প্রোটিন পরিপাক ক্রিয়ায় কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না।

জলের সহিত উত্তপ্ত করা হয় বলিয়া খাদ্যবস্তুর কার্বোহাইড্রেট, ধাতব লবণ এবং কোন কোন ভাইটামিন ইহাতে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং জল ফেলিয়া দিলে খাদ্যমূল্য হ্রাস পাইবে। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনজাত খাদ্যদ্রব্য এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা কর্তব্য।

ভাপে সিদ্ধ করা (Steaming) ঃ এই প্রক্রিয়ায় জল ফুটাইয়া বাষ্প উৎপন্ন করা হয় এবং সেই বাষ্পের উত্তাপে খাদ্যবস্তু সিদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। বাষ্পের উত্তাপ



১। সিলিন্ডার ২। উনুন। ৩। কুকারের বাটি

সাধারণতঃ ১০০° সেঃ বা ২১২° ফাঃ হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত এই উত্তাপ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে; ইহাতে খাদ্যের ভাইটামিনসমূহ এবং ধাতব লবণের কোন অপচয় হইবার আশঙ্কা থাকে না। বায়ুর অক্সিজেন ভাইটামিনের একটি প্রধান শত্রু। খাদ্যবস্তু সর্বদা বাষ্প দ্বারা পরিবৃত থাকায় ভাইটামিনসমূহ অক্সিজেন দ্বারা নষ্ট হইতে পারে না। এই পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুর 'এক্সট্রাকটিভ'সমূহ পুরাপুরি বজায় থাকে। সুতরাং খাদ্যের স্বাদ এবং গন্ধ নষ্ট হইতে পারে না। ইহাতে খাদ্যবস্তু পুড়িয়া যাইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। অনেক সময় মাছ ভাপে সিদ্ধ করিয়া রান্না করা হয়। ভাপে রাঁধিবার জন্য 'ইকমিক কুকার' ও 'প্রেসার কুকার' ব্যবহার করা হয়।



প্রেসার কুকার

ঝলসানো বা সেঁকা (Roasting or Baking) ঃ এই পদ্ধতিতে আগুন হইতে তাপ সরাসরি খাদ্য-বস্তুতে লাগানো হয়। ঝলসানো প্রক্রিয়ায় একদিক হইতে খাদ্য-বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করা হয়। সেঁকা পদ্ধতিতে একই সময়ে সব দিক হইতে তাপ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। উভয় পদ্ধতিতেই উত্তাপের পরিমাণ কম বেশী করা যায়। ঝলসাইবার বা সেঁকিবার সময় খাদ্যবস্তু হইতে জলীয় বাষ্প ধীরে ধীরে বাষ্পাকারে বাহির হইয়া যায় এবং শক্ত তন্তুসমূহ নরম ও আলগা হইয়া আসে, শ্বেতসার কণিকার শক্ত বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং অভ্যন্তরস্থ শ্বেতসার বাহির হইয়া আসে, খাদ্যবস্তুর ধাতব লবণের কোন অপচয় হয় না। কিন্তু ভাইটামিনসমূহ বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা উচ্চতাপে ধীরে ধীরে নষ্ট হইতে থাকে। সুতরাং ভাইটামিনবহুল খাদ্যদ্রব্য এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা উচিত নয়। প্রোটিন এবং শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যদ্রব্য; যথা,— মাংস, রুটি ইত্যাদি এই প্রক্রিয়ায় রান্না করা হইয়া থাকে।

ভাজা (Frying) ঃ খাদ্য-দ্রব্য হঠাৎ অত্যধিক উত্তাপের সংস্পর্শে আনিয়া উহা হইতে জলীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়াইয়া দেওয়াই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। খাদ্য-দ্রব্যের অন্যান্য উপাদানসমূহ যাহাতে যথাসম্ভব বজায় থাকে সেইজন্য ভাজা কাজটি কোন একটি স্নেহ পদার্থ, যথা—তেল, ঘি, বনস্পতি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হইয়া থাকে। স্নেহ পদার্থটি প্রথমে একটি পাত্রে ভালভাবে উত্তপ্ত করিয়া (১৮০° সেঃ—২০০° সেঃ বা ৩৫৬° ফাঃ—৩৯২° ফাঃ) ভাজিবার বস্তুটি উহাতে ছাড়িয়া দিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদ্ আকারে জলীয় বাষ্প বাহির হইতে থাকে। প্রায় ২-৩ মিনিট পর যখন এই বুদ্‌বুদ্ ওঠা বন্ধ হইয়া যায়, তখন বস্তুটি স্নেহ পদার্থ হইতে উঠাইয়া লইতে হয়। স্নেহ পদার্থ ভালভাবে উত্তপ্ত করিয়া বস্তুটি উহাতে ছাড়িয়া দিলে প্রচুর পরিমাণ স্নেহ পদার্থ ঐ বস্তুতে প্রবেশ করিয়া উহাকে দুষ্পাচ্য করিয়া তুলিবে। এই প্রক্রিয়ায় খাদ্যের ভাইটামিন প্রায় অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ভাইটামিন-যুক্ত খাদ্য-বস্তু কখনও ভাজিয়া রান্না করা উচিত নয়। আমরা অনেক সময় অতি সামান্য স্নেহ পদার্থে খাদ্য-বস্তু ভাজিয়া রান্না করি। ইহাতে বায়ুর অক্সিজেন খাদ্য-বস্তুটিকে সহজেই জারিত করে। ইহাতে খাদ্য-মূল্য হ্রাস পায়। ভাজিবার সময় লক্ষ্য রাখিবে যেন খাদ্যবস্তুটি সর্বদা স্নেহ পদার্থে ডুবিয়া থাকে। মাছ, বেগুন, আলু ইত্যাদি অনেক সময় ভাজিয়া রান্না করা হয়।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের উপর রন্ধনের প্রভাব
(Effect of Cooking on the Nutritive value of food)

আমরা অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই খাইবার পূর্বে রান্না করিয়া থাকি। রান্নার ফলে খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত এবং সুস্বাদু হয়। খাদ্যকে সুস্বাদু এবং নির্দোষ করিতে গিয়া অনেক সময় আমরা উহার খাদ্যমূল্য নষ্ট করিয়া ফেলি। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের উপর রান্নার প্রভাব জানা থাকিলে অনিচ্ছাকৃত এই অপচয় সহজেই বন্ধ করা যায়।

কার্বোহাইড্রেট ঃ চাউল, গম, যব, আলু ইত্যাদি খাদ্যের প্রধান অংশই শ্বেতসার (starch)। এই শ্বেতসার স্বাভাবিক অবস্থায় একটি শক্ত আবরণে আবৃত থাকে। আমাদের দেহের জারক রস (Enzyme) এই শক্ত আবরণটি জীর্ণ করিতে পারে না।

সুতরাং কাঁচা আলু, গম ইত্যাদি খাইলে পাকস্থলীর পক্ষে উহা হজম করা কষ্টকর হয়। রান্নার ফলে বাহিরের এই শক্ত আবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার আবরণমুক্ত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় উহা সহজেই পরিপাক করা যায়। ইহা ছাড়া উত্তাপের ফলে শ্বেতসারের কিছু অংশ সহজপাচ্য ডেক্সট্রিন (dextrin) কার্বোহাইড্রেটে পরিণত হয়। এই কারণেই কাঁচা পাঁউরুটি (bread) অপেক্ষা সেঁকা পাঁউরুটি (toast) হজম করা সহজ। সুতরাং রান্নার ফলে খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট সহজেই জীর্ণ ও পরিপাকযোগ্য হয়।

স্নেহ: তেল, ঘি, দালদা ইত্যাদি স্নেহপদার্থের রান্নার ফলে তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না, খাদ্যমূল্য প্রায় অপরিবর্তিতই থাকে। তবে অত্যধিক উত্তাপে স্নেহ পদার্থ ভাঙিয়া প্রথমে ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। পরে এই গ্লিসারিন হইতে অ্যাক্রোলিন (acroline) নামক একটি বিষাক্ত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। সুতরাং অত্যধিক উত্তাপে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিষাক্ত হইতে পারে।

প্রোটিন: মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিন জাতীয় খাদ্য কাঁচা অপেক্ষা রান্না করিয়া খাইবার রীতিই আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। অল্প উত্তাপে প্রোটিন সঙ্কুচিত হইয়া জমাট বাঁধিয়া যায়। এই অবস্থায় উহা সহজেই পরিপাক হয়। কিন্তু অত্যধিক উত্তাপে প্রোটিন শক্ত হইয়া যায় এবং তখন উহার খাদ্যমূল্য অনেক কমিয়া যায়। এই জন্যই ডিম ভাজা অপেক্ষা অর্ধসিদ্ধ অবস্থায় খাওয়া বেশী উপকারী। আবার কখনও কখনও অধিক উত্তাপের ফলে কোন কোন প্রোটিনের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অল্প সিদ্ধ ডাল (pulses) অপেক্ষা অধিক সিদ্ধ ডাল হইতে শরীর অধিক পরিমাণে প্রোটিন গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই ডাল উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইতে হয়।

ভাইটামিন: ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' জলে দ্রবণীয় নয়। এইজন্য খাদ্যদ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া বা সিদ্ধ জল ফেলিয়া দিলেও এই প্রকার ভাইটামিন নষ্ট হয় না। তবে অধিক উত্তাপে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বায়ুর সংস্পর্শে উত্তপ্ত করিলে এই সকল ভাইটামিন অনেকটাই নষ্ট হইয়া যায়।

ভাইটামিন 'বি' সাধারণতঃ উত্তাপে সামান্যই নষ্ট হয়। তবে খাদ্যদ্রব্যে সোডা মিশ্রিত করিলে প্রায় সমস্ত ভাইটামিন 'বি'-টুকুই নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই ডাল রান্না করিবার সময় কখনও সোডা ব্যবহার করা উচিত নয়। এই জাতীয় ভাইটামিন জলে দ্রবণীয়, সুতরাং রান্না করা খাদ্য হইতে জল ফেলিয়া দিলে ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়।

রান্না করিবার সময় ভাইটামিন 'সি' বাতাসের সংস্পর্শে সহজেই জারিত (oxidised) হইয়া যায়। এইজন্য ভাইটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্যদ্রব্য ঢাকিয়া রান্না করিতে হয়, ইহাতে অপচয় কম হয়। ভাইটামিন 'সি' জলে দ্রবণীয় সুতরাং রান্না করা জল ফেলিয়া দিলে জলের সহিত অনেকটা ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্যে সোডা মিশ্রিত করিলেও এই প্রকার ভাইটামিনের অপচয় ঘটে। বিভিন্ন তরি-তরকারির ভাইটামিন 'সি' রান্নার ফলে শতকরা ১০ হইতে ৬০ ভাগ পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে।

বিভিন্ন ধাতব লবণ: রান্নার ফলে ধাতব লবণের কোন অপচয় হয় না বরং রান্নার ফলে কোন কোন ধাতব লবণের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। লৌহ লবণ রান্নার

ফলে অনেক সময় দেহের পক্ষে অধিকতর গ্রহণোপযোগী হইয়া ওঠে। আবার অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যই জলের মাধ্যমে রান্না করা হয়। রান্নার জল যদি খর জল হয় তবে উহার ক্যালসিয়াম খাদ্যের খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি করে। লবণসমূহ জলে দ্রবণীয়। এইজন্য রান্নার জল ফেলিয়া দিলে প্রায় সমস্ত ধাতব লবণটুকুই নষ্ট হইয়া যায়। অনেক গৃহিণী তরি-তরকারি রাঁধিবার সময় প্রথমে উহা জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জলটুকু ফেলিয়া দিয়া তরকারি রান্না করেন। ইহাতে ঐ তরি-তরকারির ধাতব লবণটুকু প্রায় সমস্তই জলের সহিত বাহির হইয়া যায়।

খাদ্য-মূল্য বজায় রাখিয়া রন্ধনের পদ্ধতি

(Measures of prevention of loss of nutrients)

তোমরা রন্ধনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পড়িয়াছ। রন্ধনের এই সকল প্রক্রিয়াগুলি জানাই কিন্তু যথেষ্ট নয়, কারণ, খাদ্যবস্তুকে সুস্বাদু করিয়া তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক রন্ধনকারীর সম্মুখে থাকে আর একটি সমস্যা—রন্ধনের সময় প্রত্যেকটি খাদ্যবস্তুর যথাসম্ভব খাদ্যমূল্য বজায় রাখা। রন্ধনের ফলে খাদ্যদ্রব্যসমূহের খাদ্যমূল্যের কিছু-না-কিছু অপচয় ঘটিয়া থাকে। তবে কোন্ খাদ্য উপাদান কি কারণে নষ্ট হয়, সেই সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে খাদ্যবস্তুতে উহাদের বজায় রাখিয়া রান্না করা কিছু কঠিন কাজ নয়। এখন দেখা যাউক বিবিধ শ্রেণীর খাদ্যবস্তুগুলি কি উপায়ে রন্ধন করিলে খাদ্যমূল্য বজায় রাখা সম্ভব।

শাকসবজি (Vegetables) : শাকসবজিগুলি প্রধানতঃ নানাবিধ ভাইটামিন ও ও ধাতব লবণে পূর্ণ থাকে। এই জন্যই শাকসবজিকে আমাদের খাদ্যতালিকার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া ধরা হয়। শাকসবজি আবার তিন শ্রেণীর—শাকপাতা (leafy vegetables), আনাজ বা তরকারি (vegetables) এবং কন্দ জাতীয় সবজি (root vegetables)। এই তিন শ্রেণীর শাকসবজিরই প্রধান শত্রু হইল ৪টি : (১) বায়ুস্থিত অক্সিজেন গ্যাস (oxygen), (২) আলো (light), (৩) উত্তাপ (heat) ও (৪) সোডা (soda)।

(১) **অক্সিজেন** (Oxygen) : ভাইটামিন 'এ' এবং ভাইটামিন 'সি' এই দুই ভাইটামিনের প্রধান শত্রু হইল বায়ুর অক্সিজেন গ্যাস। এই দুইটি ভাইটামিন প্রধান শাকসবজিকে অধিকক্ষণ উন্মুক্তস্থানে ফেলিয়া রাখিলে উহাদের খাদ্যমূল্য অনেকখানি কমিয়া যায়। বাজার হইতে কিনিয়া আনিয়া রান্না করিবার সময়ের মধ্যেই শাকসবজির ভাইটামিনের অনেকখানি অপচয় ঘটে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। এইজন্যই রান্না করিবার সময় ভাইটামিন 'এ' ও 'সি' বহুল পরিমাণে নষ্ট হইয়া থাকে।

(১) **আলো** (Light) : ভাইটামিন 'বি' অক্সিজেন দ্বারা নষ্ট হয় না : ইহার প্রধান শত্রু আবার আলো। তাই শাকসবজি অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিলে উহাদের ভাইটামিন 'বি' অংশ বজায় থাকে। অক্সিজেন এবং আলো এই দুইটি আবার শীতল স্থান অপেক্ষা উষ্ণ স্থানে অধিক ক্রিয়াশীল। এইজন্য শীতকালের তুলনায় গ্রীষ্মকালে

শাকসবজির ভাইটামিন দ্রুত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে। আবার উন্মুক্ত স্থানের তুলনায় শাকসবজি সংরক্ষণের পক্ষে রেফ্রিজারেটার অধিক উপযুক্ত। তবে কোন কোন শ্রেণীর ভাইটামিন আবার রেফ্রিজারেটারেও নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্যই শাকসবজি বিশেষতঃ শাকপাতা (leafy vegetables) টাটকা কিনিয়া খাওয়া উচিত। কন্দ জাতীয় সবজি অবশ্য কয়েক দিন ঘরে ফেলিয়া রাখা চলে।

অক্সিজেন এবং আলোর সংস্রব হইতে খাদ্যবস্তুকে দূরে রাখিতে হইলে নিম্নলিখিত সাবধানতা অবলম্বন করিবে ঃ (১) বাজার হইতে শাকসবজি কিনিয়া আনিয়া অধিকক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না। (২) রন্ধনের অব্যবহিত পূর্বে তরকারি কাটিয়া ফেলিয়া রাখিবে না। গোটা-তরকারির তুলনায় কোটা-তরকারির ভাইটামিন আরও দ্রুত নষ্ট হয়। (৩) যতদূর সম্ভব খোসা রাখিয়া কাটিবে। খোসার আবরণে অভ্যন্তরস্থ ভাইটামিন অক্সিজেন ও আলোর হাত হইতে রক্ষা পায়। তরকারি বড় করিয়া কাটিলেও এই উদ্দেশ্য কিছু পরিমাণে সফল হয়। (৪) শাকসবজি সর্বদা ঢাকিয়া রান্না করিবে। (৫) রন্ধনের সময় অনাবশ্যক তরকারি নাড়াচাড়া করিবে না। এইরূপ নাড়াচাড়ায় খাদ্যদ্রব্য অধিক পরিমাণে অক্সিজেন এবং আলোর সংস্পর্শে আসে।

(৩) **উত্তাপ (Heat) ঃ** উত্তাপই ভাইটামিনসমূহের সর্বাপেক্ষা বড় শত্রু। ভাইটামিন 'সি'র প্রধান শত্রু হইল উত্তাপ। রন্ধনের ফলে খাদ্যবস্তুর ভাইটামিন 'সি' নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য টমেটো, গাজর ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি'-প্রধান খাদ্যগুলি কাঁচা খাইতে পারিলেই ভাল হয়।

কতক্ষণ সময় এবং কতটা উত্তাপে খাদ্যবস্তু রান্না হইতেছে তাহার উপর খাদ্যের ভাইটামিন সংরক্ষণ নির্ভর করে। অবশ্য রন্ধনের সময় এবং তাপমাত্রা খাদ্যবস্তুর প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে একই সবজিকে বেশী উত্তাপের সাহায্যে কম সময়ের মধ্যে রান্না করিলে কিংবা কম তাপে বেশী সময় ধরিয়া রান্না করিলে উভয়ের খাদ্যমূল্যের কোন তারতম্য হয় না। মোটের উপর শাকসবজি রান্নার ক্ষেত্রে যে কোন প্রক্রিয়াই অবলম্বন কর না কেন, তরকারি সুসিদ্ধ হইয়া গেলেই নামাইয়া ফেলিবে এবং গরম গরম পরিবেশনের চেষ্টা করিবে। বার বার গরম করিলেও সবজির খাদ্যমূল্য কমিয়া যায়।

(৪) **সোডা (Soda) বা ক্ষারদ্রব্য ঃ** ক্ষারদ্রব্যের সংস্পর্শে আসিলে ভাইটামিন 'বি' সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। ডাল সিদ্ধ না হইলে ডালে অনেকে একটু সোডা দিয়া থাকেন। ইহাতে ডাল সুসিদ্ধ হয় বটে কিন্তু খাদ্যের ভাইটামিনের অংশ একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

বিভিন্ন ভাইটামিনের মধ্যে ভাইটামিন 'এ', 'ডি', 'ই' এবং 'কে' ব্যতীত অবশিষ্ট সকল ভাইটামিন এবং খনিজ লবণসমূহই জলে দ্রবণীয়। সুতরাং তরিতরকারি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ সকল ভাইটামিন ও খনিজ লবণ জলে দ্রবীভূত হয়। উহাদের অপচয় নিবারণ করিতে হইলে তরকারি কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিতে নাই।

রান্না করিবার সময় ভাইটামিনসমূহের অপচয় কিছুটা হইবেই, তবে অপচয়ের কারণ জানা থাকিলে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এই অপচয়ের পরিমাণ কমানো যাইতে পারে। উপরোক্ত কারণসমূহ ছাড়া খাদ্যের এনজাইমের (Enzyme) সাহায্যে

খাদ্যদ্রব্যের ভাইটামিনসমূহ নষ্ট হইতে পারে। সুতরাং রান্না করিবার সময় প্রথমেই এনজাইমসমূহ নষ্ট করিয়া দিলে অপচয় কম হইবে। উচ্চতাপে এনজাইমসমূহ দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নতাপে ইহা সহজে নষ্ট হয় না, বরং অনেক সময় ইহাদের কাজ দ্রুততর হয়। এইজন্যই তরি-তরকারি ঠাণ্ডা জলে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত না করিয়া প্রথম হইতেই ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিতে হয়। এই কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হয় যদি তরি-তরকারিগুলি উত্তপ্ত তেলে তাড়াতাড়ি ভাজিয়া লওয়া হয়। ফুটন্ত তেলের উচ্চতাপে এনজাইমসমূহ দ্রুত নষ্ট হইয়া যায়। **এইজন্যই রান্না করিবার পূর্বে তরি-তরকারিসমূহ ভাজিয়া লইবার রীতি প্রচলিত আছে।**

শাকসবজি রন্ধনের মূলনীতিগুলি সংক্ষেপে এই ঃ

(১) সমস্ত রকম শাকসবজি প্রথমেই জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া লইবে। কাটিবার পর আর ধুইবে না।

(২) রন্ধনের অব্যবহিত পূর্বে তরকারি কাটিয়া লইবে এবং যতদূর সম্ভব খোসা রাখিয়া কাটিবে।

(৩) সবজিগুলি যথাসম্ভব বড় করিয়া কাটিবে।

(৪) কাটিবার পরে জলে ভিজাইলে ঐ জল ফেলিবে না।

(৫) খুব কম জল দিয়া রান্না করিবে।

(৬) জল ফুটিয়া উঠিলে সবজিগুলি জলে ছাড়িবে। ইহাতে সবজির জারক-দ্রব্যসমূহ (Enzymes) তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যাইবে এবং ভাইটামিনের অপচয় কম হইবে।

(৭) পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাঁধিবে।

(৮) বেশীক্ষণ ধরিয়া সবজি সিদ্ধ করিবে না কিংবা রন্ধনের সময় বার বার হাতা দিয়া নাড়াচাড়া করিবে না।

(৯) রন্ধনে সোডা ব্যবহার করিবে না।

(১০) গরম থাকিতে বায়ুতে মুক্ত অবস্থায় রাখিবে না।

মাংস ঃ মাংসের প্রধান উপাদান প্রোটিন। এই প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান-সমূহের অপচয় না করিয়া ইহাকে সহজপাচ্য এবং সুস্বাদু করিয়া তোলাই মাংস রান্নার প্রধান উদ্দেশ্য। মাংস রান্না করিবার সময় নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে ঃ—

(১) প্রোটিন যেন উত্তাপের ফলে অত্যধিক কঠিন হইয়া হজম ক্রিয়ার ব্যাঘাত না ঘটায়।

(২) প্রোটিন, ভাইটামিন এবং খনিজ লবণসমূহের যেন অযথা অপচয় না হয়।

(৩) মাংসের রক্তে লাল অংশটি অর্থাৎ রক্তকণিকা (Haemoglobin) যেন সম্পূর্ণ রূপে নষ্ট হইয়া যায়।

(৪) মাংসের স্বাভাবিক সুন্দর গন্ধ ও স্বাদটি যেন বজায় থাকে।

অত্যধিক উত্তাপে মাংসের প্রোটিন অত্যন্ত কঠিন ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এই কঠিন মাংস অতিশয় দুষ্পাচ্য। সুতরাং যথাসম্ভব অল্প তাপে মাংস রান্না করাই

উৎকৃষ্ট পন্থা। সাধারণতঃ ৮০° সেঃ বা ১৮০° ফাঃ উত্তাপে ধীরে ধীরে মাংস সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাতে মাংসের শক্ত তন্তুসমূহ নরম হইয়া আসিবে এবং প্রোটিন অত্যধিক কঠিন এবং সংকুচিত হইবে না। রক্তকণিকাও এই তাপেই ভাঙিয়া যাইবে। মাংসে অত্যধিক জল ব্যবহার করা উচিত নয়। মাংসের সুন্দর স্বাভাবিক গন্ধটি আসে উহার 'এক্সট্রাক্টিভ' (extractives) এবং খনিজ লবণের জন্য। এই সকল 'এক্সট্রাক্টিভ্' এবং খনিজ লবণসমূহ জলে গলিয়া যায়। মাংসের জল ফেলিয়া দিলে ঐ সকল উপাদানসমূহও নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং পরিমাণমত জল ব্যবহার করিয়া মাংস সিদ্ধ করিতে হয়। মাংসে যে সকল ভাইটামিন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে ভাইটামিন 'বি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অত্যধিক উত্তাপ প্রয়োগ করিলে এই ভাইটামিনও নষ্ট হইবার আশংকা থাকে। 'এক্সট্রাক্টিভ্' এবং ভাইটামিনসমূহ রক্ষা করিবার জন্য রান্না করিবার সময় মাংস ঢাকিয়া দিতে হয়। মাংসের টুকরাগুলি বড় বড় হইলে অপচয়ও কম হয়। কখনও কখনও মাংস ঝলসাইয়া বা সেঁকিয়া রান্না করা হয়। তবে মৃদু তাপে সিদ্ধ করাই মাংস রান্নার আদর্শ পদ্ধতি। মাংস রান্নার মূল কথাগুলি হইতেছে ঃ

(১) দোকান হইতে আনিয়া বেশীক্ষণ ফেলিয়া রাখিবে না। ইহাতে নানাপ্রকার রোগজীবাণুর সৃষ্টি হইতে পারে।

(২) মাংসের টুকরাগুলি যথাসম্ভব বড় বড় করিয়া কাটিবে।

(৩) মাংসে পরিমাণ মত জল ব্যবহার করিবে এবং কখনও মাংসের জল ফেলিয়া দিবে না।

(৪) অল্প তাপে মাংস সিদ্ধ করিবে।

(৫) রান্না করিবার সময় পাত্রের মুখ ঢাকিয়া দিবে।

মাছ ঃ মাছ রান্নার প্রণালী মাংস রান্নার অনুরূপ। মাছের তন্তুসমূহ অধিকতর নরম বলিয়া মাংস অপেক্ষা কম তাপে এবং অল্প সময়েই মাছ রান্না হইয়া যায়। মাছের 'এক্সট্রাক্টিভ্'সমূহ মাংস অপেক্ষা অতি সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়। সুতরাং অত্যধিক উত্তাপে মাছ রান্না করা উচিত নয়।

আমরা অনেক সময়ই মাছ ভাজিয়া রান্না করি। ভাজিয়া রান্না করিবার মূল উদ্দেশ্য হইতেছে হঠাৎ অত্যধিক তাপে ভাজিবার বস্তুর বহিরাবরণ হইতে জল বাষ্পীভূত করিয়া দেওয়া। সুতরাং মাছ ভাজিবার সময় উহা যেন স্নেহ পদার্থে ডুবিয়া থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথায় মাছের অন্যান্য উপাদান-সমূহেরও যথেষ্ট অপচয় ঘটিবে। ভাজিবার মূল উদ্দেশ্যটি জানা না থাকায় আমাদের মধ্যে অনেকেই ভাজিবার বস্তুটির খাদ্যমূল্য নষ্ট করিয়া ফেলে।

ডিম ঃ ডিম বিভিন্ন প্রকারে রান্না করা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে মৃদু তাপে সিদ্ধ করিয়া রান্না করাই উৎকৃষ্ট প্রণালী। ডিমের মধ্যে যে সাদা অংশটি দেখা যায় ইহা এক প্রকারের প্রোটিন। এই প্রোটিন অত্যধিক উত্তাপে কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই সাদা অংশটি যখন জেলীর ন্যায় থকথকে হয়, তখনই ইহা শরীরের বেশী উপকারে আসে। সাধারণতঃ ৮০° সেঃ

(১৭৫° ফাঃ) উষ্ণ জলে ১০-১৫ মিনিট ভিজাইয়া রাখিলেই ডিমের সাদা অংশটি জেলীর ন্যায় হইয়া পড়ে। ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিলে দুষ্পাচ্য হইবে।

অনেক সময় ডিম ফেটাইয়া ডিমের 'ওমলেট' ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়। এই সময় ইহা উত্তমরূপে ঢাকিয়া দেওয়া উচিত যেন আলোর সংস্পর্শে আসিতে না পারে। আলোর প্রভাবে ডিমের ভাইটামিন 'বি' নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে।

বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য ঃ আমরা চাল, ডাল, গম, যব, ভুট্টা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যশস্য প্রত্যহ প্রধান আহার্যরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে ডাল ব্যতীত অবশিষ্ট অধিকাংশই শ্বেতসারপ্রধান খাদ্য। এই সকল শ্বেতসার কণিকার বহিরাবরণ একটি সেল্যুলোজের কঠিন আবরণে ঢাকা থাকে, আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ জারক রস (Enzyme) সেল্যুলোজের এই কঠিন আবরণটি ভেদ করিতে পারে না। এইজন্যই এই সকল খাদ্যদ্রব্য রান্না করা প্রয়োজন। রান্নার উত্তাপে বহিরাবরণটি ফাটিয়া যায় এবং শ্বেতসার কণিকা বাহির হইয়া জলের সহিত জেলীর ন্যায় মণ্ড প্রস্তুত করে। পাকস্থলী এই জেলী সহজেই পরিপাক করিতে পারে। শ্বেতসার ছাড়াও এই সকল খাদ্যশস্যে কিছু কিছু ভাইটামিন এবং খনিজ লবণ পাওয়া যায় এবং ইহারা অতি সহজেই জলে গলিয়া যায়। সুতরাং খাদ্যশস্য যে-জলে রান্না করা হয় সেই জল ফেলিয়া দিলে প্রচুর ভাইটামিন, খনিজ লবণ এবং শ্বেতসারও ঐ সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়। **এই জন্যই রান্না করিবার সময় ভাতের মাড় ফেলিতে নাই।** জলে সিদ্ধ করা ছাড়াও এই সকল খাদ্যশস্য অনেক সময় ঝলসাইয়া বা সেঁকিয়া সিদ্ধ করা হয়। ইহাতে খাদ্যমূল্যের অপচয় কম হয়।

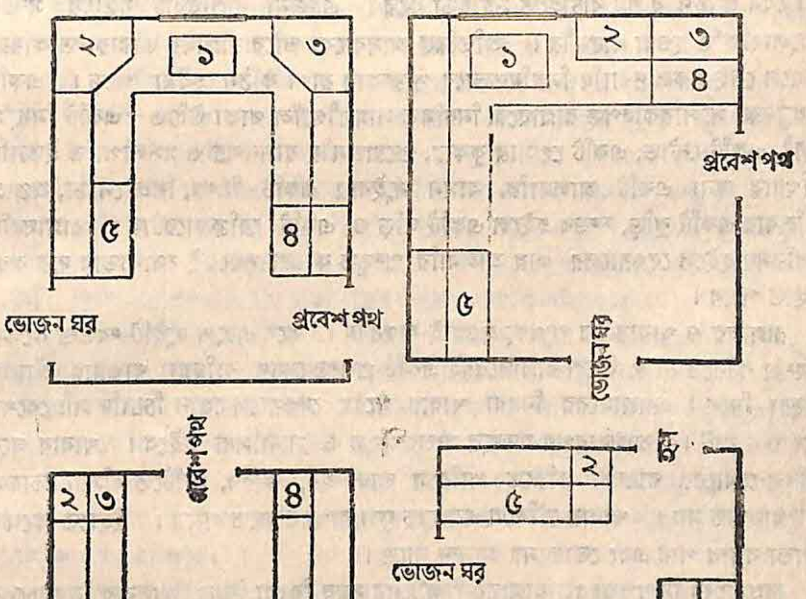
ডাল অতি উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তবেই খাওয়া উচিত। জলের সহিত ফুটাইলে ডালের খাদ্যমূল্যের বিশেষ কিছু অপচয় হয় না, বরং প্রোটিনসমূহ উত্তাপের ফলে সহজপাচ্য হয়। দেখা গিয়াছে যে অল্প সিদ্ধ ডাল অপেক্ষা সুসিদ্ধ ডালের প্রোটিন দেহ অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। অল্প ব্যয়ে ডাল প্রোটিনের একটি উৎকৃষ্ট উৎস। প্রোটিন ছাড়াও ডালে যথেষ্ট ভাইটামিন 'বি' থাকে। এই ভাইটামিন যাহাতে রান্নার প্রভাবে নষ্ট হইয়া না যায় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ডাল সুসিদ্ধ করিবার জন্য অনেকে ডালে একটু সোডা ফেলিয়া দেন। ইহাতে ডালের ভাইটামিন নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ডাল রাঁধিবার সময় উহাতে সোডা ব্যবহার করিবে না।

2. আদর্শ রান্নাঘরের পরিকল্পনা
(Planning of an ideal kitchen)

রান্নাঘর

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে বাসগৃহের সমস্যা এক উৎকট আকার ধারণ করিয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় এবং জনসাধারণের উদ্যমে অবশ্য ইতিমধ্যে গৃহসংকট নিবারণের কাজ শুরু হইয়া গিয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় রান্নাঘরটি আমাদের দেশে আজও সম্পূর্ণ অবহেলিত থাকিয়া যাইতেছে। সাধারণের কথা ছাড়িয়া দিলেও দেখি অনেক সঙ্গতিপন্ন পরিবারেও রান্নাঘর নির্মাণের সময় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। এই সকল গৃহের শয়নকক্ষ ও অন্যান্য কক্ষগুলি হয়ত খুব স্বাস্থ্যকর এবং রুচি অনুযায়ী সজ্জিত কিন্তু রান্নাঘরটি আলোকবাতাসহীন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের

মধ্যে নির্মিত। বস্তুতঃ ইহার চেয়ে অব্যবস্থা আর কল্পনা করা যায় না। দুইটি কারণে রান্নাঘরের সংস্কার সাধন হওয়া একান্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ, মেয়েদের স্বাস্থ্যের কারণে। আমাদের দেশের মেয়েরা দিনের অধিকাংশ সময় রান্নাঘরেই অতিবাহিত করে। সেখানে বসিয়া তাহারা বাটনা বাটে, তরকারি কোটে এবং খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে। স্বভাবতঃই মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে রান্নাঘরের পরিবেশটি সুস্থ এবং সুন্দর হওয়া চাই। দ্বিতীয় কারণটি হইল খাদ্যবস্তুর পরিচ্ছন্নতা ও উৎকৃষ্টতা বজায় রাখা। খাদ্যদ্রব্য যে স্বাস্থ্যতত্ত্বে কি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছে, তাহা তোমরা সকলেই অবগত আছ। রন্ধনের স্থানটি পরিচ্ছন্ন না হইলে খাদ্যবস্তুসমূহ সহজে রোগের জীবাণু দ্বারা পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। স্বল্পালোকযুক্ত স্থানে পোকামাকড় বা



১। সিঙ্ক, ২, ৩। আলমারি, ৪। রেফ্রিজারেটার, ৫। উনুন।

নোংরা চুল ইত্যাদি পড়িয়া খাদ্যদ্রব্য নষ্ট করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত রান্নাঘরটি মনোরম ও আলোবাতাসযুক্ত না হইলে রন্ধনকারীরও কাজে স্ফূর্তি ও ইচ্ছা দেখা দিবে না। স্বভাবতঃই সে স্বল্প সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করিয়া কোন রকমে সেই স্থান হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিবে।

রান্নাঘরের আকৃতি ঃ একটি সর্পরিকল্পিত রন্ধনগৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা যতখানি প্রয়োজনীয় উহার অবস্থিতি, নক্শা ও গঠন তাহার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। গৃহনির্মাণের সময় রান্নাঘরে যাহাতে যথেষ্ট বায়ু সঞ্চালন, সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে সেদিকে নজর রাখিবে। কক্ষের আকৃতি ও গঠন সম্বন্ধে কোন নিয়ম অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই। রান্নাঘরটি নানা আকারের হইতে পারে—চতুষ্কোণ, U আকৃতি অথবা L আকৃতি। সব রকম আকারের রান্নাঘরই গৃহিণীর নিপুণতার গুণে সুন্দর হইয়া উঠে। মোটের উপর রান্নাঘরটি প্রথমেই স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, তারপর গৃহকর্তার অর্থানুকূল্য অনুসারে উহার গঠন ও সাজসজ্জার ব্যবস্থা করিবে।

সাজসরঞ্জাম ঃ রান্নাঘরের তৈজসপত্র নির্বাচনের সময় সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য রাখিবে উহা যেন গৃহিণীর শ্রম বাঁচাইতে সহায়তা করে। এইজন্য রান্নাঘরটি যতদূর সম্ভব বাহুল্যবর্জিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত আসবাবের ভারে রান্নাঘর ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিলে সেই সকল দ্রব্যাদি নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। একটি আধুনিক সুপরিকল্পিত রান্নাঘরে নিয়মিত সামগ্রীগুলি থাকা উচিত—একটি নির্ধূম চুল্লী, একটি স্টোভ, একটি প্রেসার কুকার, প্রয়োজনীয় বাসনপত্র ও মসলাপাতি ইত্যাদি রাখিবার জন্য একটি আলমারি, বাসন ধুইবার একটি সিঙ্ক, শিল নোড়া, জঞ্জাল ফেলিবার একটি ঝুড়ি, সম্ভব হইলে একটি ঘড়ি ও একটি রেফ্রিজারেটার। রান্নাঘরটি অপরিসর হইলে দেওয়ালের গায় আলমারি প্রস্তুত করিয়া সহজেই স্থানাভাব দূর করা যাইতে পারে।

রান্নাঘর ও খাবার ঘর পৃথক্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবে এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে রান্নাঘরেরই একটি প্রশস্ত কোণ বাছিয়া খাওয়ার জায়গা করিয়া দিবে। রান্নাঘরের কিংবা খাবার ঘরের দেওয়ালে কোন চিত্রাদি সন্নিবেশের প্রয়োজন নাই। আসবাবপত্র যতদূর সম্ভব সরল ও সাদাসিধা হইবে। খাবার ঘরে টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ, মাটিতে বসিয়া ভোজন স্বাস্থ্যসম্মত নয়। খাবার টেবিলে একগুচ্ছ ফুল রাখা চলিতে পারে। ইহাতে কক্ষের শোভা বৃদ্ধি পায় এবং ভোজনের আনন্দ বাড়ে।

রান্নাঘরের নিরাপত্তা ঃ রান্নাঘর নির্মাণের সময় কিংবা উহার আসবাব নির্বাচনের সময় সর্বদাই বাড়ির লোকদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিয়া লইতে হয়, কারণ, গৃহের অধিকাংশ দুর্ঘটনাই ঘটে রান্নাঘরে। সাধারণতঃ আগুন লাগিয়া, উত্তপ্ত তরল পদার্থ, যথা—দুধ, ডাল, চা, ভাতের মাড় ইত্যাদিতে পুড়িয়া গিয়া, কোন ধারাল অস্ত্রে কাটিয়া গিয়া, কিংবা ঘরের মেঝেতে পিছলাইয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। দুর্ঘটনার কারণগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল ঃ

(১) **অগ্নিকাণ্ড ঃ** রান্নাঘরের দুর্ঘটনার প্রধান কারণই হইল অগ্নিকাণ্ড। পল্লীগ্রামের কাঁচা খড়ের পল্লীগুলিতে সর্বাধিক অগ্নিকাণ্ড ঘটিতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামের রান্নাঘরগুলি সাধারণতঃ খুব নীচু থাকে এবং কাঠের আগুনে রান্না করা হয়। পল্লীগৃহের সহজদাহ্য খড়নির্মিত চালাগুলিতে সহজেই কাঠের আগুন লাগিয়া অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত রান্নাঘরে সচরাচর লম্ফ ব্যবহার করা হয়। সামান্য অসাবধানতাতে ঐ লম্ফের শিখা হইতে ঘরে আগুন লাগিয়া যাইতে পারে।

এই সকল ক্ষেত্রে রান্নাঘরটি একটু উঁচু করিয়া নির্মাণ করা এবং সতর্কতার সঙ্গে আগুনের ব্যবহার করা ব্যতীত আর কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

পাকা বাড়ীতে অগ্নিকাণ্ডের ভয় অপেক্ষাকৃত কম। তবে গৃহে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা থাকিলে উহা ব্যবহারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ বাড়িতে হিটার ব্যবহার করিলে সর্বদাই সুইচের ব্যবস্থা করিবে। প্লাগের সাহায্যে হিটার জ্বালাইতে গিয়া অনেক সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়।

কখনও কখনও অসাবধানতাবশতঃ ভাতের মাড়, গরম জল, ফুটন্ত ডাল কিংবা দুধ পড়িয়া গিয়া দেহের কোন অংশ পুড়িয়া যাইতে পারে। এইক্ষেত্রে গরম বস্তু নাড়াচাড়া করিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। শুধু গৃহিণীরাই নহে, শিশুরাও এইরূপ দুর্ঘটনার কবলে পড়িয়া থাকে। সুতরাং গরম বস্তু মাটিতে যেখানে সেখানে না রাখিয়া সর্বদাই শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখিবে।

(২) **কর্তনজনিত দুর্ঘটনা ঃ** রান্নাঘরে দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হইল কাটা। দা, বঁটি ইত্যাদি ধারাল অস্ত্র সর্বদাই রান্নাঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। দুর্ঘটনার কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই সকল জিনিসগুলি যেখানে সেখানে ফেলিয়া রাখিবে না এবং শিশুদের নাগালের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবে। ধারাল বস্তু ব্যতীত অনেক সময় ভাঙা তৈজসপত্র দ্বারাও দেহের কোন অংশ কাটিয়া বা ছড়িয়া যাইতে পারে। ভাঙা বাসনকোসন বা ধারাল টিন, কৌটা, শিশি, বোতল ইত্যাদি রান্নাঘরের কাজে ব্যবহার করিবে না।

(৩) **পতনজনিত দুর্ঘটনা ঃ** রান্নাঘরে অনেক সময় পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে। তরকারির খোসা, মাছের আঁশ, ভাতের মাড় ইত্যাদি মেঝেতে পড়িয়া থাকিলেই সাধারণতঃ এই পতনজনিত দুর্ঘটনা ঘটে। এই সকল ক্ষেত্রে গৃহিণী সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করিলেই দুর্ঘটনা নিবারণ করিতে পারেন।

রান্নাঘরের মেঝে অতিরিক্ত পিচ্ছিল হইলেও দুর্ঘটনা ঘটা বিচিত্র নয়। এইজন্য রান্নাঘর নির্মাণের সময় মেঝে যাহাতে অত্যন্ত পিচ্ছিল উপাদানে নির্মিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

রান্নাঘরের বাসনপত্র ঃ রান্নাঘরের কাজে আমরা নানারূপ ধাতব পদার্থ—কাচ, মাটি ও পাথরের বাসন ব্যবহার করিয়া থাকি।

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি (Methods of Food Preservation)

খাদ্যমূল্য বজায় রাখিয়া উহাকে সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চয় করাকেই বলে খাদ্য-সংরক্ষণ। শস্য মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল বলিয়া বহুদিন পর্যন্ত কেবল শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ফলমূল শাকসবজি কিংবা মাছ মাংস পাত্রে পুরিয়া সংরক্ষণের পদ্ধতি চালু হইল।

সংরক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ ভবিষ্যতের খাদ্যাভাব মিটাইবার জন্যই প্রথমে খাদ্যসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতি বৎসরে কিংবা প্রতি দেশে প্রকৃতির দান একরূপ নয়। সুসময়ের উদ্বৃত্ত খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিলে তাহা দ্বারা অজন্মার দিনের খাদ্যাভাবক্লিষ্ট দেশগুলির খাদ্যাভাব সহজেই মিটান যায়। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক ঋতুর নিজস্ব ফলমূল দামেও সস্তা থাকে। সুলভে কিনিয়া রাখিলে পরে যখন উহা

আর পাওয়া যায় না তখন গৃহিণীরা স্বল্প ব্যয়ে আহার্য তালিকায় সহজেই বেশ নূতনত্ব আনিতে পারেন।

খাদ্য সংরক্ষণের অন্যতম মুখ্য উদ্দেশ্য হইল ঃ

(১) ব্যাধি সৃষ্টিকারী জীবাণুদের হাত হইতে খাদ্যকে রক্ষা করা ;

(২) রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রতিষেধ করা ;

(৩) সংরক্ষিত খাদ্যের রঙ্, স্বাদ ও গন্ধ অবিকৃত রাখিয়া খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা।

খাদ্য কি কি উপায়ে নষ্ট হয় ঃ অধিকাংশ খাদ্যবস্তুই কোন না কোন জীবাণুদ্বারা নষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ ঈস্ট (East), ছত্রাক (mould) এবং জীবাণুদ্বারা (bacteria) খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হইয়া থাকে।

কোন গাঁজান ফলের রসে যে চকের গুঁড়ার মত সাদা কিংবা ধূসর বর্ণের তলানি পড়িয়া থাকে উহাই ঈস্ট। ঈস্টের বৃদ্ধির জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য প্রয়োজন।

ছত্রাক এক জাতীয় ফাঙাস। ইহা খাদ্যবস্তুর স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ নষ্ট করিয়া শেষ পর্যন্ত পচাইতে শুরু করে। জীবাণুগুলি আরও মারাত্মক। উহারা খাদ্য পচায় এবং কখনো আবার বিষ (Toxin) ঢালিয়া দিয়া মানুষের প্রাণনাশ পর্যন্ত করিতে পারে। স্ট্যাফাইলোকক্কাস নামক জীবাণুর বিষ নিঃসরণের ক্ষমতা আছে। উপযুক্ত তাপ যেমন ৫০°—১২০° ফাঃ উত্তাপে জীবাণুরা দ্রুত বংশবিস্তার করিতে পারে। তাপ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে উহাদের বংশবৃদ্ধি স্থগিত থাকে, হিমাঙ্কে একেবারে স্তব্ধ হইয়া যায়। তবে কতগুলি জীবাণু আছে যাহাদের উচ্চ তাপ সহিবার ক্ষমতা আছে। এমন কি কয়েক ঘণ্টা জলে ফুটাইলেও উহারা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ক্লসট্রিডিয়াম বটুলিয়াম এই শ্রেণীর অন্তর্গত। উহাদের বিষ মারাত্মক।

(২) রাসায়নিক পরিবর্তন—আলো, বাতাস, উত্তাপ এবং জলীয় বাষ্পের প্রভাবে খাদ্যের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। এনজাইমের দ্বারা রাসায়নিক পরিবর্তন দ্রুততর হয়। অ্যাসিডগুলি ভাঙিয়া পচে এবং ঘি মাখন কটু গন্ধযুক্ত ও বিস্বাদ হয়। সূর্যালোকের সংস্পর্শেও কিছু কিছু খাদ্যপ্রাণের অপচয় ঘটে।

খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি (Method of Food Preservation) ঃ বাঁচিয়া থাকার জন্য ঈস্ট, ছত্রাক এবং জীবাণুদের চাই উত্তাপ, বায়ু এবং আর্দ্রতা। সুতরাং খাদ্য হইতে উহাদের অপসারণ করিতে পারিলে খাদ্যসংরক্ষণ সম্ভব হয়। খাদ্য সংরক্ষণের মূল প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ—

(১) উত্তাপ বাড়াইয়া বা কমাইয়া,

(২) জল নিষ্কাশন বা শুষ্ককরণের দ্বারা,

(৩) রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে।

তাপ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে (ক) রন্ধন, (খ) শীতল কক্ষে এবং হিম ঘরে খাদ্য-সংরক্ষণ, (গ) পাস্তুরাইজেশন, (ঘ) টিন ও শিশি বোতলে খাদ্যসংরক্ষণ—উহা canning এবং Bottling method বলিয়া পরিচিত।

রন্ধন—২১২° ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপে খাদ্যবস্তু ফোটাইলে খাদ্যের অভ্যন্তরে তাপ ঢুকিয়া জীবাণুগুলি ধ্বংস করে, অবশ্য উচ্চ তাপসহ জীবাণুগুলি ইহাতে মরে না। মৃদু আঁচে রান্না করা খাদ্যের সব জীবাণু ধ্বংস হয় না। তাই খাদ্যবস্তু খুব ভাল করিয়া ধুইয়া রান্না করা উচিত।

হিমঘরে খাদ্য সংরক্ষণ—জীবাণুদের বৃদ্ধি স্তিমিত করার জন্য এবং এনজাইমগুলি সক্রিয় থাকিবার জন্য একটি নির্দিষ্ট উত্তাপ প্রয়োজন। কোন নিরুত্তাপ শীতল কক্ষে বা হিমঘরে রাখিয়া দিলে জীবাণুগুলি স্তিমিত হইয়া আসে এবং এনজাইমের ক্রিয়া খুব ধীরে ধীরে চলিতে থাকে। একই কারণে খাদ্যবস্তুতে বরফ দিয়া রাখিলেও কয়েক দিন পর্যন্ত বেশ টাটকা থাকে।

রেফ্রিজারেটারের দৌলতে গৃহেও মাছ মাংস কয়েকদিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা খুব সহজ হইয়াছে।

দুগ্ধ সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি :

দুধ সংরক্ষণ (Preservation of milk) : সকল প্রকার দুধেই অসংখ্য জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা অবস্থায় এই জীবাণুর সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই জীবাণুর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবার শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে এই বৃদ্ধি আরও দ্রুততর হয়। এই জন্যই গ্রীষ্মকালে দুধে তাড়াতাড়ি নষ্ট হইয়া যায়। জীবাণুসমূহ দুধে বিভিন্ন প্রকার পদার্থ উৎপন্ন করে। উদাহরণস্বরূপ ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়ার কথাই ধরা যাউক। এই জীবাণু দুধের ল্যাক্টোজ শর্করা (Lactose) হইতে লাকটিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিডে দুধের স্বাভাবিক অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া ইহা দধিতে পরিণত হয়। আবার কোন কোন জীবাণু দুধের মধ্যে বিষাক্ত দ্রব্যাদিও (toxin) উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাতে দুধের বাহ্যিক অবস্থার হয়তো কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এই বিষাক্ত দুধ পান করিলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং (১) দুধে অ্যাসিড উৎপাদন বন্ধ করিয়া উহার স্বাভাবিক অবস্থা অপরিবর্তিত রাখা এবং (২) ইহাতে বিষাক্ত দ্রব্যাদির উৎপাদন বন্ধ করাই দুগ্ধ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত উপায়ে দুগ্ধ সংরক্ষণ করা যাইতে পারে।

(১) **শীতল কক্ষে রাখিয়া :** দুধের মধ্যস্থিত জীবাণুই যে দুধ নষ্ট হইবার প্রধান কারণ তাহা তোমরা উপরে লক্ষ্য করিয়াছ। আবার এই জীবাণু বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত উষ্ণতার প্রয়োজন। অধিকাংশ জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য ৩০°—৪০° সেঃ উষ্ণতা বিশেষ অনুকূল। 0° সেঃ এবং ইহারও কম উষ্ণতায় ইহাদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং অতি মন্থর গতিতে চলিতে থাকে। ফলে ইহাদের কার্যক্ষমতাও কমিয়া যায়। সুতরাং টাট্‌কা দুধ রেফ্রিজারেটার বা ঐ জাতীয় কোন শীতল কক্ষে রাখিয়া অনেক সময় পর্যন্ত ভাল অবস্থায় রাখা যায়।

(২) **ফুটাইয়া :** এই পদ্ধতির মূল কথা হইতেছে দুধের জীবাণুসমূহ তাপের প্রভাবে ধ্বংস করিয়া ফেলা। একটি পরিষ্কার পাত্রে দুধ কিছুক্ষণ ধরিয়া ভালভাবে

ফুটাইতে হয়। ইহাতে অধিকাংশ জীবাণুই ধ্বংস হইয়া যায়। মুখ ভালভাবে বন্ধ করিয়া রাখিলে কিছু সময় পর্যন্ত এই ফুটন্ত দুধ অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে। গৃহে দুধ সংরক্ষণের জন্য সাধারণতঃ এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়া থাকে। তবে উত্তাপের ফলে সকল জীবাণুই ধ্বংস হয় না। যে সকল জীবাণু বাঁচিয়া থাকে তাহারা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং কয়েক ঘণ্টা পরে ইহাদের দ্বারা দুধ নষ্ট হইবার আশঙ্কা থাকে। ফুটন্ত দুধ শীতলকক্ষে রাখিয়া কয়েকদিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়।

(৩) **রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে ঃ** দুধের সহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়াও দুধ সংরক্ষিত করা যায়। যে সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি এই জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের মধ্যে বোরিক অ্যাসিড, বোরাক্স, ফরম্যালিন, হাইড্রোজেন পারক্সাইড, স্যালিসাইলিক অ্যাসিড, বেনজয়িক অ্যাসিড ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সকল দ্রব্যাদি সাধারণতঃ দুইটি নীতিতে কাজ করিয়া থাকে—(ক) কিছু সংখ্যক জীবাণু ধ্বংস করে এবং অবশিষ্ট জীবাণুর বৃদ্ধি ব্যাহত করে ; (খ) জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন অ্যাসিড প্রশমিত করিয়া দুধ, দধি বা ছানায় পরিণত হওয়া বন্ধ করে।

বোরিক অ্যাসিড এবং বোরাক্স-এর মিশ্রণ 'Preservitas', 'glacialine' ইত্যাদি নামে বাজারে পাওয়া যায়। এই সকল মিশ্রণে শতকরা ১০ হইতে ২০ ভাগ বোরাক্স এবং ৭০ হইতে ৮০ ভাগ বোরিক অ্যাসিড থাকে। এক হাজার ভাগ দুধে এক ভাগ এই মিশ্রণ দ্রবীভূত করিলে কয়েকদিন পর্যন্ত দুধ অবিকৃত থাকিবে। ফরম্যালিন দুধ সংরক্ষণের অধিকতর উপযোগী। ৬০ ভাগ জলে ৪০ ভাগ ফরম্যালডিহাইড মিশ্রিত করিলে ফরম্যালিন প্রস্তুত হয়। ইহা বাজারে 'Iceline', 'Freezine', 'Steryl' ইত্যাদি নামে কিনিতে পাওয়া যায়। ফরম্যালিন এবং সোডিয়াম নাইট্রাইট-এর মিশ্রণও 'Mystin' নামে এই কাজে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। সোডিয়াম নাইট্রাইটের জন্য দুধের সহিত মিশ্রিত ফরম্যালিন রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না। কুড়ি হাজার ভাগ দুধে এক ভাগ ফরম্যালিন মিশ্রিত করিলে কয়েকদিন পর্যন্ত দুধ ভাল অবস্থায় থাকিবে। এই সামান্য ফরম্যালিন স্বাস্থ্যের পক্ষেও তেমন ক্ষতিকর নয়। সকল রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে হাইড্রোজেন পারক্সাইডই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। দুধের মধ্যে মিশ্রিত হাইড্রোজেন পারক্সাইড ধীরে ধীরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙিয়া জল এবং অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়। সুতরাং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নয়।

রাসায়নিক দ্রব্যাদির সাহায্যে দুধ সংরক্ষণ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। কারণ, মিশ্রিত রাসায়নিক দ্রব্যটি নিজেই বিষাক্ত হইতে পারে (ফরম্যালিন একটি বিষাক্ত দ্রব্য) তাহা ছাড়া পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে এই সকল রাসায়নিক দ্রব্য পরিপাক ক্রিয়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। এই জন্য আজকাল অনেক দেশেই আইনের সাহায্যে দুধের সহিত এই সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদি মিশ্রণ বন্ধ করা হইয়াছে।

পাস্তুরাইজেশন (Pasteurization) ঃ বৈজ্ঞানিক পাস্তুরের পদ্ধতিতে দুগ্ধ সংরক্ষণ করা হইয়া থাকে। ইহাকে **পাস্তুরাইজেশন** বলে। আজকাল প্রায় সকল দেশেই দুধ সংরক্ষণের জন্য এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ফলের রসও এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হয়।

পাস্তুরাইজেসন পদ্ধতির উদ্দেশ্য প্রধানত দুইটি ঃ

(১) দুধের মধ্যে টাইফয়েড, যক্ষ্মা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগজীবাণু ধ্বংস করা এবং

(২) দুধের অধিকাংশ ল্যাকটিক অ্যাসিড (Lactic acid) উৎপাদনকারী জীবাণু বিনাশ করা। উপরোক্ত জীবাণুর ধ্বংস দ্বারা খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ করিয়া উহার পচন ক্রিয়া মন্দীভূত করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে দুধের শতকরা ৯৮ হইতে ৯৯ ভাগ জীবাণুই ধ্বংস হইয়া যায়।

পাস্তুরাইজেসন পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তুকে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কিছুক্ষণের জন্য রাখিয়া রোগজীবাণুসমূহ ধ্বংস করা হয়। উষ্ণতা এবং সময়ের পার্থক্য অনুযায়ী ইহা দুই প্রকারের হইতে পারে।

(১) হোল্ডার পদ্ধতি (Holder Process) ঃ এই পদ্ধতিতে খাদ্য-দ্রব্য ১৪৫° ফাঃ উষ্ণতায় ৩০ মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়।

(২) ফ্ল্যাশ পদ্ধতি (Flash Process) ঃ এই পদ্ধতি অনুযায়ী খাদ্যদ্রব্য অধিক উষ্ণতায় অর্থাৎ ১৬২° ফাঃ উষ্ণতায় ১৫-১৬ মিনিট ধরিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়।

উভয় পদ্ধতিতেই দুধ নির্দোষ হইয়া থাকে। ফ্ল্যাশ পদ্ধতিতে অল্প সময় উত্তাপ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া অধিকতর নিপুণতার প্রয়োজন। সুদক্ষ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে এই পদ্ধতি পরিচালিত না হইলে দুধ সম্পূর্ণ দোষমুক্ত হয় না। অল্প সময় উত্তপ্ত করিতে হয় বলিয়া আজকাল হোল্ডার পদ্ধতি অপেক্ষা ফ্ল্যাশ পদ্ধতিই দ্রুত প্রসার লাভ করিতেছে।

পাস্তুরাইজেসনে দুধের খাদ্যমূল্যের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় না, পরন্তু উহাতে দুধ সম্পূর্ণ নির্দোষ হয়। ভাইটামিন 'এ', 'বি' এবং 'ডি' সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে শুধু ভাইটামিন 'সি'র শতকরা ২০ ভাগ এবং ভাইটামিন 'বি'র ১০ ভাগ নষ্ট হয়। তবে দুধে ভাইটামিন 'বি' এবং 'সি'র পরিমাণ অল্প বলিয়া এই দুই প্রকার ভাইটামিনের অভাব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে পূরণ করা হয়। সুতরাং দুধ পাস্তুরাইজেসন করিয়া ব্যবহার করা স্বাস্থ্যসম্মত।

টিন, শিশি ও কাচের বোতলে পুরিয়া খাদ্য সংরক্ষণ (Canning and Bottling) ঃ টিনের পাত্র (can) কিংবা কাচের শিশিতে (bottle) খাদ্য সংরক্ষণ করার নাম ক্যানিং ও বটলিং। উচ্চ তাপযুক্ত বাষ্পের সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য জীবাণুমুক্ত করিয়া একটি বিশুদ্ধ বদ্ধপাত্রে বায়ু ও জীবাণুর হাত হইতে খাদ্যবস্তু রক্ষা করাই এই পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। জ্যাম, জেলি, আচার ইত্যাদি এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন মাছ, মাংস এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়।

এই পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ের মধ্যে উচ্চ তাপযুক্ত বাষ্প প্রয়োগ করিয়া খাদ্যবস্তু নির্বীজ করিয়া লওয়া হয়। তারপর ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া আধারে পুরিতে হয়। আধারটি পূর্বেই নির্বীজ করিয়া রাখিবে এবং জলের উত্তাপ হইবে ২৭৫°—৩৫০° ফারেনহাইট।

গৃহে প্রেসার কুকারের সাহায্যেও খাদ্যবস্তু নির্বীজ করা যায়। যে আধারে খাদ্য সংরক্ষিত হইবে উহা প্রথমে নির্বীজ করিয়া লইয়া খাদ্যবস্তু রাখিবে। তারপর ঐ

আধারটি প্রেসার কুকারে বসাইয়া কিছুক্ষণ চাপ প্রয়োগ করিবে। প্রেসার কুকারের চাপ বাড়াইয়া প্রয়োজনমত বাষ্পের চাপ বৃদ্ধি করা যায়।

ক্যানিং ও বটলিং পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্য বস্তুর খাদ্যমূল্য ঃ ক্যানিং ও বটলিং পদ্ধতিতে খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন হয় না। ভাইটামিন 'এ'ও সম্পূর্ণ সুরক্ষিত হয় কিন্তু 'বি' ও 'সি' সামান্য নষ্ট হয়।

ক্যানিং পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যবস্তুর ত্রুটি ঃ মাঝে মাঝে এই ধরনের সংরক্ষিত খাদ্যেও ছাতা পড়িতে দেখা যায়। বটুলিজম নামক রোগও এই প্রকারে সংরক্ষিত খাদ্য হইতেই বিস্তার লাভ করে। খাদ্যে টক টক গন্ধ ও গ্যাস সৃষ্টি এবং গলিয়া যাওয়া বটুলিয়াম জীবাণুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। অনেক সময় এই জীবাণুদ্বারা আক্রান্ত হইলেও খাদ্যের গন্ধ এবং আকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না।

কখন কখন সংরক্ষিত খাদ্যবস্তু টক হইয়া যায়। সংরক্ষণের পাত্রটি উত্তমরূপে ফুটাইয়া জীবাণুশূন্য করিয়া না লইলে এই ধরনের পচনক্রিয়া দেখা দেয়। পাত্রের মুখ যদি ভালভাবে বন্ধ করা না হয় তবে বাহির হইতে জীবাণু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস উৎপন্ন করিতে পারে।

সংরক্ষণের সময় ঠিকভাবে উত্তাপ প্রয়োগ না করিলে খাদ্যের এনজাইমগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় না এবং খাদ্যের ট্যানিন এনজাইমের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া খাদ্যের রঙ্ পরিবর্তন করিতে পারে। অবশ্য খাদ্যদ্রব্য উহাতে বিষাক্ত হয় না। টিনে সংরক্ষিত খাদ্যে কখনো আবার ধাতব গন্ধ (metallic flavour) পাওয়া যায়। অ্যাসিড জাতীয় খাদ্যদ্রব্য টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করিলে খাদ্যের অ্যাসিড টিনের পাত্র এবং লোহার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া এই সকল গন্ধ উৎপন্ন করে। তবে খাদ্যদ্রব্য তাহাতে বিষাক্ত হয় না।

মোটের উপর শিশি বোতলে খাদ্য সংরক্ষণ করিতে হইলে (১) খাদ্যবস্তু ভাল করিয়া ধুইবে, (২) আধারটি ভালভাবে ফুটাইয়া নির্বীজ করিয়া লইবে, (৩) পাত্রটি বায়ু-নিরোধক হওয়া চাই এবং (৪) বাষ্পের চাপ যেন উপযুক্ত হয়।

(গ) **শুষ্ককরণ (Drying)** পরিপূর্ণ পুষ্টিলাভের পর ফল ও শাকসবজির বৃদ্ধির সকল সম্ভাবনা যখন তিরোহিত হয় তখন অনিবার্য ক্ষয় ও পচনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য প্রকৃতি উহাদের অনেককে শুকাইয়া ফেলে এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের খাদ্য সংগ্রহে সাহায্য করে। মানুষের দুইটি প্রধান খাদ্যদ্রব্য শস্য ও ডাল না শুকাইলে কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি শুষ্ক ফল যেমন খেজুর ও কিশমিশ আমাদের অতি পরিচিত এবং প্রিয় খাদ্য। আর্দ্রতা ব্যতীত জীবাণু বাঁচিতে পারে না বলিয়া খাদ্য উপযুক্ত ভাবে শুকাইতে পারিলে পচে না এবং সামান্য সাবধানতা অবলম্বন করিলে সহজেই কীটপতঙ্গের হাত হইতে রক্ষা করা যায়।

শুষ্ক খাদ্যের গুণ ঃ খাদ্য শুকাইলে উহার ওজন বহুগুণে কমিয়া হাল্‌কা হইয়া যায়। সংরক্ষণ ও বিদেশে প্রেরণের পক্ষে এইরূপ শুষ্ক খাদ্য সুবিধাজনক। তবে খাদ্য শুকাইবার সময় দেখিতে হইবে উহা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত না শুকাইয়া যায়।

অতিরিক্ত শুষ্ক সব্জি ভাল সিদ্ধ হইতে চাহে না, উহার স্বাদও খারাপ হইয়া যায়। আবার কম শুষ্ক খাদ্যও পচিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। খাদ্যবস্তু কাটিয়া উহার ভিতরে যখন আর কোনরূপ জলীয় পদার্থ পাওয়া যাইবে না তখনই উহা সংরক্ষণের উপযোগী হইয়াছে বুঝিতে পারিবে।

লবণের সাহায্যে সংরক্ষণ (Salting) : চিনির মতই লবণেরও খাদ্য সংরক্ষণ করিবার গুণ রহিয়াছে। লবণের সাহায্যে খাদ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। শাক-সব্জি ও মাছ, সাধারণতঃ ইলিশ মাছ লবণ দিয়া সংরক্ষণ করা হয়। স্বল্প কিংবা বেশী পরিমাণ দুই ভাবেই লবণ প্রয়োগ করা যায়। খাদ্য-বস্তুতে স্বল্প পরিমাণ লবণ ব্যবহার করিলে উহা ঈষৎ গাঁজাইয়া উঠিতে চায়। অধিক পরিমাণে লবণ ব্যবহার করিলে খাদ্যবস্তু টাটকা থাকে বটে কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের লবণাক্ত ভাব দূর করা কোন কোন ক্ষেত্রে কঠিন হইয়া পড়ে।

রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে সংরক্ষণ

চিনি, লবণ, ভিনিগার, সরিষা বা অন্য কোন মিঠা তেল ও মশলার খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ, যথা—বেনজৈক অ্যাসিড (Benzoic acid), বেনজোয়েটস (Benzoates), বোরিক (Boric) অ্যাসিড ও সালফাইটস (Sulphites) মিশ্রিত করিলে খাদ্যদ্রব্য বহুদিন পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। এইভাবে চিনির সাহায্যে আমরা জ্যাম, জেলী, লবণ ও মশলার সাহায্যে আচার, বেনজৈক ও বেনজোয়েটস-এর সাহায্যে ফলের রস, বোরিক অ্যাসিডের দ্বারা ক্রীম এবং সালফাইটসের সাহায্যে টাট্কা ফল সংরক্ষণ করিতে পারি।

খাদ্য সংরক্ষণের আধুনিকতম পদ্ধতি : খাদ্যদ্রব্যের খাদ্যমূল্য, বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদ সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়া সংরক্ষণ করিবার জন্য আজকাল এন্টিবায়োটিক (antibiotics), ক্যাথোড রশ্মি (Cathode Ray) এবং আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি (Ultra-violet ray) ব্যবহারের প্রচেষ্টা চলিতেছে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে সাব্টিলিন (Subtilin) নামক এন্টিবায়োটিকের সাহায্যে তরি-তরকারির বর্ণ এবং গন্ধ অবিকৃত রাখা যায়। সামান্য পরিমাণ সাব্টিলিন খাদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহা একটি পাত্রে পুরিতে হয়। অধিকাংশ জীবাণুই এই সাবটিলিনের সংস্পর্শে ধ্বংস হইয়া যায় কিন্তু খাদ্যের জারকসমূহের (Enzymes) উপর এবং কোন কোন ঈস্ট ও ছত্রাকের উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই। এইজন্য পাত্রটিকে ভালভাবে সীল করিয়া ও ৫ হইতে ১০ মিনিট পর্যন্ত ২১৬° ফাঃ উত্তপ্ত করিয়া ঐ জারক রস, ঈস্ট এবং ছত্রাকসমূহ বিনাশ করা হয়।

ক্যাথোড রশ্মি মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে খাদ্যের জীবাণু ধ্বংস করিতে পারে এবং ইহার সাহায্যে ভাইটামিন ও প্রোটিন মোটেই অপচয় হয় না। এইজন্য আজকাল এই রশ্মির সাহায্যেও খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ করিবার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই পদ্ধতির একটি বড় অসুবিধা হইতেছে এই যে এই রশ্মি প্রয়োগে খাদ্যের বর্ণ, গন্ধ এবং স্বাদের কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটে।

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মিও জীবাণু ধ্বংস করিতে বিশেষ কার্যকরী। মাংস সংরক্ষণে এই রশ্মি আজকাল ব্যবহৃত হইতেছে।

এই সকল আধুনিক পদ্ধতিসমূহ এখনও পূর্ণ সফলতা অর্জন করে নাই ; এখনও গবেষণাগারে ইহাদের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহারা খাদ্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করিবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

B. ডায়াটেটিক্স ও খাদ্য পরিকল্পনা
(Dietetics and Diet Planning)

1. ভারতীয়দের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য
(Nutritional allowances for Indians)

আমরা পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে নানা রোগশোকে ভুগিয়া অকালে মৃত্যু বরণ করি। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শিশুমৃত্যুর হার আমাদের দেশে অন্যান্য দেশের তুলনায় অধিক। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় আমাদের দেশে মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪০ জন শিশু এবং এই শিশুদের বয়স ১-৬ বৎসরের মধ্যে। একটি উন্নত দেশে এই শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা ৪ জন; I. C. M. R. হইতে যে রিপোর্ট প্রকাশ করা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে আমাদের খাদ্যে ক্যালোরির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম। একজন প্রাপ্তবয়স্ক গড় ভারতীয় পুরুষ প্রতিদিন ১৮৯০ ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করে। কিন্তু ঐ বয়সের একজন পুরুষের জন্য যে পরিমাণ ক্যালরি আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয় তাহা হইতেছে ২৪০০ ক্যালরি। একজন গড় ভারতীয় খাদ্যের প্রোটিনের পরিমাণ ৫৩ গ্রাম। ইহা আদর্শ প্রোটিনের পরিমাণের (৪৪ গ্রাম) তুলনায় কম নয়। কিন্তু এই প্রোটিনের প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের পরিমাণ কম থাকে। এইজন্য দেহগঠনে ইহা তেমন উপযোগী নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ যে পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালরি খাইয়া থাকে তাহা পরের পৃষ্ঠার চার্টে দেওয়া হইল। এই সঙ্গে একজন প্রাপ্তবয়স্ক গড় ভারতীয়ের আদর্শ পরিমাণ প্রোটিন ও ক্যালরিও ঐ চার্টে দেওয়া হইল। Diet Atlas of India, 1969-এ এই তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রোটিন-ক্যালরি ছাড়া ভাইটামিন 'এ', 'বি', লৌহ ইত্যাদির অভাবও ভারতীয়ের খাদ্যে রহিয়াছে। ভাইটামিন 'এ'-র অভাবের ফলে বহু ভারতবাসী বিশেষতঃ শিশু অন্ধ হইতেছে এবং লৌহের অভাবে গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। 'বি' ভাইটামিনের অভাবে মুখে ও মুখের কোণায় ঘা হইতেছে। National Institution of Nutrition সমগ্র দেশে জনসাধারণ প্রতিদিন কি ধরনের খাদ্য খায় এবং তাহাতে তাদের কতটুকু পুষ্টি হয় সে সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খাদ্যশস্যের পরিমাণ আদর্শ পরিমাণের তুলনায় অধিক। একজন গড় ভারতবাসীর জন্য প্রতিদিন ৩৭০ গ্রাম খাদ্যশস্য (Cereals) ধার্য করা হইয়াছে। কিন্তু একজন প্রাপ্তবয়স্ক গড় ভারতীয় প্রতিদিন ৪৮৬ গ্রাম খাদ্যশস্য খায়। বাংলাদেশে আমরা প্রতিদিন ৪৩৫ গ্রাম খাদ্যশস্য গ্রহণ করি। এই খাদ্যশস্যই ভারতীয়ের প্রধান খাদ্য। প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য হইতেছে ধান, গম, যব, জোয়ার এবং রাগী। দেখা গিয়াছে মোট ক্যালরি ও প্রোটিনের শতকরা ৮০ ভাগ এই খাদ্যশস্য হইতেই সংগৃহীত হয়।

ডালে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন থাকে। ডাল এবং খাদ্যশস্যের প্রোটিন দ্বিতীয় শ্রেণীর হইলেও এই দুইটি যদি যথাক্রমে ১ ঃ ৫ অনুপাতে খাদ্যে থাকে তবে উহাদের সংগৃহীত মিলিত প্রোটিন দেহগঠনে বিশেষ উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করা হয়। কিন্তু খাদ্যশস্য যেমন আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে খাই তেমনি ডাল আমরা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম পরিমাণে খাই। ফলে উহাদের মিলিত প্রোটিন দেহগঠনে তেমন উপযোগী হয় না। একজন প্রাপ্তবয়স্ক গড় ভারতীয়ের জন্য ৭০ গ্রাম ডাল আদর্শ পরিমাণ বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। বাংলাদেশে একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রতিদিন ৪৭ গ্রাম ডাল খায় এবং একজন গড় ভারতীয় খায় ৪১ গ্রাম। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ ও বিহারের অধিবাসীরাই অধিক পরিমাণে ডাল খায়। কেরালা, জম্মু ও কাশ্মীর, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে সবচেয়ে কম ডাল খাওয়া হয়। একজন গড় ভারতীয়ের ডাল ও খাদ্যশস্যের অনুপাত হইতেছে ১ ঃ ১২।

মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ও ফল-ফলাদি রক্ষাকারী খাদ্য। এই সকল খাদ্যে উৎকৃষ্ট প্রোটিন, যথেষ্ট ভাইটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। এইজন্য শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম রাখিতে এই শ্রেণীর খাদ্য বিশেষ উপযোগী। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় ভারতীয়ের খাদ্যে এই শ্রেণীর খাদ্যের বড় অভাব। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান বাদে অন্যান্য রাষ্ট্রে দুধ এবং দুগ্ধজাত খাদ্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ব্যবহৃত

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন মাথাপিছু প্রোটিন ও ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ

রাজ্যের নাম	প্রোটিন (গ্রাম)	ক্যালরি
অন্ধ্রপ্রদেশ	৪৯.৪	১৮৮০
বিহার	৫৪.৯	১৯৫০
গুজরাট	৫৪.১	১৪৩০
জম্মু ও কাশ্মীর	৬৫.৪	২২৬০
হিমাচল প্রদেশ	৭৫.৬	২৪৬০
কেরালা	৪৮.৩	১৬৭০
মধ্যপ্রদেশ	৯৩.৩	৩০০০
মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	৩৮.৭	১৪৯০
মহারাষ্ট্র	৪৮.৪	১৭৯০
মহীশূর (কর্ণাটক)	৬৫.২	২০৪০
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	৭৩.৬	২২১০
রাজস্থান	৭০.২	২৩৬০
উত্তর প্রদেশ	৬৬.৩	২২১০
পশ্চিমবঙ্গ	৫৮.৫	২১০০
সারা ভারত	৫৩.০	১৮৯০
প্রস্তাবিত পরিমাণ	৪৪.০	২৪০০

* Source of data : Diet Atlas of India, 1969.

হয়। কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রয়োজনের তুলনায় অধিক দুগ্ধ ব্যবহৃত হয়। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের জনগণ সাধারণ ভারতবাসীর তুলনায় অধিক দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য ব্যবহার করে। তবে ইহাও প্রয়োজনের তুলনায় কম। বাংলা এবং কেরালায় মাছ, মাংস ও ডিম মোটামুটি ভালই খাওয়া হয়। কিন্তু অন্যান্য রাষ্ট্রে এই সকল খাদ্যদ্রব্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম খাওয়া হয়। শাক-সবজি (Leafy vegetable) জম্মু ও কাশ্মীরে উপযুক্ত পরিমাণেই খাওয়া হয়। তাছাড়া অন্যান্য প্রদেশে এই জাতীয় খাদ্যের প্রচলন খুব কম। অন্যান্য তরি-তরকারি বাংলা, কেরালা, পাঞ্জাব ও হরিয়ানাতে মোটামুটি ভালই খাওয়া হয়। অন্যান্য প্রদেশের জনগণ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম তরি-তরকারি খায়। ফল-ফলাদি একমাত্র মধ্যপ্রদেশ ও কেরালার অধিবাসীরাই যথেষ্ট পরিমাণে খায়। অন্যান্য প্রদেশের জনগণের খাদ্যে ফলের পরিমাণ কম থাকে।

আমাদের খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ স্নেহ পদার্থ থাকা প্রয়োজন। কারণ স্নেহ ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' দ্রবীভূত করিয়া দেহের গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলে। তাছাড়া স্নেহপদার্থ খাদ্যে কতকগুলি প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিড জোগান দেয়। এই সকল ফ্যাটি অ্যাসিডের অভাবে দেহে বিশেষতঃ কনুই ও হাঁটুতে এক প্রকার চর্মরোগ হয়। ইহাতে চামড়া মোটা হইয়া যায় এবং ইহাকে Toad skin বলে।

কিন্তু সকল ভারতীয়দের খাদ্যেই স্নেহ পদার্থ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক গড় ভারতীয় পুরুষের জন্য প্রতিদিন ৩৮ গ্রাম স্নেহ পদার্থ আদর্শ পরিমাণ বলিয়া ধার্য করা হইয়াছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক বাঙালী পুরুষ প্রতিদিন ১৭ গ্রাম স্নেহ পদার্থ খায়। প্রয়োজনের তুলনায় ইহা অনেক কম। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রতিদিন যে পরিমাণ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য খায় তাহা প্রকাশ করা হইল। ঐ চার্টে একজন গড় ভারতীয়ের প্রকৃত খাদ্য এবং একজন গড় ভারতীয়ের আদর্শ পরিমাণ খাদ্যের ওজনও দেওয়া হইল। এই পরিসংখ্যান Diet Atlas of India, 1969-এ প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্যের নমুনা*

রাজ্য	চাউল	গম	অন্যান্য খাদ্যশস্য ও *মিলেটস	মোট খাদ্যশস্য	ডাল	দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য	মাংস, মাছ এবং ডিম	শাক-সবজি	অপরাপর শাক-সবজি	ফল	চর্বি এবং তেল	চিনি এবং গুড় জাতীয় খাদ্য
অন্ধ্র প্রদেশ	১৬	৯	১৩৪	৪৫৯	২৯	৬৪	১০	১০	৩২	১	১১	৮
বিহার	৩৬০	৪৯	২৯	৪৬৮	৫৬	৮	৮	১৬	৭১	৫	৮	৩
গুজরাট	৭৩	১৩	৩৩৯	৪২৫	৪৩	৭	৬	২৬	৪৯	—	৫	৬
হিমাচল প্রদেশ	২২১	১২৪	২৭৫	৬২১	৪৭	২২	২	২০	১৯	—	৩	৬
জম্মু ও কাশ্মীর	২১২	১৮	৩৫৯	৫৮৯	৮	১৪	৩	১৬৩	৬৩	—	৯	১২
কেরালা	৩১৮	২৭	৮	৩৫৩	২৭	৫২	৪৯	৯	১৭০	৩৫	৭	১৬
মধ্য প্রদেশ	৫৭	৩৫৫	২৫৯	৬৭১	৫৪	১৩৮	১১	৪	৪১	৮৬	১৯	৩৮
মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	৩০১	১০	৫৭	৩৬৮	২১	৩২	১৭	১২	৫৬	৬	৮	৭
মহারাষ্ট্র	৩৩২	৫৮	৯৬	৩৮৬	৩৪	৮৩	১৯	১২	৫৯	৭	১৫	৩০
মহীশূর (কর্ণাটক)	৫১	১৬	৪৪৬	৫১৩	৫০	৫২	৪	৮	২৫	—	১১	১২
পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	৪৬	৩৯৩	৭০	৫০৯	৪৫	২৩০	১০	৩২	৯৮	৬	২০	৭৬
রাজস্থান	১৩১	১৮১	২৬৭	৫৭৯	৪৩	১০০	২	১৫	৩৭	৩	১৭	২১
উত্তর প্রদেশ	১৭৮	১৪৩	১৬২	৪৮৩	৬৫	৮২	৯	৪০	৮৫	২৫	১৭	৩২
পশ্চিমবঙ্গ	৩৭৪	৬১	—	৪৩৫	৪৭	৫৪	৩৮	৪৫	১০১	৯	১৭	২৫
সমগ্র ভারত	২০৫	১০০	১৮১	৪৮৬	৪১	৬৭	১৩	২১	৬৫	১৪	১২	২১
বিভিন্ন সুষম খাদ্যের প্রস্তাবিত আহার্য দ্রব্যের পরিমাণ				৩৭০	৭০	১৮০	৩৫	১১৪	১২৫	৩৭	৩৮	৪০

* মিলেটস (Millets) বলিতে বুঝায় জোয়ার, বাজরা ইত্যাদি অতি ক্ষুদ্র শস্যকণা। খাদ্য শস্যের পরিমাণসমূহ গ্রামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

Source of Data : Diet Atlas of India, 1969.

2. বিভিন্ন বয়সের ও পেশার ব্যক্তিদের জন্য সুষম খাদ্য (Balanced diets for different age groups and occupations)

দারিদ্র্যই অপুষ্টির প্রধান কারণ সন্দেহ নাই তবে খাদ্যসম্বন্ধে সচেতনতার অভাব, স্থানীয় সুলভ পুষ্টিকর খাদ্যগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং ফলে উহাদের অবহেলা করার জন্য ভারতের জনগণের এক বিরাট অংশ অপুষ্টিতে ভুগিতেছে।

প্রোটিন ক্যালরির ঘাটতির ফলে শিশুদের যে কেবল শারীরিক পুষ্টি ও বৃদ্ধি ব্যাহত হয় তাহা নয় পরন্তু মানসিক দিক হইতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়া পড়ে। দরিদ্র ঘরের শিশুরা জন্মের পর প্রথম ছয় মাস উপযুক্ত পরিমাণে মাতৃস্তন্য পাইলে বিত্তবান ঘরের শিশুদের মত একই হারে বাড়িতে থাকে। কিন্তু তারপর যখন মাই ছাড়াইয়া শিশুকে প্রথম বদলি খাদ্যে অভ্যাস করাইবার সময় উপস্থিত হয় তখনই পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে তাহার বৃদ্ধি স্তিমিত হইয়া আসে। অন্যদের তুলনায় দেহে এবং মনে সে ক্রমশঃ পিছাইয়া পড়িতে থাকে।

প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদানযুক্ত খাদ্য যথাযথ পরিমাণে গ্রহণের উপর ব্যক্তির সুস্বাস্থ্য নির্ভর করে। অপুষ্টির হাত হইতে সর্বসাধারণকে বাঁচাইতে হইলে কি কি ধরনের খাদ্য বয়স এবং দৈহিক অবস্থা অনুযায়ী কতটা পরিমাণে খাইলে সুষম খাদ্য গ্রহণ করা হইবে সে সম্বন্ধে জনসাধারণের অবহিত হওয়া দরকার। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহ এবং তেলজাতীয় পদার্থ, ভাইটামিন ও খনিজ লবণ হইল খাদ্যের প্রধান পুষ্টিকর উপাদান। তাছাড়া জৈব প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য চাই জল।

দৈনিক খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় বয়স (সঙ্গে উচ্চতা ও ওজন অনুসারে), যৌন-পার্থক্য, দৈহিক অবস্থা এবং শ্রমের নিরিখে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় একজন কঠোর কায়িক পরিশ্রমী ব্যক্তির সাধারণের চেয়ে বেশী তাপ ও শক্তি প্রয়োজন, সুতরাং অন্যান্যদের তুলনায় তাহার খাদ্যে কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের পরিমাণ বেশী হইবে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের চেয়ে একটি শিশু এবং বর্ধিষ্ণু বালক বালিকার প্রোটিনের প্রয়োজন অধিক। প্রাপ্তবয়স্কদের যেখানে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে গড়ে ১ গ্রাম মিশ্র প্রোটিন এবং তাহার অর্ধেক অথবা এক-তৃতীয়াংশ প্রাণিজ প্রোটিন দরকার, শিশুদের সেখানে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ২ গ্রাম মিশ্র প্রোটিন এবং উহার অর্ধেক অথবা দুই-তৃতীয়াংশ প্রাণিজ প্রোটিন দরকার। আবার একজন নারীর স্বাভাবিক সময়ে যে খাদ্য প্রয়োজন গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি অবস্থায় তাহার প্রোটিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন বাড়িয়া যায় কারণ শিশু মায়ের নিকট হইতে দেহগঠনের উপযোগী উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া থাকে।

ক্রমবর্ধমান শিশুর ক্ষেত্রে প্রোটিনের চাহিদা বেশী কারণ প্রোটিন দেহগঠনের ভিত্তিস্বরূপ। খাদ্যপ্রোটিন হইতেই দেহপ্রোটিন তৈরি হয়। বয়স্কদের আবার প্রোটিনের প্রয়োজন (১) নাইট্রোজেন সাম্য বজায় রাখার জন্য, (২) এনজাইম, হরমোন সংশ্লেষণের জন্য, (৩) কলাকোষ মেরামতির জন্য এবং (৪) স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য।

প্রোটিনের পুষ্টিমূল্য নির্ভর করে উহার লঘুপাচ্যতা এবং জৈবমূল্যের উপর।

শিশুখাদ্যে ক্যালরি চাহিদার ৩০-৩৫ শতাংশ স্নেহখাদ্যের সুপারিশ করা হয়, বয়স্কদের ক্ষেত্রে ১০-১৫ শতাংশ। ক্যালরি শক্তির উৎস হিসাবে কার্বোহাইড্রেট ও

স্নেহদ্রব্য পরস্পরকে প্রতিস্থাপন করে। তবে জ্বালানি হিসাবে স্নেহদ্রব্যের চেয়ে কার্বোহাইড্রেটের যোগ্যতা ১০ শতাংশ বেশী। খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ নানাভাবে পরিবর্তিত হয় এবং বাজার দর কম বলিয়া খাদ্যে ইহার অনুপাত সবচেয়ে বেশী। খাদ্যে স্নেহপদার্থ এবং প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইলে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমান যাইতে পারে।

সুষম খাদ্য কাহাকে বলে? যে খাদ্যবস্তু (১) দেহের ক্যালরি চাহিদার যোগান দিতে পারে, (২) কলাকোষের বৃদ্ধি ও গঠন বজায় রাখিতে পারে, (৩) দেহের শারীরবৃত্তীয় কার্যগুলিকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে তাহাকে সুষম খাদ্য বলে। বয়স (age), যৌনপার্থক্য (sex), দৈহিক অবস্থা (physiological and pathological condition) এবং শ্রমের (work done) হিসাবে পুষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি উপযুক্ত পরিমাণে সুষমখাদ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির সুষম খাদ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত খাদ্যোপাদানগুলি থাকা চাই। যেমন—

(১) দেহগঠনের উপযোগী খাদ্য বা প্রোটিন—মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, ছোলা, বাদাম, সয়াবীন, গম ইত্যাদি।

(২) শক্তিসরবরাহকারী খাদ্য বা কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থ—চাল, গম, আলু, চিনি, গুড়, ঘি, মাখন, তেল ইত্যাদি।

(৩) প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য বা ভাইটামিন এবং খনিজ লবণ, শাকসবজি, দুধ ফল ইত্যাদি। বিভিন্ন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পরিশ্রম ও দৈহিক অবস্থা অনুযায়ী ক্যালরির পরিমাণ বিভিন্ন। তাই কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহপদার্থের পরিমাণও বিভিন্ন। কিন্তু দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও সুস্থতার জন্য সকল সুস্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির প্রোটিন, খনিজ ও ভাইটামিনের পরিমাণ মোটামুটি এক রকম থাকে। সুষম খাদ্য প্রস্তুতির সময় এই কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য।

খাদ্যের মূল সাতটি বিভাগ হইতে অন্ততঃ ১টি করিয়া খাদ্য সামগ্রী লইয়া সুষম খাদ্য প্রস্তুত করিতে হয়। সুষম খাদ্যে খাদ্যের গুণ (quality) এবং মাত্রা বা পরিমাণ (quantity) সমান গুরুত্বপূর্ণ।

মূল খাদ্য-তালিকা (Basic dietary pattern)

কতকগুলি নিয়ম বা সূত্র ধরিয়া একটি সুষম মূল খাদ্য-তালিকা রচনা করিতে হইবে।

(১) প্রথমতঃ খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি (Nutrients) ব্যক্তি বিশেষের বয়স, কর্ম ও শারীরিক অবস্থা ভেদে যে বিভিন্ন প্রকার হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত হইবে। [এই প্রসঙ্গে Daily allowances of Nutrients for Indians ICMR Special Report 1981 দেখ। এই পুস্তকে রহিয়াছে।]

(২) দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের তাপমূল্য থাকা চাই।

(৩) খাদ্য দেহ গঠনের ও ক্ষয়পূরণের উপযোগী প্রোটিন সরবরাহ করিবে।

(৪) খাদ্যে যথোপযুক্ত ভাইটামিন, খনিজ লবণ ও জল অর্থাৎ দেহ রক্ষাকারী উপাদানগুলি বর্তমান থাকা উচিত।

(৫) বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিমূল্য ও খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে পূর্ব জ্ঞানের প্রয়োজন। প্রথমে খাদ্যের মূল বিভাগগুলি হইতে খাদ্য বাছাই করিতে হইবে। পরে প্রয়োজনমত যে কোন বিভাগ হইতে খাদ্য বাছাই করা যায়। খাদ্যের পরিমাণও সঠিক থাকা চাই। খাদ্য বাছাইয়ে বৈচিত্র্য রাখিতে হইবে। নচেৎ একঘেয়ে খাদ্য বাছাইএর ফলে কোন না কোন খাদ্য উপাদানের ঘাটতি থাকিয়া যাইবে এবং আহার্য গ্রহণের ইচ্ছাও কমিয়া যাইবে।

(৬) খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির কালে খাদ্যাভ্যাসের (Food habits) কথাও চিন্তা করিতে হয়। দেশ, জাতি, ধর্মীয় প্রভাব ও মানসিকতাকে যথোপযুক্ত প্রাধান্য দিতে হইবে।

(৭) ব্যক্তির বা পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির কথা চিন্তা করিয়া খাদ্য-তালিকা রচনা করিতে হইবে।

(৮) রন্ধন পদ্ধতি ও রন্ধনের সুযোগ-সুবিধার কথা চিন্তা করিয়া খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত হইবে। বিভিন্ন রন্ধন পদ্ধতিতে খাদ্যের কোন কোন উপাদান রক্ষিত বা বিনষ্ট হয়।

(৯) ঋতু ও আবহাওয়ার কথা চিন্তা করিয়া খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে।

নীচে একটি মূল খাদ্য-তালিকার নমুনা দেওয়া হইল ঃ

খাদ্যের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)
শস্যকণা	২০০
মিলেট	২০০
ডাল	৭০
শাকসবজি	৮৫
ফল	৫০
দুধ	১৭০
চিনি/গুড়	৫৭
মাছ/মাংস/ডিম	৩০
তৈল/ঘি	৩০

উপরের খাদ্য-তালিকা হইতে নিম্নলিখিত খাদ্যোপাদানগুলি পাওয়া যাইবে ঃ

খাদ্যোপাদান	পরিমাণ
তাপমূল্য	২৪৫০ ক্যালরি
প্রোটিন	৬৬ গ্রাম
চর্বি	৬০ ,,
কার্বোহাইড্রেট	৪৪০ ,,
ক্যালসিয়াম	০·৮ ,,
ফসফরাস	১·৪ ,,
লৌহ	৪০ মিলিগ্রাম
ভাইটামিন এ	৯৬০ মাইক্রোগ্রাম
ভাইটামিন বি	১·৮ মিলিগ্রাম
ভাইটামিন সি	২৮০ মিলিগ্রাম

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাঝারী পরিশ্রমী পুরুষের খাদ্য

একজন প্রাপ্তবয়স্ক মাঝারি পরিশ্রমী ব্যক্তির দৈনিক ২৮০০ ক্যালরির প্রয়োজন। খাদ্যের মূল বিভাগগুলি হইতে সংগ্রহ করার পর যদি দেখা যায় যে অন্যান্য উপাদান ঠিকমত আছে কিন্তু কেবলমাত্র তাপ মূল্য বা ক্যালরির পরিমাণে ঘাটতি পড়িয়াছে। তবে উচ্চতাপমূল্যযুক্ত যে কোন খাদ্য হইতে এই অভাব পূরণ করিতে হইবে। ভাত, রুটি, খই, মুড়ি, চিড়া, বিস্কুট, চিনি, গুড়, জ্যাম, জেলি, শরবত ইত্যাদি সমস্তই তাপ, উৎপাদক খাদ্য। একজন মাঝারি পরিশ্রমী আমিষভোজী পুরুষের খাদ্য-তালিকা ICMR প্রদত্ত তালিকা হইতে দেওয়া হইল। ইহার খাদ্যমূল্য ২৮০০ ক্যা.।

খাদ্য	পরিমাণ (গ্রাম)
শস্যকণা	৫২০
ডাল	৫০
শাকসবজি ও	৪০
অন্যান্য সবজি	৭০
আলু	৬০
ফল	—
ডিম	৩০
মাছ/মাংস	৩০
তেল/ঘি	৪৫
চিনি/গুড়	৩৫

বিভিন্ন রুচি, পেশা ও স্ত্রী-পুরুষভেদে এই খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া খাদ্যের উপাদান ঠিক রাখিয়া খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এইরূপ একটি মূল খাদ্যতালিকা হাতের কাছে থাকিলে প্রতি গৃহিণীরই সুবিধা হয়।

১নং চার্ট	শিশু	বালক	বালক	বালিকা
	১-৩ বৎসর	৪-৬ বৎসর	১০-১২ বৎসর	১০-১২ বৎসর
	(গ্রাম)	(গ্রাম)	(গ্রাম)	(গ্রাম)
শস্যদানা (চাউল, আটা, ভুট্টা, যব)	১৭৫	২৭০	৪২০	৩৮০
ডাল জাতীয় খাদ্য	৩৫	৩৫	৪৫	৪৫
সবুজ শাকসবজি	৪০	৫০	৫০	৫০
অন্যান্য সবজি	২০	৩০	৫০	৫০
মূল ও কন্দ	১০	২০	৩০	৩০
দুধ	৩০০	২৫০	২৫০	২৫০
স্নেহ ও তেল	১৫	২৫	৪০	৩৫
গুড় চিনি	৩০	৪০	৪৫	৪৫

২নং চার্ট	অল্প পরিশ্রমী		স্বাভাবিক পরিশ্রমী		কঠোর পরিশ্রমী	
	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ	স্ত্রী	পুরুষ
খাদ্যশস্য	গ্রাম		গ্রাম		গ্রাম	
শস্যদানা (চাউল, আটা, ভুট্টা, যব)	৪১০	৪৬০	৪৪০	৫২০	৫৭৫	৬৭০
ডাল	৪০	৪০	৪৫	৫০	৫০	৬০
সবুজ শাকসবজি	১০০	৪০	১০০	৪০	৫০	৪০
অন্যান্য তরকারী	৪০	৬০	৪০	৭০	১০০	৮০
মূল ও কন্দ	৫০	৫০	৫০	৬০	৬০	৮০
দুধ	১০০	১৫০	১৫০	২০০	২০০	২৫০
স্নেহ ও তেল	২০	৪০	২৫	৪৫	৪০	৬৫
গুড় ও চিনি	২০	৩০	২০	৩৫	৪০	৫৫

Food and Nutrition Board, Ministry of Agriculture কর্তৃক প্রচারিত ১৯৮১ সালে, ICMRএর সুপারিশক্রমে।

৩নং চার্ট

আমিষ ভোজীদের খাদ্য হইতে বাদ দেওয়া যায়।	পরিবর্তে বদলি খাদ্যের সুপারিশ
৫০% ডালের পরিবর্তে (২০-৩০ গ্রাম)	১। ১টি ডিম অথবা ৩০ গ্রাম মাছ কিংবা মাংস ২। বাড়তি ৫ গ্রাম ফ্যাট অথবা তেল
১০০% ডালের পরিবর্তে (৪০-৬০ গ্রাম)	১। দুটি ডিম অথবা ৫০ গ্রাম মাছ কিংবা মাংস অথবা ১টি ডিম +৩০ গ্রাম মাছ কিংবা মাংস ২। বাড়তি ১০ গ্রাম ফ্যাট অথবা তেল

আমিষ ভোজীদের খাদ্যে ডাল কমাইয়া অথবা ডাল সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া যে ডিম-মাছ-মাংসের সুপারিশ করিয়াছে তাহা ৩নং চার্টে দেখান হইল।
(ICMRএর ১৯৮১ সালে প্রকাশিত সুপারিশ হইতে)

৪নং চার্ট

খাদ্যবস্তু	গর্ভাবস্থায়	কিলো ক্যালরি	প্রসূতি অবস্থায়	কিলো ক্যালরি
খাদ্যশস্য	৩৫ গ্রাম	১১৮	৬০ গ্রাম	২০৩
ডাল	১৫ গ্রাম	৫২	৩০ গ্রাম	১০৫
দুধ	১০০ গ্রাম	৮৩	১০০ গ্রাম	৮৩
ফ্যাট	—	—	১০ গ্রাম	৯০
চিনি	১০ গ্রাম	৪০	১০ গ্রাম	৪০
		মোট ২৯৩		মোট ৫২১

গর্ভাবস্থায় এবং প্রসূতি অবস্থায় ICMR যে অতিরিক্ত খাদ্য সুপারিশ করিয়াছে (১৯৮১ সালে প্রকাশিত) তাহা ৪নং চার্টে দেখান হইল।

বৃদ্ধের খাদ্য

বৃদ্ধ বয়সে দেহযন্ত্রের প্রতিটি অংশেরই কার্যক্ষমতা কমিয়া যায় এবং প্রাকৃতিক নিয়মে দেহকোষগুলির ক্ষয় শুরু হয়। বিপাকক্রিয়ার বিশৃংখলাজনিত ডায়াবিটিস, রক্তচাপবৃদ্ধি ইত্যাদি রোগ এই সময়ে বেশী দেখা যায়। আর দেখা যায় অপুষ্টিজনিত পেশীর অবক্ষয় এবং অস্টিও ম্যালেসিয়া।

শিশুর খাদ্য ব্যবস্থায় যেমন উহার দৈহিক পুষ্টি ও বৃদ্ধির দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় তেমনি বৃদ্ধের খাদ্য ব্যবস্থায় তাহার দৈহিক ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। দেহের ক্ষয়পূরণের জন্য প্রোটিনের প্রয়োজন হয় বলিয়া প্রোটিনের পরিমাণও কিছুটা হ্রাস করিতে হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে বিপাকক্রিয়া মন্থর হইয়া আসে। কায়িক শ্রমের পরিমাণ কমিয়া আসে এবং চলাফেরা হয় ধীরে। ফলে দেহের তাপমূল্য বা ক্যালরির প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পায়। কায়িক শ্রমের পরিমাণ অনুযায়ী এই সময় পুরুষের গড়পড়তা ২৪০০ এবং নারীর ১৮০০ ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হইয়া থাকে। ফলে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাটের পরিমাণ কমাইতে হয়। বিশুদ্ধ কার্বোহাইড্রেট যেমন চিনি মিশ্রি ইত্যাদি বাদ দিয়া রুটি এবং অল্প ভাতের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটের অভাব পূরণ করিতে হয়। পাচনতন্ত্রের শৈথিল্যবশতঃ ঘি, তেল, বনস্পতি জাতীয় স্নেহবর্জন করিতে হয়। দুধের স্নেহ সহজপাচ্য বলিয়া দুধ এবং সামান্য মাখন খাইয়া স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ করা ভাল। দুধে আবার প্রচুর ক্যালসিয়াম আছে। খাদ্যে উপযুক্ত ক্যালসিয়াম থাকিলে শরীর সুস্থ থাকে, জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং যৌবনকাল অধিক দিন স্থায়ী হয়। এই সব কারণে দুগ্ধ বৃদ্ধের খাদ্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা হয়।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মৃদু রক্তাল্পতাও দেখা দেয়। সুতরাং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধের খাদ্যের অত্যাবশ্যক অঙ্গ বলিয়া গণ্য করা উচিত। মাঝে মাঝে যকৃতের ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং শারীরিক অসুস্থতা খাদ্যে ভাইটামিনের অভাব সূচিত করে। সুতরাং বৃদ্ধের খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ ফলের ব্যবস্থা করা কর্তব্য। শাক-সবজির পরিমাণ একটু কমাইয়া দেওয়া ভাল কারণ শাকসবজির দুষ্পাচ্য সেলুলোজ অজীর্ণ ও বদহজমের সৃষ্টি করিতে পারে। ফলমূল ও বিভিন্ন খাদ্যশস্যের অপেক্ষাকৃত নরম সেলুলোজই বৃদ্ধের কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শরীর সুস্থ রাখিবে। এই সকল খাদ্যের সহিত যথেষ্ট পরিমাণে জল পান করা দরকার।

শারীরিক সুস্থতার জন্য বার্ধক্যে নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্য অবশ্য গ্রহণ করা কর্তব্য ঃ

দুধ ২৫০ হইতে ৪০০ গ্রাম
বিভিন্ন ফল ১০০ গ্রাম
তরিতরকারি ১০০-১২৫ গ্রাম

একদিন অন্তর একটা করিয়া ডিম, কিছু ছোট মাছ বা মাংস, টমেটো, কমলা ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি' জাতীয় ফল, সামান্য মিষ্টি, চা ও কফি (অভ্যাস অনুযায়ী)। শরীরের ওজন ঠিক রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত ভাত, রুটি, অল্প মাখন ইত্যাদি।

৫ নং

দৈনিক পুষ্টির

	ক্যালরির চাহিদা	প্রোটিন	ক্যালসিয়াম	লৌহ	ভাইটামিন 'এ' রেটিনল	ক্যারটিন
		গ্রামে		মিগ্রা	I. U.	
পুরুষ						
অল্প পরিশ্রমী	২৪০০	৫০	০·৪-০·৫	২৪	৭৫০	৩০০০
স্বাভাবিক "	২৮০০					
কঠোর "	৩৯০০					
স্ত্রীলোক						
অল্প পরিশ্রমী	১৯০০					
স্বাভাবিক "	২২০০	৪৫	০·৪-০·৫	৩২	৭৫০	৩০০০
কঠোর "	৩০০০					
গর্ভাবস্থায়						
দ্বিতীয়ার্ধে	+৩০০	+১৪				
প্রসূতি			১·০			
০-৬	+৫৫০			৪০	৭৫০	৩০০০
৬-১২	+৪০০	+২৫		৩২	১১৫০	৪৬০০

উপাদান

থায়ামিন	রাইবোফ্লাবিন	নায়াসিন	বি$_{৬}$	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড	ফোলিক অ্যাসিড	বি$_{১২}$	ভাইটামিন 'ডি'
←মিলি গ্রামে দেখান হইল→					মাইক্রোগ্রামে দেখান হইল		I. U.
১.২	১৪	১৬					
১.৪	১.৭	১৯	২.০	৪০	১০০	১	
২.০	২.৩	২৬					
১.০	১.১	১৩					
১.১	১.৩	১৫	২.০	৪০	১০০	১	
১.৫	১.৮	২০					
+০.২	+২	+২	২.৫	৩০০	৩০০		
+০.৩	+২	+৪	{২.৫	৩০০	৩০০	{১.৫	
+০.২	+৩	+৩		১৫০	১৫০		

বিভিন্ন গোষ্ঠী	ক্যালরি	প্রোটিন (গ্রামে)	ক্যালসিয়াম (গ্রামে)	লৌহ মি· গ্রা·	'এ' ভাইটামিন রেটিনল	ক্যারটিন
শিশু					I. U.	
০-৬ মাস	১১৪ কি·গ্রা· ওজন	২·০ কি·গ্রা· ওজন	০·৫-০·৬	১·০ মি· গ্রা·/কি	৪০০	—
৬-১২ মাস	১০৪ কি·গ্রা· ওজন	১·৭ কি·গ্রা· ওজন			৩০০	১২০০
বাচ্চা						
১-৩ বৎসর	১২২০	২২·০	০·৪-০·৫	২০·২৫	২৫০	১০০০
৪-৬ বৎসর	১৭২০	২৯·৪			৩০০	১২০০
৭-৯ বৎসর	২০৫০	৩৫·৬			৪০০	১৬০০
বালক ১০-১২ বৎ	২৪২০	৪২·৫	"	"	৬০০	২৪০০
বালিকা ঐ বৎ	২২৬০	৪২·১				
বালক ১৩-১৫ বৎ	২৬৬০	৫১·৭	০·৬-০·৭	২৫	৭৫০	৩০০০
বালিকা ঐ বৎ	২৩৬০	৪৩·৩		৩৫		
বালক ১৬-১৮ বৎ	২৮২০	৫৩·১	০·৫-০·৬	২৫	৭৫০	৩০০০
বালিকা ঐ বৎ	২২০০	৪৪·০		৩৫		

থায়ামিন	রাইবোফ্লাবিন	নায়াসিন	ভাইটামিন বি$_{৬}$	অ্যাসকরবিক অ্যাসিড	ফোলিক অ্যাসিড	ভাইটামিন বি$_{১২}$	ভাইটামিন 'ডি' আই. ইউ.
গ্রামে দেখান হইল					মাইক্রোগ্রাম		
৫৯ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	৭১ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	৭৮০ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	০.৩	২০	২৫	০.২	
৫৪ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	৬৫ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	৭১০ মাইক্রো/কিলোগ্রাম	০.৪				
০.৬	০.৭	৮	০.৬				
০.৯	১.০	১১	০.৯				
১.০	১.২	১৪	১.২				
১.২	১.৫	১৬	১.৬				
১.১	১.৪	১৫	১.৬	৪০	১০০	০.২-১.০	২০০
১.৩	১.৬	১৮	২.০				
১.২	১.৪	১৫	২.০				
১.৪	১.৭	১৯	২.০				
১.১	১.৩	১৫	২.০				

১-৫ নম্বর চার্টগুলিতে যে খাদ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে উহা ১৯৮১ সালের ICMR-এর সুপারিশ অনুযায়ী।

স্নেহজাতীয় খাদ্য, বিভিন্ন প্রকারের ভাজা, কেক, পুডিং অত্যধিক মিষ্ট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য বৃদ্ধ বয়সে অস্বাচ্ছন্দ্য ঘটাইতে পারে। এই সকল খাদ্যদ্রব্য বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের শিশুর খাদ্য

যেসব অনগ্রসর দেশের শিশু ও বালক-বালিকারা অপুষ্টির শিকার হইয়া থাকে ভারত তাহাদের অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ৩২ জন অপুষ্টিতে ভোগে। দারিদ্র্যই প্রধানতঃ ইহার প্রধান কারণ তবে বাপ-মায়ের পুষ্টি সম্বন্ধে অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাবও এজন্য কম দায়ী নয়। উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে বাপ-মা অল্পমূল্যের খাদ্য হইতে সন্তানদের পুষ্টির ব্যবস্থা করিতে পারেন। যে সব কারণে বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের খাদ্যের প্রয়োজন সেগুলি এই : (১) দেহের প্রতিনিয়ত পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য তাহাদের উপযুক্ত প্রোটিন চাই। প্রাণিজ প্রোটিনের সঙ্গে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত করিয়া মিশ্র প্রোটিনই হইবে তাহাদের পক্ষে উপযুক্ত খাদ্য। (২) স্নায়বিক পরিশ্রম এবং খেলাধুলার জন্য তাহাদের ক্যালরির প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ক্যালরির অভাবে তাহাদের ওজন হ্রাস পাইবে। (৩) এই বয়সে হাড় ও দাঁতের গঠন পূর্ণমাত্রায় চলিতে থাকে। তাই বিদ্যালয়গামী বালক-বালিকার খাদ্যে যথেষ্ট খনিজ পদার্থ থাকা দরকার। (৪) রোগাক্রমণের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য এবং দেহে উপযুক্ত প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার জন্য আর চাই পর্যাপ্ত ভাইটামিন।

শিশুকে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট ও অবসাদগ্রস্ত দেখিলে বুঝিতে হইবে শিশুর খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিন, শাকসবজি ও ফলমূলের অভাব হইয়াছে। খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ তাপ সরবরাহ করার জন্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, রুটি, গুড়, চিনি ইত্যাদি এবং স্নেহ পদার্থ যেমন মাখন ও তেল ইত্যাদি থাকা চাই। স্কুলের সময় এবং পারিবারিক আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া তাহাদের খাবার সময় এবং খাদ্য নির্বাচন করিতে হইবে।

প্রথমেই প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রাতরাশে কিছুটা প্রোটিন থাকা একান্ত প্রয়োজন। ১ কাপ দুধ, ডিম/পনীর, রুটি—আটার রুটি অথবা পাঁউরুটি, ১টি ফল এবং সঙ্গে কিছুটা অঙ্কুরিত মুগ কিংবা ছোলাই হইল আদর্শ প্রাতরাশ কিন্তু এরূপ প্রাতরাশ অধিকাংশ লোকেরই আয়ত্তের বাহিরে। তাই সাধ্যমত কিছুটা দুধ, সঙ্গে আটার রুটি ও গুড়, মাঝে মাঝে ছোলার ছাতু দেওয়া যায়। ছুটির দিনে সামান্য মাখন যোগে ফেনা ভাত ও ডিম আলু সিদ্ধ, কিংবা ডাল রুটি দেওয়া ভাল। মধ্যাহ্ন ভোজনে কিছু সবজি দেওয়া ডাল, ভাত সঙ্গে কিছুটা মাছ বা অন্য কোন শ্রেণীর সম্পূর্ণ প্রোটিন প্রয়োজন। যে সব বালকবালিকা দুপুর ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত স্কুলে অতিবাহিত করে তাহাদের জন্য অবশ্যই কিছুটা টিফিন দিতে হইবে। টিফিনে ১টি লেবু জাতীয় ফল, দুগ্ধ জাতীয় খাদ্য যেমন সন্দেশ, ১টি কলা এবং ১ টুকরা কেক আদর্শ খাদ্য। তবে অনায়াসে কয়েকখানা লুচি কিংবা পরটা, অভাবে আটার রুটি ও তরকারি, অথবা চিনাবাদাম, টমেটো বা আমলকি বা কামরাঙা যে ঋতুতে যাহা সুলভ দিতে পারেন। বিকালের জলযোগের সময় (১) মুড়ি সঙ্গে বাদাম, ভিজান ছোলা,

(২) নারিকেল কোরা সহযোগে মুড়ি, (৩) ছোলার ছাতু দিয়া তৈরি লাড্ডু অথবা ডালের বরফি সহযোগে মুড়ি, (৪) দই-চিড়া কিংবা দুধ-চিড়া কলা (৫) আটার রুটি এবং ডাল দেওয়া যায়। সঙ্গে একটি সস্তা দামের ফল যেমন শশা কিংবা পেয়ারা দেওয়া উচিত। রাতের খাবারে ডাল, ভাত, মাছ কিংবা অন্য কোন সম্পূর্ণ প্রোটিন যেমন সকালে ডিম না খাইয়া থাকিলে ১টি ডিম কিংবা কিছুটা মাংস দেওয়া যায়। সপ্তাহে ১ দিন অন্তত মেটে দেওয়া উচিত। মাঝে মাঝে আমিষ খাদ্যের বদলে শাকসবজির তরকারি অড়হড় কিংবা ছোলার ডাল, সয়াবীনে প্রস্তুত কোন খাবার, সঙ্গে স্যালাড দিয়া সুন্দর নিরামিষ লাঞ্চ প্রস্তুত করা যায়।

বিদ্যালয়গামী শিশুদের ঠিকমত পুষ্টি হইতেছে কিনা মাঝে মাঝে ওজন নিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ঠিকমত পুষ্টিকর খাদ্য পাইলে এবং ব্যাধি না থাকিলে ওজনে এবং দৈর্ঘ্যে সে বাড়িবেই।

3. গর্ভবতী নারীর খাদ্য
(Diet during Pregnancy)

শিশু গর্ভে আসিবার পূর্ব হইতেই নারীকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হয়। রুগ্ন ও দুর্বল নারী কখনই সুস্থ ও স্বাভাবিক সন্তানের মা হইতে পারে না। গর্ভকালে যাহাদের ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম থাকে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাহাদের অকালে গর্ভপাত হয় এবং তাহারা টক্সোমিয়া (**Toxemia**) ও ইক্ল্যাম্পসিয়া (**Eclampsia**) নামক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। একবার এই রোগে আক্রান্ত হইলে গর্ভবতী নারীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। সুতরাং সন্তান গর্ভে আসিবার প্রাক্কালে নারীর দেহের স্বাভাবিক ওজন রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সর্বাপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইবে গর্ভস্থ ভ্রূণের। ইহার ফলে অপরিণত বিকলাঙ্গ এমনকি মৃত সন্তানও জন্মিতে পারে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যেমন ইক্ল্যাম্প্সিয়া রোগ সৃষ্টি হইতে পারে তেমনি অধিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যের প্রভাবেও ঐ রোগ দেখা দিতে পারে। গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন হইতেই সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায়। সন্তান গর্ভে আসিবার সময় হইতেই দেহের ওজন ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকিবে। গর্ভের প্রথম তিনমাসে ২ পাউন্ড, দ্বিতীয় তিনমাসে ৪ পাউন্ড এবং শেষের তিনমাসে ৬।৭ পাউন্ড—মোটামুটি এই হারে দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইলেই গর্ভবতী নারী তাহার যথোপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে। দৈনিক খাদ্যের ক্যালরি বা তাপমূল্য কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেহের ওজনের এই হার রক্ষা করা যাইতে পারে।

খাদ্যের তাপমূল্য (Caloric allowance)—গর্ভের প্রথম কয়েক মাস সাধারণতঃ খাদ্যের তাপমূল্য স্বাভাবিক অপেক্ষা তেমন বৃদ্ধি করিতে হয় না। কিন্তু গর্ভবতী নারীর দেহের ওজন যদি স্বাভাবিকের তুলনায় কম থাকে (**underweight**) তাহা হইলে খাদ্যের তাপমূল্য বৃদ্ধি করিয়া স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

ভ্রূণের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে জননীর দেহের মেটাবলিজম বৃদ্ধি পায়। গর্ভবতী নারীর খাদ্যে এই তাপ ও শক্তির মাত্রা বাড়াইতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন স্ত্রীলোকের যে পরিমাণ খাদ্যশস্য গ্রহণ করে (যেমন অল্প পরিশ্রমী নারীর ৪১০ গ্রাম খাদ্যশস্য গ্রহণ করা উচিত) গর্ভের শেষার্ধে তাহার চেয়ে অন্ততঃ আরও ৩৫ গ্রাম (৪১০ + ৩৫) অধিক খাদ্যশস্য গ্রহণ করিবে এবং ঐ খাদ্য তাহাকে ১১৮ ক্যাঃ অধিক তাপ ও শক্তি জোগাইবে।

প্রোটিন (Protein allowance): নিজের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি এবং গর্ভস্থ ভ্রূণের পরিপুষ্টির জন্য গর্ভবস্থায় নারীর প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। ডালের পরিমাণ অন্তত স্বাভাবিকের চেয়ে ১৫ গ্রাম (৪০ গ্রাম + ১৫ গ্রাম) বেশী এবং দুধের পরিমাণ স্বাভাবিকের দ্বিগুণ (১০০ + ১০০ গ্রাম) করা উচিত। এই অতিরিক্ত প্রোটিন তাহাকে ১৩৫ ক্যালরি অধিক তাপ বেশী জোগাইবে। আমিষ ভোজীরা ডালের পরিমাণ না বাড়াইয়া ডিম অথবা ৩০ গ্রাম মাছ অথবা মাংস এবং অতিরিক্ত ৫ গ্রাম ফ্যাট গ্রহণ করিবেন। ইহাতেই প্রয়োজনীয় প্রোটিন এবং অতিরিক্ত ক্যালরি পাওয়া যাইবে।

খনিজ লবণ (Mineral allowances): ভ্রূণের অস্থির পরিপুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ঘটিত খনিজ পদার্থের প্রয়োজন। সুতরাং গর্ভিণীর খাদ্যে ঐ সকল খনিজ পদার্থ ঘটিত খাদ্যদ্রব্য যাহাতে প্রচুর পরিমাণে থাকে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থাকালে ভাইটামিন বি$_1$, বি$_2$ এবং নায়াসিনের পরিমাণ একটু বাড়াইতে হইবে। প্রসবকালে প্রচুর রক্তপাত হইবে। এইজন্য খাদ্যের ফোলিক অ্যাসিড লৌহের প্রতিও নজর রাখা কর্তব্য। খনিজ পদার্থের অভাব হইলে গর্ভবতী নারীর অ্যানিমিয়া হইবার আশংকা থাকে। দুধ, ডিম, মাছ এবং সবুজ শাকসব্জি হইতে প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ পাওয়া যায়।

ভাইটামিন (Vitamin allowance): ক্যালসিয়ামের যথাযথ ব্যবহারের জন্য খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ভাইটামিন 'ডি'-এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ইহার অভাবে ভ্রূণের অস্থি পরিপুষ্ট হইবে না। সুতরাং এই সময় ভাইটামিন 'ডি' যুক্ত খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া এই ভাইটামিনের অভাব পূরণ করিতে হইবে। মাখন, ডিম, কডলিভার অয়েল, শার্কলিভার অয়েল, ইলিশ মাছ ইত্যাদিতে এই ভাইটামিন পাওয়া যায়।

অন্যান্য ভাইটামিন ঘটিত খাদ্যদ্রব্যও এই সময় খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে থাকা উচিত। ভাইটামিন 'এ' ও 'বি$_2$'-র অভাবে অনেক সময় বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হয়। গর্ভাবস্থায় শরীর সুস্থ রাখিতে ভাইটামিন বি-কমপ্লেক্স (B-Complex), বিশেষতঃ ভাইটামিন 'বি$_1$' বিশেষভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। খাদ্যে এই সকল ভাইটামিন উপযুক্ত পরিমাণে থাকিলে গা-বমি করা, পেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি সাধারণ অসুস্থতার লক্ষণগুলি দেখা যায় না। এই ভাইটামিন কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করিয়া শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বোধ বৃদ্ধি করে। গর্ভের শেষ মাসে গর্ভিণীর খাদ্যে ভাইটামিন 'কে'-যুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

গর্ভের শেষের তিন মাস স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অন্ততঃ ৩০০ ক্যালরি অধিক তাপ ও শক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়।

একজন গর্ভিণী নারীর গর্ভের শেষার্ধের জন্য ICMR যে পরিমাণ খাদ্য সুপারিশ করিয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

স্বাভাবিকের চেয়ে ৩০০ ক্যালরি অধিক তাপ ও শক্তি	
যেমন অল্প পরিশ্রমী নারীর	১৯০০ + ৩০০ = ২২০০ ক্যালরি
খাদ্যশস্য আরও ৩৫ গ্রাম অধিক	৪১০ গ্রাম + ৩৫ = ৪৪৫ গ্রাম
ডালজাতীয় খাদ্য ১৫ গ্রাম অধিক	৪০ + ১৫ = ৫৫ গ্রাম
সবুজ শাকসবজি স্বাভাবিক পরিমাণ	১০০ গ্রাম
অন্যান্য সবজি ,, ,,	৪০ গ্রাম
দুধ স্বাভাবিকের চেয়ে ১০০ গ্রাম অধিক	১০০ + ১০০ = ২০০ গ্রাম
মূল ও কন্দ স্বাভাবিক পরিমাণ	৫০ গ্রাম
ফ্যাট স্বাভাবিক পরিমাণ	২০ গ্রাম
গুড় চিনি স্বাভাবিকের চেয়ে ১০ গ্রাম অধিক	২০ + ১০ = ৩০ গ্রাম
মোট	৯৪০ গ্রাম

৯৪০ গ্রাম খাদ্য হইতে ১৯০০ + ২৯৩ ক্যালরি তাপ ও শক্তি পাওয়া যাইবে।

স্তন্যদানকারী নারীর সুষম খাদ্য

(Balanced diet for nursing mother)

জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শিশু মাতৃস্তন্য পান করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। খাদ্যের জন্য মায়ের উপরেই তাহাকে নির্ভর করিতে হয়। শিশুর এই খাদ্যের জন্য মায়ের খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। এই সময় নারী যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন তাহা প্রধানতঃ দুইটি উদ্দেশ্য ঃ (১) তাঁহার নিজের দেহের অভাব পূরণের জন্য (২) শিশুর খাদ্য প্রস্তুতির জন্য। শিশুর জন্য মায়ের স্তনে যে দুধের সৃষ্টি হয় উহাতে অন্যান্য দুধের ন্যায় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে। একগ্রাম দুধের প্রোটিন প্রায় দুইগ্রাম উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্যের প্রোটিন হইতে প্রস্তুত হয়। সুতরাং শিশুর খাদ্য এই দুধ প্রস্তুত করিবার জন্য মায়ের খাদ্যে মাছ মাংস ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রাণিজ প্রোটিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়াম এবং লৌহঘটিত খাদ্যদ্রব্য এই সময় প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিতে হয়। এই সময় নারীর ক্যালরির প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। সন্তানের জন্মের পর প্রথম ছয় মাস শিশু একান্তভাবে মাতৃস্তন্যের উপর নির্ভর করে। এই কারণে প্রসূতি নারীর সন্তানের জন্মের পর প্রথম ছয় মাস অতিরিক্ত ৫৫০ ক্যালরি তাপ ও শক্তির প্রয়োজন হয়। তারপর ৬-১২ মাস বয়সে শিশু ধীরে ধীরে বদলি খাদ্যে অভ্যস্ত হইতে থাকে, তাহার মাতৃস্তন্যের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ কমিয়া আসে। এই সময় তাই জননীর স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৪৪০ ক্যালরি অতিরিক্ত তাপ ও শক্তি হইলেই চলে। জননীর অতিরিক্ত তাপ ও শক্তি গ্রহণের মূল নীতিটি হইল তিনি শিশুকে দৈনিক যতটা দুগ্ধ পান করাইবেন তাহার উপরই তাহার প্রয়োজনীয় ক্যালরির পরিমাণ নির্ভর করিবে।

একজন অল্প পরিশ্রমী প্রসূতি নারীর জন্য ICMR নিম্নলিখিত খাদ্য সুপারিশ করিয়াছে।

ক্যালরির পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশী	
শিশু ০-৬ মাস বয়স পর্যন্ত	১৯০০ + ৫৫০ ক্যালরি
শিশুর ৬-১২ মাস বয়স পর্যন্ত	+ ৪০০ ক্যালরি
খাদ্যশস্যের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ৬০ গ্রাম বেশী	৪১০ + ৬০ = ৪৭০ গ্রাম
প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ হইবে ২৫ গ্রাম বেশী	৪৫ + ২৫ = ৭০ ,,
ডাল জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ৩০ গ্রাম বেশী	৪০ + ৩০ = ৭০ ,,
সবুজ শাকসব্জির পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার মত	১০০ ,,
অন্যান্য সব্জির পরিমাণ ,, ,, ,,	৪০ ,,
মূল ও কন্দের ,, ,, ,, ,,	৫০ ,,
দুধের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ১০০ গ্রাম বেশী	১০০ + ১০০ = ২০০ ,,
ফ্যাটের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ১০ গ্রাম বেশী	২০ + ১০ = ৩০ ,,
গুড় চিনির পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে ১০ গ্রাম বেশী	২০ + ১০ = ৩০ ,,
মোট	১০৬০ গ্রাম

১০৬০ গ্রাম খাদ্য হইতে ১৯০০ + ৫২১ = ২৪২১ ক্যালরি তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হইবে।

আমিষ ভোজীরা ৪০ গ্রামের পরিবর্তে ২০ গ্রাম ডাল খাইয়া সঙ্গে প্রতিদিন ১টি করিয়া ডিম এবং সঙ্গে ৩০ গ্রাম মাছ অথবা মাংস গ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অভাব মিটিবে।

একজন অন্তঃসত্ত্বা নারীর চেয়ে প্রসূতি নারীর খাদ্যে কিছুটা পার্থক্য থাকিবে। গর্ভাবস্থার তুলনায় প্রসূতি অবস্থায় লৌহ, ভাইটামিন 'এ', নায়াসিন এবং অ্যাসকরবিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকিবে। গর্ভাবস্থায় এবং শিশুর জন্মের প্রথম ছয় মাস জননীর খাদ্যে ফোলিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশী থাকিবে। শিশুর ৬-১২ মাস বয়সে ফোলিক অ্যাসিড কমাইতে হইবে। ভাইটামিন বি১, বি২ এবং বি১২ এর পরিমাণ উভয়তঃ প্রায় একরকম থাকিবে।

শিশুকে স্তন্যদান বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে নারীর খাদ্য পরিবর্তন করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার খাদ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে। নতুবা দেহে মেদ ও চর্বি সৃষ্টি হইবে এবং obesity রোগের লক্ষণ দেখা দিবে।

ভাইটামিন 'ডি'-এর অভাব পূরণের জন্য প্রত্যহ কয়েক ফোঁটা করিয়া কডলিভার বা শার্কলিভার অয়েলও এই খাদ্যের সহিত গ্রহণ করা যাইতে পারে। স্যালাড হিসাবে প্রত্যহ কিছু সবুজ শাক-সব্জি ও ফলমূল কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া ভাল।

ICMR আমিষভোজীদের ডালের পরিমাণ কমাইয়া প্রত্যহ ১টি ডিম এবং সঙ্গে ৩০ গ্রাম মাছ অথবা মাংস এবং অতিরিক্ত ৫ গ্রাম করিয়া ফ্যাট খাইবার নির্দেশ দিয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ICMR এর নয়া সুপারিশে (১৯৮১ সালে প্রকাশিত) গর্ভিণী নারীর খাদ্যে ফলের কোন উল্লেখ নাই। গর্ভিনী নারীর খাদ্যে অবশ্যই প্রতিদিন ৩০ গ্রাম করিয়া ভাইটামিন-প্রধান ফল থাকা বাঞ্ছনীয়। এই ফল তাহাকে অতিরিক্ত ভাইটামিন ও খনিজ লবণ জোগাইবে।

অনেক গর্ভিণীর গর্ভের প্রথমাবস্থায় গা-বমির ভাব দেখা দেয়। সকালে কার্বো-হাইড্রেট জাতীয় খাদ্যদ্রব্য যথা—রুটি, জেলী, চিনি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি গ্রহণ করিলে এই অসুবিধা দূর হয়।

একটি বিষয় তোমাদের জানা আবশ্যক যে আমরা প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করি তাহার সবটাই দেহে অবশোষিত হয় না এবং কিছুটা নষ্ট হয়। তাই কি শিশু কি অন্তঃসত্ত্বা কি প্রসূতি নারী সকলের জন্য যতটা খাদ্য সুপারিশ করা হয় তাহার চেয়ে কিছুটা বেশী খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। তবেই প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যাইবে।

4. স্থানীয় অল্পমূল্যের খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে সুষম খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতি

(Formulation of low cost balanced diets from locally available cheap foods)

ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণই অতি দরিদ্র। তাহাদের পক্ষে প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি অগ্নিমূল্যের প্রোটিনবহুল খাদ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। এইজন্য খাদ্যে এই সকল দুর্মূল্য প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ কমাইয়া ঐ প্রোটিনের অভাব কোন অল্পমূল্যের খাদ্যদ্বারা পূরণ করিতে পারিলে খাদ্যের মূল্য কম হইবে। খাদ্যের মূল্য কমাইবার জন্য সুষম খাদ্যের উপাদানসমূহ বাদ দেওয়া বা কমানো চলিবে না। সুষম খাদ্যের উপাদানসমূহ অল্পমূল্যের খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করাই অল্পমূল্যের সুষম খাদ্য প্রস্তুতির মূল কথা। ডাল প্রাণিজ প্রোটিনবহুল খাদ্য অপেক্ষা অনেক সস্তা এবং ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন পাওয়া যায়। ডিম, দুধ হইতেও ডালে প্রোটিনের পরিমাণ বেশী। সুতরাং সাধারণ দরিদ্র ব্যক্তির খাদ্যে ডালের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। সয়াবীনে প্রয়োজনীয় সব রকম অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। সুতরাং প্রাত্যহিক খাদ্যে সয়াবীন অন্তর্ভুক্ত করিলেও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে। আমাদের দেশের অধিবাসীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সতর্কতার সহিত যে পরিমাণ খাদ্য একজন স্বাভাবিক পরিশ্রমী, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে সুষম খাদ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।*

খাদ্যশস্য (ভাত, রুটি ইত্যাদি)	২৮৫ গ্রাম
ডাল … …	১০০ গ্রাম
সবুজ শাক-সবজি … …	২০০ গ্রাম
আলু … …	২০০ গ্রাম
কচু … …	১০০ গ্রাম
চিনাবাদাম … …	৫০ গ্রাম
অঙ্কুরিত ছোলা … …	৫০ গ্রাম
তেল … …	৩৫ গ্রাম
গুড়, চিনি … …	৩৫ গ্রাম

* Source : Planning of Balanced Diet, K. Halder, Journal of Indian Medical Association, Vol. 62, (7) 1924.

এখানে দুধ বাদ দিয়া ঐ প্রোটিনের অভাব ডালের পরিমাণ বাড়াইয়া পূরণ করা হইয়াছে। তরি-তরকারি বা সবজির পরিমাণও উপরোক্ত খাদ্যে কিছু বাড়ানো হইয়াছে। ভাত, রুটি ইত্যাদির পরিমাণ কমাইয়া ঐ তাপমূল্যের হ্রাস বাদাম, গুড় ইত্যাদি বাড়াইয়া পূরণ করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, যদিও এই খাদ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম তবুও সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে এই পরিমাণ খাদ্যও আয়ত্তের বাহিরে। কিন্তু তাহাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া প্রাণিজ প্রোটিনের পরিমাণ বাদ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহার ফলে এই খাদ্য-তালিকা বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে অনুপযুক্ত।

5. শিশুর খাদ্য

(Feeding of infants)

উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে শিশু সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান হয় না। জন্মের পর ৬ মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। এই সময় অন্যান্য কৃত্রিম খাদ্যের পরিবর্তে মাতৃদুগ্ধ পান করাইলে শিশু স্বাস্থ্যবান ও নীরোগ হয়।

শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করাইবার নিয়ম ঃ শিশুর জন্মের পর মা ও শিশু উভয়েরই কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম প্রয়োজন। সুতরাং জন্মের পর-মুহূর্তেই শিশুকে দুধ পান করাইতে নাই। সাধারণতঃ জন্মিবার ৬ ঘণ্টা পর শিশুকে স্তন্য পান করান উচিত। এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হইলে ফুটান জল পান করান যাইতে পারে। দুধ যাহাতে শিশু ভালভাবে হজম করিতে পারে সেইজন্য একটি নির্দিষ্ট সময় ব্যবধানে শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করাইতে হয়। শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই উহার ক্ষুধা পাইয়াছে এইরূপ ধারণা ভুল। ক্ষুধা বোধ ছাড়াও শারীরিক অসুস্থতা, বেকায়দায় শোওয়া, অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা লাগা, পেটে বায়ু হইবার ফলে তলপেটে বেদনা অনুভব করা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে শিশু কাঁদিতে পারে। সুতরাং কাঁদিয়া উঠিলেই শিশুকে স্তন্য পান করান উচিত নয়। শিশু দিনে কয়বার খাইবে এবং কতক্ষণ অন্তর খাইবে তাহা নির্ভর করিতেছে শিশুর বয়সের উপর। প্রথম দুইমাস ৩ ঘণ্টা অন্তর মোট ৭ বার; ২ মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যে ৩½ ঘণ্টা অন্তর মোট ৬ বার, ছয় মাসের পর হইতে ৪ ঘণ্টা অন্তর মোট ৫ বার স্তন্য পান করাইতে হয়।

রাত্রে শিশু এবং মা উভয়েরই বিশ্রামের প্রয়োজন। সুতরাং রাত্রে যত কম বার স্তন্য পান করান যায় ততই ভাল। রাত্রে মাঝে মাঝে শিশু জাগিয়া উঠিলে ফুটান জল দেওয়া যাইতে পারে।

উভয় স্তনই অদল-বদল করিয়া শিশুকে পান করান উচিত ; শুধু মাত্র একটি স্তনই চুষিতে দেওয়া উচিত নয়। শিশু প্রতিবারে সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ মিনিট সময় স্তন্য পান করে। কখনও সেই সময় ২০ হইতে ২৫ মিনিট কালও হইতে পারে।

শিশু উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিবার উপায়

(১) স্তন্য পান করাইবার পর যদি শিশুকে তৃপ্ত বলিয়া মনে হয় তবে সে তাহার উপযুক্ত খাদ্য পাইতেছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

(২) ইহা ছাড়া স্তন্য পান করিবার পর সে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িবে এবং নির্বিঘ্নে কয়েক ঘণ্টা ঘুমাইবে।

(৩) উপযুক্ত খাদ্য পাইলে প্রতি সপ্তাহে শিশুর ওজন বৃদ্ধি পাইবে।

মাতৃস্তন্য হইতে উপযুক্ত খাদ্য না পাইলে ঃ

(১) স্তন্য পানের শেষে সে মোটেই তৃপ্ত হইবে না, সর্বদাই নানাভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে।

(২) মেজাজ খিটখিটে হইবে এবং স্তন্য পান করিবার অব্যবহিত পরেই ঘুমাইয়া পড়িবে না।

(৩) ঘুম অধিকক্ষণ স্থায়ী হইবে না এবং মাঝে মাঝে জাগিয়া উঠিয়া কাঁদিবে।

(৪) সন্তোষজনকরূপে তাহার দেহের ওজন বৃদ্ধি পাইবে না। এই অবস্থায় মাতৃস্তন্যের সহিত শিশুকে অন্যান্য খাদ্য খাওয়াইয়া তাহার উপযুক্ত পরিপুষ্টির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শিশুকে মাই ছাড়ান (weaning the baby) ঃ প্রথম পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধই শিশুর আদর্শ খাদ্য। তবে আদর্শ হইলেও শিশুর পুষ্টির সব চাহিদা মেটে না বলিয়া ২।৩ মাস বয়সে শিশুকে কমলালেবু বা মুসাম্বির রস দিতে হয়। তারপর ক্রমশঃ তাহার কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থের চাহিদা বৃদ্ধি হয়। তাই তিন মাস বয়স হইতে শিশুর খাদ্যে ক্রমশঃ ফলের রসের পরিমাণ বাড়াইতে হয় এবং তাহাকে সিরিয়াল দিতে হয়। প্রথমে পাতলা করিয়া দুধ ও সুজির মণ্ড দিতে হয়; তারপর অভ্যস্ত হইলে ঐ মণ্ড ঘন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। সিরিয়ালে অভ্যস্ত হইবার পরে পাঁচ-ছয় মাস হইতে শিশুকে শক্ত খাদ্য দেওয়া দরকার। শিশুর পাচন যন্ত্র, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকলার বিকাশ, তাহার হাড় ও পেশীর গঠন ও বৃদ্ধির জন্য শুধু দুধ এবং সিরিয়ালই যথেষ্ট নয়, দরকার নানারকম মিশ্র খাদ্যের। এই কারণেই আমাদের দেশে ছয় মাস বয়সে শিশুর অন্নপ্রাশনের রীতি চলিয়া আসিতেছে। নানাকারণে শিশুর অন্নপ্রাশন বিলম্বিত হইলে তাহার অপুষ্টিতে ভোগা সম্ভব। প্রথমে দুধের সঙ্গে গলা ভাত, চিনি, পরে আস্তে আস্তে সুসিদ্ধ সবজি যেমন গাজর, আলু, কড়াইশুঁটি, পেঁপে, পাকা কুমড়া ইত্যাদি চটকান, নরম ফল ইত্যাদি দিতে হয়। ক্রমশঃ ডিমের কুসুম এবং নরম সুসিদ্ধ মাছও শুরু করা উচিত। ৭-৮ মাসের শিশুকে টোস্ট, তরকারি এবং মাছ-মাংসের সুপ দেওয়া যায়। ৯-১০ মাস বয়সেই শিশু নরম ভাত, সুসিদ্ধ তরকারি, চটকান মাছ-মাংস খাইতে সমর্থ হয়। মাছ-মাংসের বদলে ২০-৩০ গ্রাম ছানাও দেওয়া যায়। শক্ত খাবার দিতে হয় দুধের আগে এবং দুধেরই মত বাঁধা সময়ে। শিশুর বৃদ্ধির পক্ষে দুধের পরেই ডিমের স্থান।

এক বছর বয়সে শিশু যখন প্রায় সব রকম শক্ত খাবারে অভ্যস্ত তখন শক্ত খাবারের সঙ্গে দিনে দুই বার বুকের দুধ এবং দুই কাপ মত গরুর দুধ* পান করাইতে হয়।

মনে রাখা দরকার যে প্রোটিন-ক্যালরি এবং 'এ' ভাইটামিনের অভাবে প্রাক্-কোয়াশিওরকর, কোয়াশিওরকর, রাতকানা, ক্যারাটেম্যালেশিয়া ইত্যাদি মারাত্মক রোগের সূত্রপাত হয় মায়ের দুধ ছাড়ানোর সময় হইতে।

মাতৃদুগ্ধ বা অন্যান্য বিকল্প খাদ্য (Breast feeding versus artificial feeding)

জন্মের পর প্রথম পাঁচ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর শ্রেষ্ঠ খাদ্য হইল মাতৃদুগ্ধ। তখনো অপরিণত হজম শক্তির বিচারে মাতৃদুগ্ধের উপাদানই তাহার পক্ষে সবচেয়ে

* ICMR ১ বৎসর বয়স্ক শিশুকে ৩০০ গ্রাম দুধ সুপারিশ করিয়াছে।

উপযোগী। অনেক সময় মা অসুস্থ হইলে বা অন্যান্য কারণে শিশুকে স্তন্য পান না করাইয়া গরুর দুধ, জমানো টিনের দুধ বা বোতলের খাদ্য ইত্যাদি খাওয়াইতে হয়। যে সকল কারণে শিশুকে এই বিকল্প খাদ্য খাওয়াইতে হয় তাহা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

(১) মা যখন টাইফয়েড, যক্ষ্মা, রক্তাল্পতা ইত্যাদি বিভিন্ন রোগে অনেক দিন হইতেই ভুগিতে থাকেন,

(২) মাতৃদুগ্ধের স্বল্পতা ঘটিলে,

(৩) মা দ্বিতীয়বার গর্ভবতী হইলে,

(৪) মাকে বাহিরের কাজে যাইতে হইলে।

এই সকল বিভিন্ন অবস্থার উদ্ভব হইলে শিশুকে মাতৃ-দুগ্ধের বদলে বা মাতৃদুগ্ধের সহিত অন্যান্য খাদ্যও খাওয়াইতে হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে গরুর দুধই খাওয়ান হইয়া থাকে। কারণ উহা সহজলভ্য। গরুর দুধে নানা দূষিত পদার্থ থাকিতে পারে। সুতরাং না ফুটাইয়া উহা কখনও শিশুকে পান করান উচিত নয়। গরুর দুধের উপাদান মাতৃদুগ্ধের অনুরূপ নয়। এই কারণে উহার সহিত পরিমাণমত জল মিশাইয়া শিশুকে খাওয়াইতে হয়। জলশূন্য টাটকা দুধ প্রথম প্রথম শিশুর পেটে সহ্য হইবে না। উভয় প্রকার দুধের প্রতি ১০০ গ্রামের উপাদানসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

উপাদান	গোদুগ্ধ	মাতৃদুগ্ধ
ক্যালরি	৬৭	৬৪
প্রোটিন	৩·২ গ্রাম	১·১ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	৪·৪ গ্রাম	৭·৪ গ্রাম
ফ্যাট	৪·১ গ্রাম	৩·৪ গ্রাম
ক্যালসিয়াম	১২০ মিলিগ্রাম	২৮ মিলিগ্রাম
ফসফরাস	৯০ মিলিগ্রাম	১১ মিলিগ্রাম
লোহা	০·২ মিলিগ্রাম	০·১ মিলিগ্রাম
'এ' ভাইটামিন/ক্যারটিন	১৭৪ ইঃ ইউনিট	১৩৭ ইঃ ইউনিট
বি১	০·০৫ মিলিগ্রাম	০·০২ মিলিগ্রাম
বি২	০·১৯ মিলিগ্রাম	০·০২ মিলিগ্রাম
নায়াসিন	০·১ মিলিগ্রাম	—
ভাইটামিন সি	২	৩

গরুর দুধের চেয়ে মাতৃদুগ্ধে প্রোটিনের পরিমাণ কম। গরুর দুধের প্রধান প্রোটিন ক্যাসিন এবং মাতৃদুগ্ধের প্রধান প্রোটিন ল্যাক্টো অ্যালবুমিন। এজন্য মাতৃদুগ্ধ হজম করা শিশুর পক্ষে সহজ।

মাতৃদুগ্ধের ফ্যাটি অ্যাসিডও শিশুর পক্ষে হজম করা সহজ। স্নেহপদার্থের পরিমাণ গোদুগ্ধে সামান্য বেশী কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ তুলনায় বেশী বলিয়া মাতৃদুগ্ধের ক্যালরি মূল্য বেশী।

মাতৃদুগ্ধে এমন কিছু এনজাইম থাকে গোদুগ্ধে যাহার পরিমাণ খুব কম এবং দুধ ফোটাইবার সময় উহার অনেকটা আবার নষ্ট হইয়া যায়।

মাতৃদুগ্ধের চিনি শিশুর অন্ত্রের মধ্যে বীজাণু প্রতিরোধক শক্তি সৃষ্টি করে। গোদুগ্ধে ঠিক তাহার বিপরীত।

লোহা, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি প্রয়োজনীয় খনিজগুলি অবশ্য গোদুগ্ধেই বেশী। লোহার পরিমাণ উভয় দুগ্ধে কম এবং প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

গরুর দুধের বি-বর্গীয় ভাইটামিন এবং সি ভাইটামিনটি ফোটানর সময় কিছুটা নষ্ট হয়, মায়ের দুধে সে সম্ভাবনা থাকে না।

মায়ের দুধ হইতে শিশু পায় রোগ প্রতিরোধক শক্তি বা অনাক্রম্যতা। গর্ভাবস্থায় মাকে টিটেনাসের টিকা দিলে মাতৃদুগ্ধ মারফত অনাক্রম্যতা শক্তি সঞ্চারিত হইয়া শিশুকে দুই তিন মাস পর্যন্ত রক্ষা করে।

মাতৃদুগ্ধের আর একটি মস্ত গুণ হইল ঝিনুক বাটি বা বোতল-টিট হইতে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না।

গরুর দুগ্ধ ব্যতীত অন্যান্য খাদ্য যথা ছাগদুগ্ধ, টিন ও বোতলের খাদ্য শিশুকে খাওয়ান হয়। বিভিন্ন প্রকারের টিনের খাদ্যের মধ্যে ল্যাক্টোজেন, ল্যাক্টোডেক্স, গ্ল্যাক্সো ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল খাদ্য নির্দোষ এবং প্রস্তুত প্রণালীও সহজ।

মাতৃদুগ্ধ ও কৃত্রিম খাদ্যের তুলনা

(১) শিশুর খাদ্য অত্যধিক গরম বা ঠাণ্ডা হওয়া উচিত নয়। সাধারণ শরীরের যে উত্তাপ সেই উত্তাপের খাদ্যই শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শিশু মাতৃদুগ্ধ সর্বদাই দেহের উত্তাপে পায়, কিন্তু অন্যান্য খাদ্য দেহের উত্তাপে থাকে না, উত্তপ্ত করিয়া লইতে হয়। এইজন্য অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা মাতৃদুগ্ধ শিশুর বেশী উপযোগী।

(২) অন্যান্য খাদ্য রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত হইবার আশঙ্কা থাকে। মাতৃদুগ্ধে এই আশঙ্কা নাই।

(৩) অন্যান্য খাদ্য স্বাভাবিক অবস্থায় শিশুর পরিপাক শক্তির ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে। এইজন্য এই সকল খাদ্য বিভিন্নভাবে প্রস্তুত করিয়া শিশুর উপযোগী করিয়া লইতে হয়। মাতৃদুগ্ধের এইরূপ কোন পূর্ব-প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। ইহা শিশু সরাসরি হজম করিতে পারে।

(৪) অন্যান্য খাদ্য গ্রহণে শিশুর কোষ্ঠকাঠিন্য ও নানারূপ ব্যাধির সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। মাতৃদুগ্ধে এই সকল রোগ হইবার সম্ভাবনা অনেক কম।

শিশুর খাদ্য-তালিকা

১ম মাস ঃ	স্তন্যপান—৩ ঘণ্টা অন্তর, দিনে ৭ বার। দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষে স্তন্যপানের শেষে ২।১ ফোঁটা করিয়া কডলিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল খাওয়াইতে অভ্যাস করিবে। শিশু খাইতে না চাহিলে স্তনের দুধের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। তৃতীয় অথবা চতুর্থ সপ্তাহে এই পরিমাণ ২।১ ফোঁটা হইতে বাড়াইয়া অর্ধ চামচ (ছোট) করিতে হয়। তৃতীয় সপ্তাহে শিশুকে স্তন্য পান করাইবার ১½ ঘণ্টা পরে ½ চামচ কমলালেবুর রসের সহিত ½ চামচ ফুটান জল মিশাইয়া পান করিতে দাও। ৪র্থ সপ্তাহে ইহা বাড়াইয়া ২ চামচ করিতে পার। কডলিভার অয়েল পেটে সহ্য না হইলে (বিশেষ করিয়া গরমের সময়) কোন ডাক্তারের পরামর্শ লইয়া ভাইটামিন জাতীয় ঔষধ খাওয়ান যাইতে পারে।
২য় মাস ঃ	স্তন্যপান—দিনে ৬ বার ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কডলিভার অয়েলের পরিমাণ বাড়াইয়া ¾ চামচ কর। এই অয়েল ২।৩ বারে খাওয়াইবে। কমলালেবুর রসের পরিমাণ বাড়াইয়া ২ আঃ বা ১ ছটাক কর। ইহা সমপরিমাণ জলের সহিত মিশাইয়া ৩।৪ বারে দুধ খাইবার ১½ ঘণ্টা পর পর খাওয়াইবে। কমলালেবুর বদলে টমেটোর রস খাওয়াইলে দ্বিগুণ পরিমাণ দিবে।
৩য় মাস ঃ	স্তন্য পান—দিনে ৬ বার, ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কড লিভার অয়েলের পরিমাণ বাড়াইয়া ১ চামচ (ছোট) কর। ৩।৪ বার দিবে। কমলালেবুর রস বাড়াইয়া ৩ আঃ বা ১½ ছটাক কর। মাঝে মাঝে জল ছাড়া শুধু রস খাওয়াইবে। ৩য় মাস হইতে সিরিয়াল দিতে পার।
৪র্থ মাস ঃ	স্তন্যপান—দিনে ৬ বার, ৩½ ঘণ্টা অন্তর। কড লিভার ও কমলালেবুর রস ৩ মাসের ন্যায়। আগে সিরিয়াল না দিয়া থাকিলে এই সময় পাতলা সুজির মন্ড খাওয়াইতে অভ্যাস করাইতে হইবে। দিনে একবার প্রথমে ১ চামচ (ছোট), ধীরে ধীরে বাড়াইয়া ২।৩ চামচও করা যাইতে পারে।
৫ম মাস ঃ	রাত্রি দশটার পরে মাতৃ-স্তন্য বন্ধ করিয়া দাও। রাত্রে শিশু জাগিয়া উঠিলে দুধের পরিবর্তে ফুটান জল খাইতে দিবে। কড লিভার অয়েল এবং কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। গাজর, পালং, লেটুস, বাঁধাকপি ইত্যাদি উত্তমরূপে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দাও। সিদ্ধ করিবার সময় প্যান বা কড়াইয়ের মুখ ঢাকিয়া রাখিবে, যাহাতে ভাইটামিন নষ্ট হইতে না পারে। সিদ্ধ সবজিগুলি থেঁতলাইয়া একটু লবণের সহিত মিশাইয়া দিলে প্রথমে ২ চামচ এবং পরে বাড়াইয়া ৩।৪ চামচ করা যাইতে পারে।

শিশুর খাদ্য তালিকা

৬ষ্ঠ মাস ঃ	মাতৃস্তন্য, কড লিভার অয়েল, কমলালেবুর রস ও শাকসবজির রস ৫ম মাসের ন্যায়।
৭ম মাস ঃ	স্তন্য পান প্রয়োজন মত কমাইতে পার। কড লিভার অয়েল, কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। এই সময় সিদ্ধ শাকসবজি ব্যতীত দিনে একবার তরকারির স্যুপও খাওয়াইবে। সিদ্ধ ডিমের কুসুম (সাদা অংশ বাদে) বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইবে। প্রথমে ১ চামচ হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে বাড়াইবে। সাত আট মাসের শিশুকে টোস্ট এবং মাছমাংসের স্যুপও দেওয়া যায়।
৮ম মাস ঃ	কডলিভার অয়েল, কমলালেবুর রস পূর্বের ন্যায়। শাকসবজির পরিমাণ বাড়াও। আলুর হালুয়া, ভাত ও আলু চট্‌কান ইত্যাদি দাও। ডিমের পরিমাণ বাড়াইয়া প্রত্যহ ১টি করিয়া কুসুম খাওয়াইবে। সুজির মণ্ড জল না মিশাইয়া শুধু দুধের সাহায্যে প্রস্তুত কর এবং ইহার পরিমাণ বাড়াও।
৯ম-১২শ মাস ঃ	আহারের সময় পরিবর্তন কর। দিনে ৪ বার খাওয়াইবে ; সকাল ৬টায়, ৭½টায়, দুপুর ১২টায় এবং সন্ধ্যা ৬টায়।
সকাল ৬টায় ঃ	কমলালেবুর রস ঃ ৩ আঃ বা ১½ ছটাক। পাকা কলা চটকান ১টি।
সকাল ৭½টায় ঃ	প্রাতরাশ ঃ গরুর দুধ ৮ আউন্স, এক টুকরা পাঁউরুটি, শাকসবজি বা তরকারির স্যুপ ১-২ চামচ (বড় চামচের), কড লিভার অয়েল ১ চামচ (ছোট)।
দুপুর ১২টায় ঃ	মধ্যাহ্ন ভোজন ঃ একটি ডিমের কুসুম; ২-৪ চামচ (বড়) ভাত এবং আলু সিদ্ধ, ২-৪ চামচ তরকারির স্যুপ, ৮ আউন্স দুধ।
সন্ধ্যা ৬টায় ঃ	সান্ধ্য-ভোজন ঃ ভাত এবং আলু সিদ্ধ ২-৪ চামচ (বড়), দুধ ৮ আউন্স। আপেল, আম ইত্যাদি, বিভিন্ন ফল নরম করিয়া ১-২ চামচ (বড়)।

প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণ ফুটান জল পান করান উচিত। আহারের অন্ততঃ একঘণ্টা পর জল দিবে।

6. খাওয়াইবার ভুলের দরুন শিশুর অপরিপুষ্টি

(Defective feeding of infants as a cause of malnutrition)

আমাদের দেশে শিশুকে খাওয়ানোর ব্যাপারে নানা রকম ভুল-ভ্রান্তি দেখা যায়। ফলে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ শরীরের পরিবর্তে শিশু ক্রমশঃ দুর্বল, ক্ষীণ ও রুগ্ন হইয়া পড়ে। অনেক মায়ের ধারণা শিশুকে পেট ভর্তি খাইতে দিলেই শিশু ঠিকমত বাড়িয়া উঠিবে। তাহারা খাদ্যের গুণাগুণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে না। দেখা যায় সারাদিনে শিশুকে যাহা খাইতে দেওয়া হয় তাহার প্রায় সবটুকুই কার্বোহাইড্রেট। প্রোটিন, ভাইটামিন ও খনিজ পদার্থের পরিমাণ উহাতে হয় তো সামান্যই থাকে। কিন্তু শিশুর যথাযথ বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য কার্বোহাইড্রেটের তুলনায় প্রোটিন, ভাইটামিন ও ধাতব লবণের গুরুত্বই বেশী। শিশু তাহার খাদ্যে প্রয়োজনীয় সকল উপাদানগুলি সঠিক পরিমাণে না পাইলে তাহার দেহের যথাযথ বৃদ্ধি হইবে না এবং সে নানা রকম রোগে আক্রান্ত হইবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রথম কয়েক মাস তাহাকে প্রধানতঃ মাতৃদুগ্ধের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মাতৃদুগ্ধ বা গোদুগ্ধ আদর্শ খাদ্য হইলেও সম্পূর্ণ খাদ্য নয়। ইহাতে লৌহ ও ভাইটামিন 'সি' সামান্য পরিমাণ থাকে এবং শিশুর প্রয়োজনের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। এই জন্য ৩।৪ মাস বয়স হইতেই শিশুকে ফলের রস প্রভৃতি খাওয়াইয়া ঐ দুইটি উপাদানের অভাব পূরণ করিতে হয়। যদি তাহা না করা হয় তবে লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা এবং ভাইটামিন 'সি'র অভাবে ক্ষুধামান্দ্য, খিটখিটে মেজাজ ও ওজন হ্রাস ঘটে। ভাইটামিন 'ডি'ও দুধে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে না এবং কড-লিভার অয়েল বা শার্ক-লিভার অয়েল বা ঐ জাতীয় কোন খাদ্য হইতে ঐ ভাইটামিনের অভাব পূরণ করিতে হয়। তাহা না হইলে ভাইটামিন 'ডি'এর অভাবে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস ধাতব লবণের মেটাবলিজমে ব্যাঘাত ঘটে এবং শিশু 'রিকেট' রোগে আক্রান্ত হয়। তা ছাড়া শিশু যখন মাতৃদুগ্ধের উপর নির্ভর করে তখন মায়ের খাদ্য ও স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। আমাদের দেশে এই দিকে প্রায় কোন নজরই দেওয়া হয় না। ফলে রোগা ও দুর্বল মায়ের সন্তান রোগা ও দুর্বল ছাড়া আর কি হইতে পারে? খাদ্যের অভাবে অনেক মায়ের দুধ শুকাইয়া যায়। শিশু দুধের অভাবে দিন দিন রুগ্ন হইতে থাকে। এছাড়া শিশুর খাওয়ানোর ব্যাপারে আরেক ধরনের বিভ্রান্তি দেখা যায়। অনেক বাবা-মা আদর করিয়া শিশুকে যখন তখন খাইতে দেন দেখা যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে শিশুটি হয় তো তিনবার—একবার ঠাকুমার সঙ্গে, একবার বাবার সঙ্গে এবং একবার মায়ের সঙ্গে খাইতে বসে। ইহার ফলে শিশুর হজমের গোলমাল দেখা দেয় এবং লিভারটি অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং শিশুকে যখন তখন খাইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রতিদিন সময়মত ও পরিমাণ মত খাইতে দিলে শিশু সুস্থ ও সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়। তাছাড়া শিশুকে প্রতিদিন যথেষ্ট জলপান করানোর অভ্যাস করা দরকার। ইহাতে শরীরের দূষিত পদার্থসমূহ ঘাম ও প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যাইবে এবং শরীর সুস্থ থাকিবে।

আমাদের দেশের National Institute of Nutrition, এই ব্যাপারে ব্যাপক পরীক্ষা চালাইয়া দেখিয়াছেন যে ১—৬ বৎসরের শিশুদের মধ্যে পুষ্টির অভাব অধিক দেখা যায় এবং এই পুষ্টির অভাব প্রধানতঃ তিন প্রকারের : (১) প্রোটিন ও ক্যালরি-

জনিত পুষ্টির অভাব ঃ শিশুদের প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য প্রায় ১০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে খাদ্য শিশুদের খাইতে দেওয়া হয় তাহাতে প্রতি কিলোগ্রাম দেহের ওজনের জন্য উহারা ৭০—৭৫ ক্যালরি শক্তি পায়। প্রোটিনের পরিমাণ তেমন কম নয়, কিন্তু যে ধরনের খাদ্য উহাদের খাইতে দেওয়া হয় তাহাতে প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনই থাকে এবং ইহা দেহ গঠনে তেমন উপযোগী নয়। প্রোটিন-ক্যালরি ম্যালনিউট্রিশানের ফলে অনেক শিশু কোয়াসিওরকর ও ম্যারাস্মাস নামক দুইটি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। (২) ভাইটামিন 'এ' ঘটিত খাদ্যের অভাব ঃ এই ভাইটামিনের অভাবের ফলে অনেক শিশু অল্প বয়সেই অন্ধ হইয়া যায়। এই অন্ধ শিশুর সংখ্যাও আমাদের দেশে কম নয়। (৩) লৌহ-ঘটিত খাদ্যের অভাব ঃ খাদ্যে উপযুক্ত লৌহের অভাবের ফলে অনেক শিশু রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। সরকার এই অপুষ্টি দূর করিবার জন্য কতকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়াছেন। এই সম্বন্ধে অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে।

7. রোগীর পথ্য প্রস্তুতি (Preparation of simple therapeutic diets)

আমরা অসুস্থ হইয়া পড়িলে স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্তন করিয়া বিশেষ ধরনের খাদ্য ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সাধারণভাবে রোগীর এই গ্রহণযোগ্য খাদ্যকে পথ্য বলে। কোন কোন রোগে খাদ্য যেমন পথ্যরূপে তেমনি ঔষধরূপেও কাজ করে। যেমন অতিরিক্ত রোগা কিংবা অতিরিক্ত মোটা লোকের চিকিৎসা শুধু খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াই করা যায়। যদি তাহারা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া না থাকে তবে আর ঔষধের প্রয়োজন হয় না। আবার কোন কোন রোগে ঔষধের সঙ্গে উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা না করিলে শুধু ঔষধে তেমন উপকার হয় না। যেমন ম্যারাসমাস ও কোয়াশিওরকরে উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন, নেফ্রাইটিসে আবার প্রোটিন নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়, কিংবা যেমন শোথ রোগে হাত-পা ফুলিয়া গেলে খাদ্যে লবণ বন্ধ করিতে হয়। এমন অনেক রোগ আছে পথ্য যেখানে ঔষধের ভূমিকা গ্রহণ করে। কোয়াশিওরকর, অ্যানিমিয়া, বহুমূত্র, জণ্ডিস, হজমের গোলমাল ইত্যাদিতে সঠিক পথ্য না হইলে রোগ নিরাময় করা সম্ভব হয় না। সুতরাং রোগ চিকিৎসায় পথ্য দুইভাবে কাজ করিতে পারে—(১) শুধু পথ্যরূপে এবং (২) পথ্য ও ঔষধরূপে।

সুস্থ ব্যক্তির খাদ্যের মতই রোগীর পথ্যও প্রধানতঃ তিনটি কাজ করে ঃ—

(১) প্রথমতঃ ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে, (২) দ্বিতীয়তঃ পেশীসমূহ গঠনে সাহায্য করে ও দেহে উত্তাপ সঞ্চার করে এবং (৩) দেহকে সুস্থ ও সবল করিয়া তুলিতে সাহায্য করে। সুস্থ ব্যক্তির মতই রোগীর পথ্যও হইবে সুষম অর্থাৎ উহাতে প্রয়োজনীয় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট, খনিজ লবণ, ভাইটামিন ও জল থাকা চাই। তবে রোগের প্রকৃতি এবং রোগীর অবস্থা অনুসারে উহাকে পরিবর্তিত এবং প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে হয়। বস্তুতঃ কোন কোন রোগে পথ্যই রোগমুক্তির প্রধান হাতিয়ার। যে কোন ব্যাধিতেই পথ্য হইবে সহজপাচ্য, পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও আকর্ষণীয়।

পথ্যের উদ্দেশ্য হইল ঃ

(১) পুষ্টির মান বজায় রাখা ;

(২) কোন খাদ্যোপাদানের ঘাটতি হইলে তাহা পূরণ করা ;
(৩) প্রয়োজনবোধে বিশেষ উপাদানকে নিয়ন্ত্রিত করা ;
(৪) বিপাকক্রিয়ার সাহায্যের জন্য প্রয়োজনমত পথ্য রদবদল করা ;
(৫) দেহের ক্ষয় পূরণ করা ;
(৬) দেহের ওজন বাড়ান অথবা কমান ;
(৭) রোগ প্রতিষেধে সাহায্য করা।

পথ্যের শ্রেণীবিভাগ ঃ

রোগীর অবস্থা অনুসারে নানা রকম পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে যেমন সম্পূর্ণ জলীয় পথ্য যথা ডাব, মিছরির সরবত, বার্লি, কাপড়ে ছাঁকা ফলের রস ইত্যাদি। আবার তরল পথ্য যেমন, দুধ, ঘোল, সুপ কিংবা অর্ধ-তরল পথ্য যেমন ভাত বা চিড়ার মণ্ডমিশ্রিত দুধ, দুধ-সুজি, এগ-ফিলিপ ইত্যাদি। অপারেশনের পরে অনেক সময় রোগীকে অবশেষহীন পথ্য অর্থাৎ যে পথ্যে বিশেষ কোন বর্জ্যপদার্থ থাকে না—দেওয়া হয়। ডিম, পাঁউরুটি, মাখন, ছোট মাছ, সবজি কিংবা মাংসের সুপ, কাপড়ে ছাঁকা ফলের রস ইত্যাদি এইরূপ পথ্যের অন্তর্গত। গ্যাসট্রাইটিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদি রোগে রোগীকে অনুত্তেজক খাদ্য যেমন দুধ, ডিম, মাখন, ছোট মাছ সিদ্ধ, গলা ভাত ইত্যাদি খাবার দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত রোগীর প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যোপাদানগুলি কখন বাড়ান কখন কমান আবার কখন বা নিয়ন্ত্রণ বা সম্পূর্ণ পরিহার করা দরকার হইয়া পড়ে। যেমন জ্বরে, কোলাইটিসে কিংবা রোগমুক্তির পরে উচ্চ ক্যালরিযুক্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয় তখন রোগীকে ১০০-১৫০ গ্রামের মত ফ্যাট এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য যেমন, গুড়, চিনি, দুগ্ধজাত দ্রব্য, সঙ্গে ভাত ও রুটির পরিমাণ বাড়াইয়া দিয়া ক্যালরির প্রয়োজন মিটাইতে হয়। আবার গল ব্লাডার, জণ্ডিস ও লিভারের অসুখে. আমাশয় ও ক্রনিক কোলাইটিসে, শিশুদের পেটের গোলমালে চিকিৎসকরা ফ্যাট-নিয়ন্ত্রিত পথ্য সুপারিশ করিয়া থাকেন। তেমনি কিডনির অসুখ, হার্টের অসুখ, সিরোসিস অব লিভার, হাইপারটেনসনে এবং গর্ভাবস্থার কোন কোন অসুস্থতায় লবণ নিয়ন্ত্রণ কিংবা লবণহীন খাদ্য গ্রহণ আবশ্যক হইয়া পড়ে।

পথ্যের সাহায্যে রোগ নিরাময় করাকেই Diet Therapy বলে।

নিম্নে কয়েকটি সাধারণ রোগ ও ঐ সকল রোগে যে ধরনের খাদ্য ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল।

জ্বরে খাদ্য ব্যবস্থা (Diet in fever) ঃ সকল রোগে একই প্রকার খাদ্য ব্যবস্থা হইতে পারে না। বিভিন্ন রোগের খাদ্য ব্যবস্থাও বিভিন্ন। যেমন যক্ষ্মা রোগীর খাদ্য ব্যবস্থা এবং আমাশয় ও অজীর্ণ রোগীর খাদ্য ব্যবস্থা একরূপ হইতে পারে না। এই সকল রোগে দেহের উত্তাপের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। আবার টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, সর্দিজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি রোগে প্রধানতঃ দেহের উত্তাপ বেশ বৃদ্ধি পায়। এইজন্য এই সকল রোগ জ্বর-সংযুক্ত রোগ। এই জ্বর-যুক্ত রোগীর পথ্যের ব্যবস্থা করিতে কয়েকটি মূল নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়। নিম্নে এই সকল মূলনীতিসমূহ আলোচনা করা হইল ঃ

প্রাচীনকালে জ্বর হইলেই চিকিৎসকেরা পথ্য হিসাবে প্রধানতঃ উপবাসের ব্যবস্থা করিতেন। তাহাদের ধারণা ছিল রোগীকে উপবাসে বা অনশনে রাখিলেই ধীরে ধীরে দেহের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিবে এবং রোগী সুস্থ হইয়া উঠিবে। রোগের প্রথম অবস্থায় ২/১ দিন অবশ্য রোগীকে উপবাসে রাখিয়া শুধু জলপান এবং সঙ্গে কিছু কমলালেবু ও কাগজি লেবুর রস খাইতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। কারণ দেখা যায় জ্বর হইলে সাধারণতঃ পরিপাক শক্তি হ্রাস পায়। সুতরাং তখন কোন খাদ্য খাইলে পরিপাক ক্রিয়ায় বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া অবস্থা আরও জটিল হইতে পারে। কিন্তু জ্বরের রোগীকে বেশীদিন অনশনে রাখা আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে জ্বরের সময় শরীরে প্রোটিন উপাদানগুলি ক্ষয় হইয়া নাইট্রোজেনরূপে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। দেহের উত্তাপ যতই বৃদ্ধি পায় মূত্রে এই নাইট্রোজেনের পরিমাণও ততই বাড়িতে থাকে, অর্থাৎ জ্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রোটিন দ্রুত ক্ষয় হইতে থাকে, এইজন্যই প্রবল জ্বরে রোগী অল্পদিনের মধ্যেই বেশ দুর্বল হইয়া পড়ে। তাছাড়া জ্বরে যে দাহ হয় তাহাতে ক্যালরির খরচও বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষাদ্বারা জানা গিয়াছে যে জ্বরের রোগীর ক্যালরির চাহিদা স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ বেশী বৃদ্ধি পায়। সুতরাং রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়া থাকিলেও প্রত্যহ একজন কর্মঠ লোকের যে পরিমাণ ক্যালরির প্রয়োজন হয় প্রায় সেই পরিমাণ ক্যালরিই অর্থাৎ প্রায় ২৮০০/৩০০০ ক্যালরির প্রয়োজন হয়। সুতরাং রোগীর উপযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া এই ক্ষয় পূরণ করিয়া উহার রোগ প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি না করিলে সে রোগের সহিত যুঝিতে পারিবে না। এইজন্যই আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে রোগীকে দীর্ঘদিন অনশনে রাখিবার নীতি প্রচলিত নাই।

এবার দেখা যাক রোগীর জন্য কি রকম খাদ্য ব্যবস্থা করা উচিত। পূর্বে বলা হইয়াছে যে জ্বরে আমাদের শরীরে প্রোটিন দ্রুত ক্ষয় হইতে থাকে। সুতরাং সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় যে এই ক্ষয় পূরণের জন্য রোগীকে বেশী করিয়া মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি প্রোটিনজাত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। আপাতদৃষ্টিতে ইহা সত্য বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে তাহা চলে না। কারণ রোগের বিষে শরীরের কোষগুলি তখন এই সকল প্রোটিনজাত খাদ্য গ্রহণ করিতেই পারে না। বরং এই সকল খাদ্য খাইতে দিলে বিপরীত ফল হয়। ঐ সকল প্রোটিন রক্তে জমিয়া লিভার (যকৃত) ও কিডনিকে (বৃক্ক) আরও জখম করে। তবে শরীরের এই প্রোটিনের ক্ষয় নিবারণের উপায় কি ? প্রধান উপায় রোগীর খাদ্যে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের ব্যবস্থা করা। কার্বোহাইড্রেটকে প্রোটিন রক্ষাকারী খাদ্য বলে। সুতরাং জ্বরের সময় এই কার্বোহাইড্রেট যেমন দেহের অতিরিক্ত ক্যালরির চাহিদা পূরণ করিবে তেমনি আবার শরীরের প্রোটিনকে অতিরিক্ত ক্ষয়ের হাত হইতে রক্ষা করিবে। কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বাড়াইলেই মূত্রে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কমিয়া আসিবে। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে যে টাইফয়েড রোগে প্রতিদিন প্রায় ৩০০০।৫০০০ ক্যালরি মূল্যের কার্বোহাইড্রেট খাইতে দিলেই ঐ রোগীর দেহের প্রোটিনের ক্ষয় নিবারণ হয়। খাদ্যে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইয়া এই সময় দেহের প্রোটিনকে রক্ষা করা যায় না। কি জাতীয় কার্বোহাইড্রেট রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। সেলুলোজ জাতীয় কার্বোহাইড্রেট

রোগীর উপযুক্ত নয়; তাছাড়া ভাত, রুটি, ইত্যাদি স্টার্চ জাতীয় কঠিন খাদ্যও রোগীর হজমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। কারণ এই সময় পরিপাক শক্তি প্রায়ই দুর্বল থাকে। সুতরাং কঠিন খাদ্যের পরিবর্তে তরল খাদ্যই রোগীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এইজন্য বার্লি-ওয়াটার বা বার্লি-জলই রোগীর পথ্য হিসাবে বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে। যদি এই বার্লি-জলও হজম করিতে রোগীর অসুবিধা হয় তবে গ্লুকোজের জল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। গ্লুকোজ হজম করিতে হয় না। উহা সরাসরি কাজে লাগে।

কার্বোহাইড্রেট রোগীর প্রধান খাদ্য হইলেও প্রোটিন জাতীয় খাদ্যও রোগীর দেহের ক্ষয় নিবারণের জন্য প্রয়োজন হয়। তবে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় রুগ্ন অবস্থায় প্রোটিনের চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পায় না। কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাদ্যের দ্বারা রোগীর প্রোটিনের অভাব পূরণ করা যায় না। তবে কিরূপে প্রোটিনের অভাব পূরণ হইবে? দুধের সাহায্যেই প্রোটিনের অভাব পূরণ করিতে হয়। দুধের প্রোটিন অতি সহজ-পাচ্য এবং রুগ্ন অবস্থায়ও দেহ এই প্রোটিন কাজে লাগাইতে পারে। যদি হজমশক্তির কোন গোলযোগ না থাকে তবে প্রবল জ্বরের সময়ও রোগীকে অনায়াসে দুধ খাইতে দেওয়া যায়। প্রতিদিন রোগীর হজমশক্তি অনুযায়ী এক সের হইতে দেড় সের দুধ খাইতে দেওয়া যায়। দুধের প্রধান গুণ এই যে ইহাতে অন্যান্য ধাতব লবণ ও ভাইটামিনও যথেষ্ট পরিমাণে আছে। সুতরাং প্রতিদিন ঐ পরিমাণ দুধ খাইতে দিলে রোগীর খনিজ লবণ ও ভাইটামিনের চাহিদাও অনেকটা পূরণ হইবে। শুধু দুধ বা শুধু বার্লি-জল না দিয়া দুধ-বার্লি একত্রে মিশাইয়া ইহার সহিত কিছু চিনি যোগ করিলে খাইতে যেমন সুস্বাদু হয় তেমনি খাদ্য-মূল্য ও ক্যালরির দিক হইতেও অতি উচ্চ শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত হয়।

রোগের সময় ধাতব লবণের চাহিদার কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং রোগীর খাদ্যে প্রতিদিন যেমন খনিজ লবণের ব্যবস্থা করিতে হয় তেমনি করিতে হইবে। ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা এই সময় বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পায়। রোগের আক্রমণে বিশেষতঃ ভাইটামিন 'এ', 'বি' এবং 'সি'-র বিশেষ করিয়া অভাব ঘটে। সুতরাং রোগীর খাদ্যে এই সকল ভাইটামিনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রোগ হইলেই রোগীর জন্য কিছু ফলের ব্যবস্থা করিতে হয়—এই প্রচলিত ধারণা বোধহয় এই ভাইটামিনের অভাব পূরণের জন্যই সৃষ্টি হইয়াছে। তবে একটি কথা মনে রাখিবে, রোগীর দুধ-বার্লির ব্যবস্থা আগে করিয়া পরে ফলের ব্যবস্থা করিবে। যাহার দুধ-বার্লি ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য নাই তাহার পক্ষে রোগীর জন্য দুর্মূল্য ফলের ব্যবস্থা করিতে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার ফলের মধ্যে বেদানা, আপেল, ন্যাশপাতি ইত্যাদি দুর্মূল্য ফল রোগীকে খাওয়াইতেই হইবে এমন কোনও কথা নাই। কলা, কমলা, আনারস, জামরুল, শাঁক আলু, আখ ইত্যাদিও উৎকৃষ্ট ফল। ইহাতে ভাইটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদিও যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং দামেও সস্তা। সুতরাং এই সকল কম দামের ফল-ফলাদি দ্বারাই রোগীর ভাইটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করা যায়। রোগীকে একসঙ্গে বেশী খাবার দিতে নাই। অল্প অল্প করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে উহার পরিপাকে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। রোগীকে প্রতিদিন ২।৩ সের জল পান করিতে দিবে। জ্বরের সময় দেহে অতিরিক্ত আবর্জনার সৃষ্টি হয় এবং ইহা

রক্তে আসিয়া সঞ্চিত হয়। রক্ত হইতে এই আবর্জনা দূর করিবার প্রধান উপায় ঘাম ও মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। মূত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার একমাত্র উপায় রোগীকে বেশী করিয়া জলপান করিতে দেওয়া। জলের সঙ্গে গ্লুকোজ, ল্যাক্টোজ, ইত্যাদি মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে পানীয় ও পথ্য একই সঙ্গে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

সদ্যরোগমুক্ত রোগীর খাদ্য
(Convalescent diet)

রুগ্ন ব্যক্তির রোগের লক্ষণটি সারিয়া গেলেও সঙ্গে সঙ্গেই সে তাহার পূর্বের স্বাস্থ্য ও শক্তি ফিরিয়া পায় না। রোগের আক্রমণে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে এবং দেহের ওজনও কমিয়া যায়। রোগের প্রকৃতি ও স্থায়িত্বের উপরই দেহের এই পরিবর্তন নির্ভর করে। অল্পদিনের সর্দি-জ্বর প্রভৃতি রোগে হয়তো শরীরের কোন কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের রোগে শরীর দুর্বল হইয়া একেবারে ভাঙিয়া পড়ে। এই সকল রোগ সারিয়া গেলেও রোগীকে পূর্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতে অনেক সময় লাগে। স্বভাবতঃই রোগ আরোগ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীকে তাহার স্বাভাবিক খাদ্য দেওয়া চলে না। কারণ তখনও তাহার পরিপাক যন্ত্র পূর্বের ন্যায় সবল ও সুস্থ হইয়া ওঠে না। এই সদ্যরোগমুক্ত রোগীর খাদ্য ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য অনেক বিষয় বিবেচনা করিতে হয়। যেমন রোগী কি প্রকার রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিল, সে কতদিন রুগ্ন ছিল, রোগে ভুগিয়া তাহার কতখানি স্বাস্থ্যহানি ঘটিয়াছে, রোগের সময় তাহাকে কি কি খাদ্য দেওয়া হইত, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখিয়া এই খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করিতে হয়। তাহা হইলেও এই সময় সদ্য রোগমুক্ত রোগীর খাদ্য সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নির্দেশ দেওয়া চলে।

প্রথমতঃ সকল রোগই পরিপাক যন্ত্রকে দুর্বল করিয়া দেয়। সুতরাং খাদ্য নির্ণয়ে প্রথমেই রোগীর পরিপাক শক্তির কথা চিন্তা করিতে হইবে। রোগীকে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে সেই সকল খাদ্য দিতে হইবে যাহা তাহার পরিপাকে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না করে। রোগে দেহের প্রচুর ক্ষয় হয়। ফলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। রোগ আরোগ্যের পর দেহের এই ক্ষয় পূরণ করাই খাদ্য ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। এইজন্য রোগীর খাদ্যে এই সময় প্রচুর পরিমাণ সহজপাচ্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন-জাত খাদ্য হইতেছে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি। রোগীকে রুগ্ন অবস্থায় তরল খাদ্য (liquid diet) দেওয়া হইয়া থাকে তবে রোগ আরোগ্যের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে কঠিন খাদ্য (solid food) দেওয়া উচিত নয়। প্রথমে অর্ধ-তরল বা লেই জাতীয় (semi-solid or soft) খাদ্য হইতেই আরম্ভ করা ভাল যাহাতে তাহার পরিপাকে কোন বিঘ্ন না ঘটে। দুধ তরল অবস্থায় বা দুধের সঙ্গে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় কোন খাদ্য ব্যবহার করিয়া পরিজ (porridge) প্রস্তুত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খই একটি উত্তম কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য। ভাত অপেক্ষা ইহা সহজপাচ্য এবং খাদ্যগুণও বেশী। সদ্য ভাজা খই দুধে ফেলিলে উহা দুধ শুষিয়া নরম হইয়া

যায় এবং এই দুধ-খই খাইতেও খুব সুস্বাদু. কর্ন ফ্লেক্স (corn flakes), ওটস (oat meal) প্রভৃতি দুধের সহিত মিশাইয়া যে পরিজ প্রস্তুত হয় তাহা অপেক্ষা এই দুধ-খই কোন অংশে খারাপ নয়। তাছাড়া খই সহজলভ্য। সুদূর পল্লীতেও রোগীর জন্য এই দুধ-খই এর ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। মাছও সুসিদ্ধ করিয়া অল্প মশলা দিয়া রান্না করিয়া রোগীকে খাইতে দেওয়া যায়; তবে রোগীকে ছোট টাটকা মাছই দেওয়া উচিত, বড় মাছ বা চর্বিযুক্ত মাছে পরিপাকে গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। চর্বিহীন মাংসের সুপ এবং অর্ধসিদ্ধ ডিমও দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল প্রোটিনজাত খাদ্যের মধ্যে দুধই প্রধান। প্রত্যহ অন্ততঃ আধ সের/তিন পোয়া দুধ রোগীকে বিভিন্নভাবে খাওয়াইতে হইবে। দুধের সঙ্গে মাছ, মাংস বা ডিম ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া উহার খাদ্যে প্রচুর প্রোটিনের জোগান দিতে হইবে। এই সময় রোগীর প্রোটিনের চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং প্রতিদিনের খাদ্যে ১০০-১৫০ গ্রাম প্রোটিনের ব্যবস্থা করিতে হয়। প্রোটিনের পরেই ভাইটামিন ও খনিজ লবণের জন্য প্রতিদিন কিছু কিছু টাটকা ফল ও সবুজ শাক-সবজি রোগীকে খাইতে দেওয়া উচিত। রোগে ভুগিলে দেহে ভাইটামিনসমূহের অভাবই বেশী করিয়া দেখা যায়। সুতরাং ভাইটামিন সরবরাহ করিয়া রোগীর রোগ প্রতিরোধক শক্তিকে গড়িয়া তুলিতে হয়। কমলালেবু, টমেটোর রস, কলা, আনারস ইত্যাদি প্রতিদিনই রোগীকে কিছু কিছু খাওয়াইতে হয়। তাছাড়া সবুজ শাক-সবজির সুপ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে দেওয়া উচিত। শাক-সবজি সরাসরি খাইতে দেওয়া উচিত নয়, কারণ উহাদের সেল্যুলোজ রোগী জীর্ণ করিতে পারিবে না। কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তাও কম নয়। রোগের পরে দেহের ওজন স্বভাবতঃই কিছুটা কমিয়া যায়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহজাতীয় জ্বালানী খাদ্য খাইয়া ওজনের ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। রোগীকে এই সময় কোন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং প্রতিদিন ২২০০/২৫০০ ক্যালরি মূল্যের খাদ্য খাইলেই ধীরে ধীরে ওজন বৃদ্ধি পাইবে। তবে এই সকল কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহখাদ্য যাহাতে সহজপাচ্য হয় সেদিকে নজর রাখিতে হইবে। খই, কর্ন ফ্লেক্স, ওট প্রভৃতির নাম পূর্বেই বলা হইয়াছে। পেটে সহ্য হইলে সরু চাউলের ভাত সুসিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তাছাড়া চিনি, গুড় ইত্যাদি তো আছেই। স্নেহ খাদ্যের মধ্যে মাখন, ক্রীম ইত্যাদি দেওয়া যায়। এইরূপে অর্ধ-তরল বা লেই জাতীয় খাদ্য কিছুদিন খাইবার পর শরীর যখন বেশ সুস্থ ও সবল হইবে তখনই ধীরে ধীরে কঠিন খাদ্য আরম্ভ করিয়া উহার স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরিয়া আসিতে হয়। তবে যাহারা অল্পদিন ভুগিয়া আরোগ্য হইয়াছে এবং রোগ যাহাদের তেমন দুর্বল করিতে পারে নাই তাহাদের রোগ আরোগ্যের পর প্রথমেই সহজপাচ্য কঠিন খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে।

কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীর খাদ্য
(Diet for constipation)

আজ যে খাদ্য খাইলাম চব্বিশ ঘণ্টা পরে তাহার মল শরীর হইতে নির্গত হইয়া যাইবার কথা। ঐ মল পূর্ব হইতেই মলাশয়ে আসিয়া জমিয়া থাকে এবং প্রত্যহ

একবার বা দুইবার একটি নির্দিষ্ট সময় বেগ উপস্থিত হইয়া বাহির হইয়া যায়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে মল শরীর হইতে নির্গত না হইয়া যদি মলাশয়ে জমিতে থাকে তবে তাহাকে কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ বলে। বৃহদন্ত্রে অসংখ্য বিভিন্ন প্রকারের জীবাণু বাস করে। কোষ্ঠকাঠিন্য হইলে ঐ সকল জীবাণু খাদ্যের অসার অংশ বা মল পচাইয়া বিভিন্ন প্রকার গ্যাস সৃষ্টি করে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন গ্যাসে সাধারণতঃ কোন গন্ধ থাকে না। কিন্তু প্রোটিন পচাইয়া যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাহা অতীব দুর্গন্ধযুক্ত। এই সকল বিষাক্ত গ্যাস সৃষ্টির ফলে অবসাদ, মাথা ধরা প্রভৃতি শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দেয়। পরোক্ষভাবে এই কোষ্ঠ-কাঠিন্য আমাশয়, ডিসপেপসিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে কোষ্ঠ-কাঠিন্যই সকল রোগের মূল কারণ।

বর্তমান যান্ত্রিক যুগে আমাদের প্রায়ই আর তেমন শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করিতে হয় না। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে তলপেটের পেশীসমূহ আর তেমন ক্রিয়াশীল থাকে না। ফলে মলাশয়ে মল উপস্থিত হইলেও বৃহৎ অন্ত্রের পেশীসমূহের যথাযথ কুঞ্চনের অভাবে উহা নির্গত হইতে পারে না। তাছাড়া আজকাল আমরা খুব বেশী বিশুদ্ধ (refined) খাদ্য খাইয়া থাকি। আটার রুটি অপেক্ষা ময়দার লুচি এবং পাঁউরুটিই আমাদের অধিক প্রিয় খাদ্য। গুড়, মধু না খাইয়া আমরা চিনিই বেশী ব্যবহার করি। এই সকল বিশুদ্ধ খাদ্যও কোষ্ঠবদ্ধতার একটি প্রধান কারণ। সুতরাং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিতে হইলে যেমন শারীরিক পরিশ্রমের দ্বারা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বজায় রাখা দরকার তেমনি খাদ্য-ব্যবস্থার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। আমরা এই খাদ্য ব্যবস্থার কথাই এখানে আলোচনা করিব।

সেল্যুলোজ একপ্রকার কার্বোহাইড্রেট, বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি, যথা—পালং শাক, লেট্যুশ শাক, কলমী শাক, ডাঁটা শাক, বাঁধাকপি ইত্যাদির অধিকাংশ এই সেল্যুলোজ। তাছাড়া তরিতরকারি, যথা—আলু, পেঁপে, গাজর, কাঁচকলা, ডাঁটা, সিম, বরবটি, লাউ, কুমড়া ইত্যাদির বাহিরের খোসাটাও প্রধানতঃ সেল্যুলোজ দ্বারাই গঠিত। বিভিন্ন ফলের ছিবড়া এবং চাউল, গম ইত্যাদি সিরিয়াল জাতীয় খাদ্যের বাহিরের অংশ যাহাকে আমরা তুষ (bran) বলি তাহাও প্রধানতঃ সেল্যুলোজ। এই সকল সেল্যুলোজ আমরা হজম করিতে পারি না এবং ইহা আমাদের দেহের কোন উপকারেও আসে না। খাদ্যের এই অসার সেল্যুলোজকেই রাফেজ (Rouphage) বলে। সুতরাং খাদ্যের সহিত এই সেল্যুলোজ খাইলে উহা পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্ত্র পার হইয়া মলের সহিত একেবারে বৃহদন্ত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে সেল্যুলোজ বৃহদন্ত্রের গাত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া মলত্যাগে সহায়তা করে। তাছাড়া সেল্যুলোজের জন্য মলের ওজন ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং চাপের দ্বারা বেগ সৃষ্টি করিতেও ইহা সাহায্য করিয়া থাকে। এইজন্যই কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর করিতে এই সেল্যুলোজ জাতীয় খাদ্য বিশেষ উপযোগী। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগী প্রতিদিন ঐ সকল শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণ খাইবে। শাক-সবজিগুলি আবার কাঁচা এবং টাটকা অবস্থায় খাইলেই বেশী উপকার পাওয়া যায়। সুতরাং বাঁধাকপি, লেট্যুশ প্রভৃতি কয়েকটি সবজি প্রতিদিন কিছু কিছু স্যালাড করিয়া কাঁচাই খাওয়া উচিত। আলু, মূলা পটল প্রভৃতি সবজি খোসা না ফেলিয়াই রান্না করিয়া খাওয়া ভাল। ফল

সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। যেখানেই সম্ভব ফলের খোসা এবং ছিবড়া সবই খাইতে হয়। আপেলের খোসা এবং কমলার ছিবড়া না ফেলিয়া অনায়াসে খাওয়া চলে। চাউল, গম ইত্যাদি সিরিয়াল খাদ্যেরও তুষ ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। এই তুষের সেলুলোজ কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করে। সুতরাং ঢেঁকি-ছাঁটা চাউল মেসিনে প্রস্তুত চাউল অপেক্ষা বেশী উপকারী। তেমনি আটার রুটি ময়দায় প্রস্তুত পাঁউরুটি এবং লুচি অপেক্ষা ভাল। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীর পক্ষে আগার-আগারও (Agar-Agar) একটি ভাল খাদ্য, প্রথমে আগার-আগার ছোট ছোট করিয়া ঈষদুষ্ণ জলে বেশ কিছুক্ষণ রাখিতে হয় এবং তারপর পরিমাণ মত জলে এই আগার-আগার একটু চিনি মিশাইয়া ফুটাইতে হয়। যখন সমস্ত একত্রিত হইয়া জেলীর ন্যায় প্রস্তুত হয় তখন উহা খাইলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়। মোট কথা কোষ্ঠকাঠিন্য রোগী বিশুদ্ধ (refined) খাদ্যের লোভ ত্যাগ করিয়া প্রতিদিন অধিক পরিমাণে সেলুলোজ জাতীয় খাদ্য খাইবে।

আরও এক প্রকার খাদ্য কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীর পক্ষে উপকারী। কাগজিলেবু, কমলালেবু, টমেটো, আপেল, রুবার্ব (rhubarb), সিডার (cider) প্রভৃতিতে জৈব অ্যাসিড থাকে। এই সকল অ্যাসিড অন্ত্রে উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া মলত্যাগে সাহায্য করে। এইজন্য প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এই সকল ফল বা ফলের রস খাইলে কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর হয়। অনেকের ধারণা খালি পেটে এই সকল অ্যাসিড জাতীয় ফল খাইলে অ্যাসিডিটি (acidity) হয়। আসলে কিন্তু ইহা ভুল ধারণা। এই সকল ফলের অ্যাসিড অতি সহজেই অক্সিডাইজ্‌ড বা জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলে পরিণত হয়। তাছাড়া প্রচুর খনিজ লবণ থাকায় এই সকল ফল পরিশেষে দেহে ক্ষারীয় ভাবেরই সৃষ্টি করে। সুতরাং ইহাদের অ্যাসিডিক খাদ্য না বলিয়া অ্যালকালি বা ক্ষারীয় খাদ্য বলাই ভাল। তবে সকল ফলেরই এই গুণ নাই। কালোজামেও (blackberries) জৈব অ্যাসিড আছে। কিন্তু এই অ্যাসিড জারিত হইয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল উৎপন্ন করে না। দেহে এই অ্যাসিড অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। কালোজাম ফল হইলেও অ্যাসিডিক খাদ্য এবং ইহাতে কোষ্ঠ-কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগী কালজাম খাইবে না।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, যে-সকল খাদ্যে ভাইটামিন 'বি' বা থায়ামিন আছে তাহা কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করিতে সহায়তা করে। এইজন্য থায়ামিনযুক্ত খাদ্য-দ্রব্য যেমন ঈস্ট প্রতিদিন কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীর খাওয়া উচিত। অনেকে ঈস্টএর পরিবর্তে সরাসরি ভাইটামিন 'বি' ট্যাবলেটও খাইতে পরামর্শ দেন। পূর্বে যে সেলুলোজ জাতীয় খাদ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল খাদ্য এই ভাইটামিনের সঙ্গে খাইলে অধিক ফল পাওয়া যায়।

অনেক সময় মল মলাশয়ে জমিয়া বেশ শক্ত আকার ধারণ করে। এইজন্য অনেকে কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীকে মধু, গুড়, ফুলকপি প্রভৃতি খাইতে উপদেশ দেন।

এই সকল খাদ্য অন্ত্রে গাঁজাইয়া গ্যাস উৎপন্ন করে। শক্তমল এই গ্যাসের দ্বারা ভাঙিয়া সহজেই বাহির হইয়া যায়। তবে মধু, গুড় প্রভৃতি শুধু না খাইয়া রুটির সঙ্গে খাইতে হয়, তাহা না হইলে পরিপাকে গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করিবার জন্য অলিভ-অয়েল জাতীয় কোন তেলও খাওয়া যাইতে পারে। যাহাদের চর্বি-জাতীয় খাদ্য ভাল হজম হয় না তাহারা সকালে খালিপেটে অথবা

রাত্রে শোয়ার সময় এক চামচ কি দুই চামচ এই তেল খাইলে কিছুক্ষণ পরেই পায়খানা হইয়া যাইবে। তবে অনেকের আবার এই তেল বৃহদন্ত্র পর্যন্ত পেঁছায় না। পূর্বেই তাহা হজম হইয়া খাদ্যের সঙ্গে রক্তের মধ্যে মিশিয়া যায়। এইরূপ ক্ষেত্রে এই জাতীয় তেলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয় না। এইজন্য আজকাল এক প্রকার খনিজ তেল কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। এই খনিজ তেল হজম করা যায় না। সুতরাং কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর করিতে ইহা বিশেষ উপকারী।

কঠিন মল নরম করিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দিবার পক্ষে জলও বিশেষ উপকারী। সকালে খালি পেটে ২/৩ গ্লাস জল পান করিলে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেগ উপস্থিত হইয়া মল বাহির হইয়া যায়। অনেক সময় আবার জল বৃহদন্ত্রে পেঁছাইবার পূর্বেই শোষিত হইয়া যায়। এইজন্য খালি পেটে জল পান করিয়া অনেকের কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর হয় না। তবে ঐ জলের সঙ্গে একটু লবণ বা পাতিলেবুর রস বা উভয়ই মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া খালি পেটে জল পান করিলে পরিপাক-যন্ত্র ধুইয়া পরিষ্কার হইয়া যায় এবং পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগীর খাদ্যের একটি নমুনা নিম্নে দেওয়া হইল।

সকালে ঃ খালিপেটে ২ গ্লাস জলে একটি পাতিলেবুর রস ও একটু লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিবে। পরে কয়েকখানা আটার রুটি, গুড় বা মধু এবং কমলালেবু (ছিবড়াসহ) বা খোসাসহ আপেল প্রভৃতি দ্বারা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিবে।

দুপুর এবং রাত্রের খাবারে পালং, পুঁই প্রভৃতি শাক জাতীয় একটি খাবার থাকিবে। তাছাড়া বাঁধাকপি, লেট্যুস, টমেটো, শশা প্রভৃতি দ্বারা একটি স্যালাড প্রস্তুত করিয়া খাইবে। আলু, মূলা প্রভৃতি তরকারি খোসাসহ খাইবে। চিড়া, মুড়ি প্রভৃতি ভাজা খাদ্য ত্যাগ করিবে। ইহাতে ফল না পাইলে রোগীকে সকালে একটি পাকা বেল বা পেঁপে খাইতে দিবে। অবশ্যই কোষ্ঠ-বদ্ধতা দূর হইবে।

বহুমূত্র রোগে খাদ্য
(Diet in diabetes)

বহুমূত্র রোগ দুই প্রকার। এক প্রকার বহুমূত্র রোগে মূত্রের সহিত চিনি নির্গত হয়। সুতরাং রোগীর মূত্রে মাছি, পিঁপড়া, ইত্যাদি বসিতে দেখা যায়। ইহাকে শর্করাযুক্ত বহুমূত্র (Diabetes Mellitus) বলে। অপর এক প্রকার বহুমূত্র রোগীর মূত্রে চিনি বা কোন শর্করা থাকে না। ইহাকে শর্করাবিহীন বহুমূত্র (Diabetes Insipidus) বলে। সাধারণতঃ বহুমূত্র রোগ বলিতে আমরা এই শর্করাযুক্ত বহুমূত্রই বুঝিয়া থাকি।

এই রোগে রোগীর ঘন ঘন পিপাসা ও ঘন ঘন মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা প্রবল হয়। রোগের কঠিন অবস্থায় মাথাধরা, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, মূর্ছা, মূত্রাশয় প্রদাহ প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। বহুমূত্র রোগী অতি সহজেই হৃদরোগ, সন্ন্যাস রোগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে যাহাদের চোখে ছানি পড়ে তাহারা অল্পাধিক পরিমাণে এই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত।

আমাদের দেহের অগ্ন্যাশয় (Pancreas) গ্রন্থি হইতে **ইনসুলিন** (Insulin) নামে একটি হরমোন নির্গত হয়। এই ইনসুলিন খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট হইতে দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হইবার কাজে সহায়তা করে। অগ্ন্যাশয়ের অসুস্থতার জন্য এই ইনসুলিন যদি নির্গত না হয় তবে দেহের মাংসপেশী কার্বোহাইড্রেট হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না এবং উহা দেহের কোন উপকারে আসে না। ফলে রক্তে কার্বোহাইড্রেট বা গ্লুকোজের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রক্তে এই গ্লুকোজের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করিলে উহা অবশেষে মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায়। ফলে রোগী দিন দিন দুর্বল হইয়া পড়ে ও দেহে নানা উপসর্গ দেখা দেয়। এই রোগে আক্রান্ত রোগীর রোগ প্রতিরোধক শক্তি কমিয়া যায় এবং সহজেই সে অন্যান্য দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইতে পারে।

এই রোগে আক্রান্ত রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজন হইলে ইনসুলিন ইনজেকসন লইবে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই ইনসুলিন অগ্ন্যাশয় হইতে উৎপন্ন ইনসুলিনেরই অনুরূপ এবং ইহা ব্যবহার করিলে দেহে আবার কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে। ইনসুলিন খাইলে কোন উপকার হয় না, কারণ পাকস্থলী ও অন্ত্রে উহা নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য ইহা ইনজেকসন করিয়া দেহে প্রবেশ করাইয়া দিতে হয়। তবে ইনসুলিন লইয়াও ইচ্ছামত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য খাওয়া যায় না। ঐ ইনসুলিন এবং অগ্ন্যাশয়-নিঃসৃত ইনসুলিনের যতটুকু কার্বোহাইড্রেট কাজে লাগাইবার ক্ষমতা আছে ততটুকু কার্বোহাইড্রেট খাইতে হয়। উহার বেশী খাইলে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যাইবে। সুতরাং ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ জানিয়া বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য হইতে তাহা গ্রহণ করিতে হয়।

স্পষ্টতঃই দেখা যাইতেছে বহুমূত্র রোগী কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য হইতে অর্থাৎ ভাত, রুটি, আলু, চিনি, গুড়, চিড়া, মুড়ি, খৈ ইত্যাদি হইতে দেহে তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। এই সকল খাদ্য খাইলে উহা আবার মূত্রের সহিত বাহির হইয়া যায় এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া বিভিন্ন রোগের উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে এই সকল দ্রব্যাদির পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে। রোগী কতটুকু কার্বোহাইড্রেট খাইবে তাহা নির্ভর করে উহার অগ্ন্যাশয়নিঃসৃত ইনসুলিনের পরিমাণের উপর। অসুস্থ হইলেও অগ্ন্যাশয় কিছু কিছু ইনসুলিন উৎপন্ন করিতে পারে। এই ইনসুলিনের পরিমাণ অনুযায়ী কার্বোহাইড্রেট খাইতে হয়। তবে যতটা সম্ভব খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়। শুধু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমাইলেই হইবে না। ঐ সঙ্গে প্রোটিন ও স্নেহের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। অনেকের ধারণা বহুমূত্র রোগী ইচ্ছামত প্রোটিন জাতীয় খাদ্য মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি বা স্নেহপ্রধান খাদ্য মাখন ইত্যাদি খাইতে পারে। তাহা ঠিক নয়। কারণ দেহে প্রোটিনের শতকরা ৫৮ ভাগ এবং স্নেহের শতকরা ১০ ভাগ গ্লুকোজে পরিণত হইতে পারে। অতএব কার্বোহাইড্রেটের সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিনের এবং স্নেহপ্রধান খাদ্যও নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। আমাদের খাদ্যের প্রধান অংশই কার্বোহাইড্রেট এবং প্রয়োজনীয় তাপশক্তির অধিকাংশই এই জাতীয় খাদ্য হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস করিলে অধিক পরিশ্রম করিবার শক্তিও কমিয়া যাইবে।

এই জন্যই বহুমূত্র রোগীর অধিক পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নয়। কিন্তু আমাদের Basal Metabolismএর জন্য যে পরিমাণ তাপের দরকার তাহা অবশ্যই খাদ্যে থাকা প্রয়োজন। তাহা না হইলে রোগী আরও দুর্বল হইয়া পড়িবে। তাছাড়া রোগী দৈনিক কাজে যে শক্তি ব্যয় করিবে তাহারও ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। মোটামুটি ১৮০০ ক্যালরি হইতে ২৪০০ ক্যালরি মূল্যের খাদ্য হইলেই একজন অল্প পরিশ্রমী বহুমূত্র রোগীর স্বাস্থ্য রক্ষা হয় কারণ বহুমূত্র রোগীর কোন কঠিন পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নয়। বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে এই ক্যালরির ব্যবস্থা প্রধানতঃ স্নেহপ্রধান খাদ্য হইতেই করা হয়। সে তাহার প্রয়োজনীয় ক্যালরির অর্ধেকেরও বেশী এই স্নেহপ্রধান খাদ্য হইতেই পাইবে। অবশিষ্ট ক্যালরির চাহিদা প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের দ্বারা পূরণ হইবে। সাধারণ লোকের খাদ্যের অধিকাংশই ভাত, রুটি ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। এইরূপ খাদ্যের দ্বারাই আমাদের ক্ষুধা (appetite) নিবৃত্তি করিতে হয় সুতরাং খাদ্যে ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি অসম্ভব রকম হ্রাস পাইবার ফলে রোগীর যাহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে অসুবিধা না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য রোগীর খাদ্যে প্রচুর পরিমাণ শাক-সবজির ব্যবস্থা করিতে হয়। মনে রাখিবে সাধারণ লোক যেমন ভাত, রুটি ইত্যাদির দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এই বহুমূত্র রোগী তেমনি শাক-সবজির দ্বারাই তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি করিবে। সকল শাক-সবজি আবার রোগীর পক্ষে উপযুক্ত নয়। যে সকল শাক-সবজিতে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কম সেই সকল শাক-সবজিই রোগীর পক্ষে উপকারী। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি শাক-সবজির নাম ও তাহাদের কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ দেওয়া হইল :

কার্বোহাইড্রেটের পরিমান শতকরা—

৩ ভাগ	৬ ভাগ	৯ ভাগ
এ্যাসপারাগাস	বীট শাক	গাজর
বীট শাক	দণ্ড কলস শাক	পেঁয়াজ
বাঁধাকপি	স্কোয়াশ	কচি মটর শাক
শশা	ওলকপি	
লেট্যুস		
সর্ষে শাক		
পালং শাক		
ওলকপি শাক		
কলমি শাক		
টমেটো		

এই সকল শাক-সবজিতে প্রচুর ভাইটামিন ও খনিজ লবণ থাকে। সুতরাং বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে ভাইটামিন ও খনিজ লবণের অভাব হইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এই দিক হইতে এই প্রকার রোগীর খাদ্য সাধারণ লোকের খাদ্য অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। তাছাড়া এই সকল শাক-সবজির সেল্যুলোজ রোগীর কোষ্ঠ পরিষ্কারে

বিশেষভাবে সহায়তা করে। প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণে এই সকল শাক-সবজি খাইলে কখনও কোষ্ঠ-কাঠিন্য রোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না।

বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে কিন্তু যে-কোন প্রকারের ফল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবস্থা করা যায় না। কারণ অধিকাংশ ফলেই কার্বোহাইড্রেট বেশ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। এই সকল ফল খাইলে পরোক্ষভাবে কিছু কার্বোহাইড্রেটও খাওয়া হইয়া যায়। সুতরাং ভাত, রুটি ইত্যাদিও আবার পরিমাণ মত খাদ্য হইতে হ্রাস করিতে হয়। কলা, কমলা, আপেল, ন্যাশপাতি, আঙুর, বেদানা ইত্যাদি এই শ্রেণীর ফল।

আমরা দুধ, চা, শরবত ইত্যাদি মিষ্টি করিবার জন্য সাধারণতঃ চিনি ব্যবহার করিয়া থাকি কিন্তু বহুমূত্র রোগী এই সকল খাদ্যে চিনি ব্যবহার করিতে পারিবে না। চিনির পরিবর্তে মিষ্টি হিসাবে স্যাকারিন (Saccharine) ব্যবহার করিতে হয়। স্যাকারিনের কোন খাদ্যমূল্য নাই। ইহা শুধু খাদ্যের মিষ্টত্ব বৃদ্ধি করিয়া থাকে। সুতরাং স্যাকারিন ব্যবহারে বহুমূত্র রোগীর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। স্যাকারিন চিনি অপেক্ষা ৫০০ গুণ বেশী মিষ্টি। সুতরাং চিনির তুলনায় অতি সামান্য স্যাকারিনই ব্যবহার করিতে হয়। স্যাকারিন বেশী হইলে খাদ্যবস্তু তিক্ত হইয়া যায়।

বহুমূত্র রোগীর খাদ্য রান্না করা কষ্টসাধ্য। তরি-তরকারি, শাক-সবজিই এই রোগীর প্রধান খাদ্য। সাধারণতঃ শাক-সবজি তরি-তরকারি রান্নায় একটু চিনি গুড় মিষ্টি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া কখনও কখনও আটা, ময়দা ইত্যাদিও জলে গুলিয়া একটু আধটু দেওয়া হয়। তরি-তরকারির বর্ণ-গন্ধ স্বাদ ইত্যাদি বৃদ্ধি করিবার জনই এই সকল ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই সমস্তই কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যবস্তু। সুতরাং বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে এসকল ব্যবহার করা চলিবে না অথচ খাদ্যবস্তুর উপযুক্ত বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ ইত্যাদি না হইলে মুখরোচক হইবে না এবং রোগী তাহা খাইতেও চাহিবে না। এই জন্যই বহুমূত্র রোগীর খাদ্য প্রস্তুতিতে রন্ধনপটিয়সীর প্রয়োজন।

বহুমূত্র রোগীর ক্যালরির চাহিদা কিছুটা স্নেহপদার্থের দ্বারাই পূরণ করা হয়। স্নেহ পদার্থের জন্য মাখনই উৎকৃষ্ট। কারণ ইহাতে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে। দৈনিক তাহার খাদ্যে ১০ হইতে ১৫ গ্রাম মাখনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, সকালে দুই-এক টুকরা রুটির সঙ্গে কিছুটা মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। প্রোটিনের জন্য কিছু মাছ বা মাংস এবং একটি ডিম, কিছু দুধের ব্যবস্থা করা যায়। বহুমূত্র রোগীর এক বেলার বেশী ভাত খাওয়া উচিত নয়। দুপুরে অল্প পরিমাণে ভাত এবং রাত্রে ভাতের পরিবর্তে অল্প রুটি খাওয়া উচিত। দুই বেলাই তিন-চার প্রকারের শাকসবজি, তরি-তরকারি প্রচুর পরিমাণে খাইয়া রোগীর ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হইবে। সকাল ও বিকালের টিফিনে দুধ, ডিম-সিদ্ধ, ফলের রস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। একজন সাধারণ বহুমূত্র রোগীর দৈনিক খাদ্যের তালিকা দেওয়া হইল :

খাদ্য গ্রহণের রীতি ঃ

বহুমূত্র রোগীর খাদ্যে নিম্নলিখিত বস্তু বর্জন করিতে হইবে—

(১) কন্দ ও মূল।
(২) মিষ্টি, পুডিং ও চকোলেট।
(৩) ভাজা খাবার।
(৪) শুষ্ক ফল ও বাদাম।
(৫) চিনি।
(৬) কলা, আতা জাতীয় ফল।

খাদ্যের নমুনা* ঃ

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
চাল	৬০	৯০
ময়দার রুটি	৯০	৯০
ডাল	৬০	৩০
সবুজ শাকপাতা	২৫০	২৫০
অন্যান্য তরকারি	২৫০	২৫০
মাখন	১৫	১০
ঘি অথবা তেল	২৫	৩০
ফল	২৫০	২৫০
গরুর দুধ	৫০০ মি. লি.	৩৫০ মি. লি.
গরুর দুধের দই	২৫০	১৫০
মাছ অথবা মুর্গীর মাংস	—	৫০
ডিম	—	একটি

এই খাদ্যে—

ক্যালরির পরিমাণ	১৮০০
প্রোটিন	৭০ গ্রাম
স্নেহ	৭০ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	২২০ গ্রাম

যক্ষ্মারোগে খাদ্য
(Diet in Tuberculosis)

একপ্রকার জীবাণু দ্বারা দেহে এই রোগের সৃষ্টি হয়। এই জীবাণু ফুসফুস, অন্ত্র, পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, যকৃৎ, প্লীহা প্রভৃতি দেহের যে কোন অঙ্গ আক্রমণ করিতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুসফুসই আক্রান্ত হইয়া থাকে।

* Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institution of Nutrition, ICMR, Hyderabad, 1971.

এই রোগের প্রথমে সকালে বিকালে রোগীর গলা সুড় সুড় করে এবং অল্প অল্প কাশি দেখা দেয়। কিছুদিন পর কাশির সঙ্গে সঙ্গে শ্লেষ্মা বাহির হয় এবং শ্লেষ্মার সহিত রক্তও বাহির হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগী বুকে একটু বেদনা অনুভব করে এবং বিকালের দিকে শরীরের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া ৯৯° হইতে ১০০° পর্যন্ত হয়। রোগীর দেহের ওজন হ্রাস পায় এবং ক্রমশঃ সে দুর্বল হইতে থাকে। রোগের প্রবল অবস্থায় কাশি, রক্তবমি, জ্বরের প্রকোপ, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি বৃদ্ধি পায় এবং রোগী যখন তখন বমি করে।

দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি হ্রাস পাইলেই এই রোগ দেহকে আক্রমণ করে। সুতরাং ভাল ও টাটকা খাদ্যের সাহায্যে রোগীর দেহে এই রোগ প্রতিরোধক শক্তি যাহাতে সৃষ্টি হয় সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই উহার খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হয়। যক্ষ্মারোগে দেহ দুর্বল হইলেও খাদ্যের ক্যালরি-মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করিতে হয় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের যতটুকু ক্যালরি মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয় ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেও তার ক্যালরির চাহিদা তেমন বৃদ্ধি পায় না। মোট কথা, দেহের স্বাভাবিক ওজন বজায় রাখিতে প্রতিদিন যতটুকু বা যত ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাহা অপেক্ষা সামান্য বেশী ক্যালরি মূল্যের খাদ্য এই সময় রোগীর প্রয়োজন হয়। তাছাড়া এই সময় রোগীকে তেমন গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমের কাজও করিতে দেওয়া হয় না। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রম অনুযায়ী ২৫১০ ক্যালরী হইতে ৩৫০০ ক্যালরি মূল্যের খাদ্য রোগীর প্রয়োজন হয়।

খাদ্যের প্রোটিনের দিকে এই সময় বিশেষ নজর রাখিতে হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় একজন লোকের খাদ্যে উহার প্রতিদিনের মোট শতকরা ১০ হইতে ১৫ ভাগ যাহাতে প্রোটিন হইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলেও প্রোটিনের চাহিদার তেমন কিছু পরিবর্তন হয় না। দৈনিক ৬০ গ্রাম হইতে ৯০ গ্রাম প্রোটিন হইলেই প্রোটিনের অভাব পূরণ হয়। তবে এই প্রোটিন যাহাতে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য হইতেই প্রধানতঃ পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করিতে হয়। কারণ প্রধানতঃ আমিষ জাতীয় খাদ্যে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন থাকে, তাছাড়া এই সকল খাদ্যে বিশেষতঃ দুধে প্রয়োজনীয় ভাইটামিন ও ধাতব লবণ থাকে বলিয়া দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি গড়িয়া তুলিতেও এই সকল খাদ্য সাহায্য করে। সুতরাং প্রতিদিনের খাদ্যে অন্ততঃ ৫০০ হইতে ৭০০ গ্রাম দুধের ব্যবস্থা করিতেই হয়। তাছাড়া একটি ডিম এবং কিছু মাংস সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। চর্বিযুক্ত মাংসই রোগীর পক্ষে উপযুক্ত। কারণ ঐ চর্বিতে কিছু ভাইটামিন 'এ' পাওয়া যায়।

খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কিছু কমাইয়া স্নেহপ্রধান খাদ্যের পরিমাণ কিছু বাড়াইতে হয়। কারণ যক্ষ্মা রোগে ফুসফুস দুর্বল হইয়া পড়ে। কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য পুড়িয়া দেহে তাপ উৎপন্ন হইতে স্নেহ জাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অধিক অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। সুতরাং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য বেশী খাইতে দিলে ফুসফুসকে অধিক অক্সিজেন সরবরাহ করিতে হইবে। ফলে ইহা আরও দুর্বল হইয়া পড়িবার আশংকা থাকে। তাছাড়া স্নেহপ্রধান খাদ্যে ভাইটামিন 'এ', 'ডি' দ্রবীভূত থাকে। এই সকল ভাইটামিন দেহের রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধি করে। এইজন্য স্নেহ খাদ্যের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় বাড়াইতে হয়। সুতরাং রোগীকে প্রতিদিন

৪/৫ চামচ মাখন খাইতে দিতে হয়। ইহাতে উহার খাদ্যের ক্যালরি মূল্যও বেশী বৃদ্ধি পাইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দেহের ক্ষয় পূরণ করিয়া উহার রোগ প্রতিরোধক শক্তি গড়িয়া তোলাই খাদ্যের মূল লক্ষ্য। রোগ প্রতিরোধক শক্তি বৃদ্ধির জন্য খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ভাইটামিন ও ধাতব লবণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সুতরাং প্রতিদিন কিছু টাটকা ফল ও শাক-সবজি রোগীকে খাইতে দিতে হয়। এই সময় রোগীর ভাইটামিন 'সি'র প্রয়োজনীয়তা বিশেষ করিয়া বৃদ্ধি পায়। এইজন্য রোগীকে প্রতিদিন কমলালেবু, টমেটো ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি'-যুক্ত খাদ্য কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় খাইতে দিতে হয়। ভাইটামিন 'এ'র চাহিদা পূরণের জন্য প্রতিদিন কিছু কড-লিভার-অয়েল রোগীকে খাইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

যক্ষ্মা রোগীর খাইবার স্পৃহা সাধারণতঃ কমিয়া যায়। সুতরাং ইচ্ছা না থাকিলেও প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে তাহাকে খাইতে দিতে হয়। তবে পেটে যাহাতে গন্ডগোল না দেখা দেয় এবং হজমের যাহাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে কিছু কমাইতে হয়। যদি যক্ষ্মা-রোগীর প্রতিদিন ২৫০০ ক্যালরি অপেক্ষা অধিক ক্যালরি মূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন হয় তবে এই অতিরিক্ত ক্যালরির জন্য তাহাকে কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য না দিয়া স্নেহজাতীয় খাদ্য দিতে হয়। রোগীর প্রধান খাদ্য হইতেছে—

দুধ—৫০০ হইতে ৭০০ গ্রাম
ডিম—১টি
মাখন—৪, ৫ চামচ (বড়)
মাছ, মাংস—৬০-৯০ গ্রাম

তাছাড়া কিছু কলা, কমলা, আপেল ইত্যাদি ফল এবং শাক-সবজি, তরি-তরকারি ও প্রয়োজন মত ভাত, রুটি ইত্যাদি এই সংগে থাকিবে।

অ্যালার্জি রোগে খাদ্য
(Diet in Food Allergy)

কখনও কখনও দেখা যায় যে একটি নির্দিষ্ট খাদ্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ সহ্য করিতে পারে না। ঐ খাদ্য খাইলে তাহার বিভিন্ন প্রকার শারীরিক উপসর্গ দেখা দেয়। যেমন কখনও এই সকল উপসর্গের মধ্যে দেহের বিভিন্ন অংশে গোল গোল চাকা চাকা হইয়া ফুলিয়া ওঠা, চুলকানি হওয়া, চোখ দিয়া জল পড়া, একজিমা (eczema), হাঁপানী (asthma) রোগের লক্ষণ প্রভৃতি প্রায়ই প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখনও কখনও পরিপাকের বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া পেট ব্যথা, বমি, ঘন ঘন পায়খানা প্রভৃতির লক্ষণও প্রকাশ পায়। যদি কাহারও কোনও একটি বিশেষ খাদ্য খাইলে প্রতিবারেই এই সকল উপসর্গের কোনও একটি প্রকাশ পায় তবে সেই খাদ্যটি ঐ ব্যক্তির পক্ষে অ্যালার্জি খাদ্য বলিয়া ধরিতে হইবে এবং তাহার খাদ্য-তালিকা হইতে উহা বাদ দিতে হইবে। কখনও কখনও একাধিক খাদ্যেও অ্যালার্জি হইতে পারে। তখন এরূপ সমস্ত খাদ্যই খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে খাদ্যের প্রোটিন হইতেই অ্যালার্জি'র সৃষ্টি হয়। এই প্রোটিন অতি সামান্য পরিমাণ দেহে প্রবেশ করিলেই অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং যে খাদ্যে যাহার অ্যালার্জি' হয় সেই খাদ্য সামান্য পরিমাণ খাইলেই অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায়। যে সকল খাদ্যে সাধারণতঃ অ্যালার্জি' হয় তাহার মধ্যে ডিম, দুধ, চিংড়িমাছ, আটা (wheat), বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, আলু ইত্যাদি প্রধান। এছাড়া অন্যান্য খাদ্যেও অ্যালার্জি' হইতে পারে।

অ্যালার্জি' রোগীর খাদ্য-প্রস্তুতির জন্য প্রথমে কোন্ খাদ্যে তাহার অ্যালার্জি'র সৃষ্টি হয় তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এইজন্য রোগীকে ৪।৫ দিন বা এক সপ্তাহ ধরিয়া তাহা নির্ণয় করিতে হয়। এই চার পাঁচ দিন বা এক সপ্তাহ এমন সব খাদ্য খাইতে দিতে হয় যাহাতে তাহার অ্যালার্জি' হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অর্থাৎ যে খাদ্যের জন্য তাহার অ্যালার্জি' হইতেছে বলিয়া মনে হয় সেই খাদ্য বাদ দিয়া অন্যান্য সাধারণ খাদ্য তাহাকে দিতে হয়। প্রতিদিনের খাদ্য হইতে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ২।১টি খাদ্য বাদ দিলেই এইরূপ একটি সাধারণ খাদ্য নির্ণয় করা সম্ভব হইবে যাহাতে ঐ ব্যক্তির অ্যালার্জি'র কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইবে না। এই সাধারণ খাদ্যের সহিত এখন ঐ বাদ দেওয়া সন্দেহযুক্ত খাদ্যের একটি রোগীকে খাইতে দাও। এই খাদ্য খাইয়া যদি অ্যালার্জি'র লক্ষণ দেখা দেয় তবে ঐ খাদ্যই ব্যক্তির অ্যালার্জি'র কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি এই খাদ্যে কোন অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ না পায় তবে অপর একটি সন্দেহযুক্ত খাদ্য ঐ খাদ্যের সঙ্গে খাইতে দাও এবং লক্ষ্য কর ২।১ দিনের মধ্যে কোন অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায় কিনা। এইরূপে ঐ সাধারণ খাদ্যের সহিত একটি একটি করিয়া সন্দেহযুক্ত খাদ্য রোগীকে খাইতে দিয়া কোন খাদ্যের জন্য তাহার অ্যালার্জি'র সৃষ্টি হয় তাহা নির্ণয় করিতে হয়। যখন একাধিক খাদ্যে অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন উপরোক্ত পদ্ধতিতে ঐ সকল অ্যালার্জি'যুক্ত খাদ্য নির্ণয় করিতে একটু সময় ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ডাক্তারী পদ্ধতিতে আরও তাড়াতাড়ি অ্যালার্জি'যুক্ত খাদ্য নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে রোগীর হাতে সামান্য আচড় কাটিয়া রক্তের সহিত সন্দেহযুক্ত খাদ্যের প্রোটিন মিশাইয়া দিতে হয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রোটিন ডাক্তারের নিকট পূর্ব হইতেই প্রস্তুত থাকে। যে প্রোটিনে অ্যালার্জি' প্রকাশ পায় সেই প্রোটিনযুক্ত খাদ্যই ঐ ব্যক্তির পক্ষে অ্যালার্জি' খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

অতি সামান্য অ্যালার্জি'যুক্ত খাদ্য খাইলেই অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং খাদ্য হইতে অ্যালার্জি'যুক্ত খাদ্য একেবারেই বাদ দেওয়া উচিত। যাহাদের দুধে অ্যালার্জি' হয় তাহাদের খাদ্য হইতে দুধ, মাখন ইত্যাদি বাদ দেওয়া উচিত। মাখন যদিও প্রধানতঃ স্নেহ খাদ্য তবুও মাখনের সঙ্গে সামান্য দুধ থাকে এবং ঐ দুধ হইতেই অ্যালার্জি'র সৃষ্টি হইতে পারে। এমনকি দুধ যাহাদের অ্যালার্জি'র খাদ্য তাহারা আইস-ক্রীম, মিল্ক-চকোলেট ইত্যাদি খাইলেও অ্যালার্জি' হইতে পারে। সুতরাং দুধযুক্ত যে-কোন খাদ্য সযত্নে তাহারা পরিহার করিয়া চলিবে। আবার কখনও কখনও এমন দেখা যায় যে যাহাদের গরুর দুধে অ্যালার্জি' হয় তাহাদের গরুর দুধের পরিবর্তে ছাগলের দুধ খাইতে দিলে অ্যালার্জি'র লক্ষণ প্রকাশ পায় না। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে রোগীর খাদ্য হইতে দুধ একেবারে বাদ দেওয়া প্রয়োজন হয় না। রোগী দুধ একেবারে সহ্য করিতে না পারিলে তাহাকে দুধের পরিবর্তে অতিরিক্ত কিছু মাছ, মাংস,

ডিম ইত্যাদির ব্যবস্থা করিয়া দুধের প্রোটিনের অভাব পূরণ করিতে হয়। তাছাড়া দুধের ভাইটামিন ও খনিজ লবণের জন্য কিছু অতিরিক্ত সবুজ শাক-সবজি খাইতে দিয়া ঐ সকল ভাইটামিন ও ধাতব লবণের চাহিদা পূরণ করিতে হয়: এইরূপে কাহারও ডিমে অ্যালার্জি হইলে খাদ্য হইতে ডিম বাদ দিয়া ঐ জন্য কিছু অতিরিক্ত মাছ, মাংস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। সুতরাং অ্যালার্জি রোগীর খাদ্য-ব্যবস্থা করিতে হইলে প্রথমে কি প্রকার খাদ্যে উহার অ্যালার্জি সৃষ্টি হয় তাহা নির্ণয় করিয়া প্রাত্যহিক খাদ্য হইতে উহা বাদ দিয়া খাদ্যের উপাদানগুলি যাহাতে সে অন্যান্য খাদ্য হইতে পাইতে পারে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়।

অজীর্ণ ও ডায়েরিয়া রোগের খাদ্য

(Diet in acute indigestion and diarrhoea)

আমাদের পাকস্থলী যে পরিমাণ খাদ্য পরিপাক করিতে পারে তাহার অধিক খাদ্য খাইলেই বদ-হজম বা অজীর্ণ রোগের সৃষ্টি হয়। সামান্য অজীর্ণ রোগে পেট ফাঁপা এবং পেটে গ্যাস হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগের কঠিন অবস্থায় ঘন ঘন পাতলা পায়খানা এবং সঙ্গে সঙ্গে বমি হইতে থাকে। এই অবস্থায় রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে।

অজীর্ণ বা ডায়েরিয়া রোগে রোগীর খাদ্য-দ্রব্য পরিপাক করিবার শক্তি থাকে না। সুতরাং এই অবস্থায় উহাকে ২।১ দিন কিছু খাইতে না দেওয়াই উচিত। ইহাতে পরিপাক-যন্ত্রগুলি কিছুটা বিশ্রাম পাইয়া আবার সতেজ হইয়া উঠিবে। তবে মাঝে মাঝে উহাকে জল খাইতে দিতে হয়। জল ভিতরের সমস্ত দূষিত পদার্থ ধুইয়া বাহির করিয়া দেয়। ঘন ঘন পায়খানা ও বমি হইতে থাকিলে রোগীর দেহের ভাইটামিন-সমূহের বিশেষতঃ থায়ামিন ও ভাইটামিন 'সি'-এর অপচয় হয়। দেহে এই সকল ভাইটামিন তেমন মজুত থাকে না। সুতরাং রোগীকে প্রথম হইতেই এই সকল ভাইটামিন সরবরাহ করিতে হয়। তাহা না হইলে রোগীর ক্ষুধাতৃষ্ণা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইয়া আরও দুরারোগ্য রোগের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। সুতরাং রোগীকে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প লেবুর রস জলের সহিত মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। পায়খানা ও বমির সহিত প্রচুর ধাতব লবণ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। লেবুর রসের ধাতব লবণ এই অভাবও কিছুটা পূরণ করিবে। কি সুস্থ কি রুগ্ন যে কোন অবস্থায় আমাদের দেহযন্ত্রগুলি অনবরতই কাজ করিয়া থাকে। রুগ্ন অবস্থায় আমরা বিছানায় শুইয়া থাকিলেও এই সকল কাজের জন্য আমাদের কিছু শক্তি খরচ করিতে হয়। অজীর্ণ বা ডায়েরিয়া রোগীর এই শক্তি দেহের মজুত খাদ্যভাণ্ডার হইতেই আসিবে। ইহাতে রোগীর শরীর একটু দুর্বল হইয়া পড়িবে। তবুও যতক্ষণ পায়খানা ও বমি বন্ধ না হয় এবং পেটফাঁপা প্রভৃতি কমিয়া ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ রোগীকে শুধু লেবুর রস ও জলই খাইতে দেওয়া উচিত। এই সময় অন্য কোন খাদ্য খাইতে দিলে রোগী তাহা পরিপাক করিতে পারিবে না। ফলে রোগ আরও বৃদ্ধি পাইবে। শেষের দিকে যখন পায়খানা, বমি প্রভৃতি হ্রাস পাইয়া ক্ষুধার উদ্রেক হইতে থাকিবে তখন লেবুর রসের সহিত গ্লুকোজ বা ল্যাক্টোজও দেওয়া যাইতে পারে। ২।৩

দিন পরে যখন রোগের উপসর্গ সব চলিয়া যাইবে তখন প্রথমে তরল ও লঘুপাক খাদ্য হইতে আরম্ভ করিতে হইবে। প্রথমেই রোগীকে শক্ত খাদ্য দেওয়া উচিত নয়, কারণ, শক্ত খাদ্য পরিপাক করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই প্রাথমিক খাদ্যে ভাইটামিন ও ধাতব লবণের চাহিদা পুরাপুরিই মিটাইতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতির সাহায্যে উহার ক্যালরির চাহিদা ক্রমান্বয়ে বাড়াইয়া দেহের ক্ষয়পূরণেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। তবে এই খাদ্য যাহাতে লঘুপাচ্য হয় সেইদিকে নজর রাখিতে হইবে। তরল ও সহজপাচ্য খাদ্য হিসাবে দুধ-বার্লি একটি আদর্শ খাদ্য। দুধে প্রোটিন, ভাইটামিন ও ধাতবলবণ এবং বার্লিতে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট আছে। সুতরাং দেহের ক্ষয়পূরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহা ক্যালরির চাহিদাও পূরণ করিবে। প্রথম দিন এই দুধ-বার্লিই ২৷৩ বার এবং সঙ্গে সঙ্গে কমলালেবু, পাতিলেবু ইত্যাদির রস খাইতে দেওয়া উচিত। দ্বিতীয় দিনে এই দুধ-বার্লির পরিবর্তে মিহিচালের ভাত, ছোট ও টাটকা মাছের ঝোল, শুকতো প্রভৃতি লঘুপাচ্য খাদ্য ও দুধ দেওয়া যাইতে পারে। এই সময় শাক-সবজি ইত্যাদি সেল্যুলোজ জাতীয় খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। কারণ সেল্যুলোজ জাতীয় খাদ্য দুষ্পাচ্য। ডালের পরিবর্তে ডালের জল দেওয়া যাইতে পারে। ডালের প্রোটিন পরিপাকের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে। কিন্তু ডালের জলে প্রধানতঃ ডালের ধাতব লবণ ও ভাইটামিনসমূহ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। সুতরাং ডালের জল যেমন সহজপাচ্য তেমনি উপকারী। ২৷৩ দিন এই সকল খাদ্য খাইয়া রোগী যখন বেশ সুস্থ ও সবল হইবে তখন তাহার স্বাভাবিক খাদ্যে ফিরিয়া আসিতে হইবে।

* লঘুপাচ্য আহার
(Bland Diet)

যেসব খাদ্য দেহে রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে না এবং পাকস্থলীর ক্ষরণ কমায় তাহাকে লঘুপাচ্য খাদ্য বলে। পাকস্থলী এবং আন্ত্রিক ক্ষতের (gastric and duodenal ulcer) রোগীদের উপসর্গগুলি প্রশমিত হইয়া আসিলে এই খাদ্য দেওয়া চলে। তন্তু এবং খাদ্যের স্নেহ পদার্থের পরিমাণের পরিবর্তন করিয়া এবং কমাইয়া উহাকে উদরাময় এবং আন্ত্রিক প্রদাহের পীড়ায়ও দেওয়া চলে।

খাদ্য গ্রহণের নীতি :

নিম্নলিখিত খাদ্য খাদ্য-তালিকা হইতে বাদ দিতে হইবে :—

(১) সমস্ত ভুষিযুক্ত খাদ্য এবং মোটাদানার শস্যকণা।
(২) ফলের খোসা ও বীচি।
(৩) কাঁচা তরকারি।
(৪) বাঁধাকপি, বীন, ঢেঁড়স, করলা ও উচ্ছে।
(৫) সমস্ত রকম মশলা।

---

* Source : Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institute of Nutrition, ICMR, 1971.

(৬) ভাজা খাবার।

(৭) উত্তেজক পানীয়।

(৮) আচার ও চাটনি।

(৯) ডাবের জল।

(১০) চকোলেট, পুডিং এবং অনুরূপ খাদ্যবস্তু।

(১১) মাংসের নির্যাস ও স্যুপ।

খাদ্যের নমুনা :

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
ভাত	৯০	৯০
ময়দার রুটি	৩০	৩০
আলু	৭৫	৭৫
তরকারি	১০০	১০০
দুধ	১০০০ মি. লি	১০০০ মি. লি,
দই	২০০	২০০
মাখনতোলা দুধ	৭৫	৫০
কমলালেবুর রস	২৫০ মি, লি.	২৫০ মি. লি.
চিনি	৩০	৩০
মাখন	৯০	১০
ঘি অথবা তেল*	২৫	২৫
ডিম	—	২টি

এইরূপ খাদ্যে

ক্যালরির পরিমাণ	২০০০
প্রোটিন	৮০ গ্রাম
স্নেহ	৯০ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	২২০ গ্রাম

স্থূলকায় ব্যক্তির খাদ্য অথবা স্বল্প তাপযুক্ত খাদ্য

(Diet during overweight and obesity or low calorie diet)

অত্যধিক মোটা এবং অত্যধিক ওজনবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে বিরল নয়। ইহা অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। দেহের অত্যধিক ওজনে হৃদ্‌যন্ত্রের রোগ, বহুমূত্র, বাত ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হইতে পারে। মোটা লোক অল্পতেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে

* রন্ধনের জন্য এই পরিমাণ তেল অথবা ঘি ব্যবহার করা যায়।

এবং প্রায়ই তাহাদের পিঠ ব্যথা, পা ব্যথা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার শারীরিক অসুবিধার কথা বলিতে শুনা যায়। সুতরাং অত্যধিক মোটা হওয়া মোটেই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। বয়স এবং উচ্চতা অনুযায়ী শরীরের ওজন ঠিক রাখিতে পারিলেই দেহ সুস্থ ও সুন্দর হইবে। স্বাভাবিক ওজনের (Normal weight) শতকরা ১০ ভাগ কম বা বেশী ওজন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয় না। শতকরা ১০ ভাগের বেশী ওজন বৃদ্ধি পাইলেই শরীর অসুস্থ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে ওজন কমাইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতে হয়। শতকরা ২০ ভাগ ওজন বৃদ্ধিকেই obesity নামক রোগের লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়।

অতিরিক্ত মোটা বা ওজন বৃদ্ধি হওয়ার কারণ ঃ অনেকের ধারণা এই যে মোটা হওয়া একটি বংশগত ধারা। আসলে কিন্তু বংশের সহিত মোটা হওয়ার কোন সম্বন্ধই নাই। অনেক সময় এমন দেখা যায় যে কোন পরিবারে আবহমান কাল হইতেই মাখন, ঘি, চিনি ইত্যাদি অত্যধিক তাপমূল্যের খাদ্য বহুল পরিমাণে খাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই ক্ষেত্রে অবশ্য মোটা হওয়া প্রায় বংশগত পর্যায়ে দাঁড়াইতে পারে। কিন্তু আসল কারণ হইতেছে প্রয়োজনের অধিক তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ।

আবার অনেক সময় পেশা পরিবর্তন করায়ও লোক অত্যধিক মোটা হইয়া যায়। যদি একজন কাঠুরিয়া কাঠ কাটা পরিত্যাগ করিয়া দর্জির কাজ গ্রহণ করে এবং তাহার দৈনিক খাদ্য-তালিকার কোনরূপ পরিবর্তন না করে তবে সে অচিরেই অত্যধিক মোটা হইয়া obesity রোগে আক্রান্ত হইবে। একজন কাঠুরিয়ার দৈনিক প্রায় ৩৯০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু একজন দর্জির দৈনিক ২৮০০ ক্যালরি তাপমূল্যের খাদ্য হইলেই চলিতে পারে। সুতরাং পূর্ব খাদ্য-তালিকার কোন পরিবর্তন না করিলে প্রত্যহ ৩৯০০—২৮০০=১১০০ ক্যালরির খাদ্য-দ্রব্য তাহার দেহে মেদ বা চর্বিতে পরিণত হইয়া জমিতে থাকিবে। ফলে তাহার দেহ যেমন মোটা হইবে তেমনি ওজনও বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। দৈনিক ১০০ ক্যালরির খাদ্য-দ্রব্য দেহে জমা হইতে থাকিলে এক সপ্তাহে প্রায় ৭৮ গ্রাম মেদ সৃষ্টি হয় অর্থাৎ একবৎসরে ৯ পাউন্ড ওজন বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দৈনিক ১১০০ ক্যালরি তাপমূল্যের খাদ্যদ্রব্য দেহে উদ্বৃত্ত হইতে থাকিলে বৎসরের শেষে দেহের যে অবস্থা হইবে তাহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

অনেকে আবার যৌবনের খাদ্য বৃদ্ধ বয়সেও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। বৃদ্ধ বয়সে সাধারণতঃ খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমিয়া যায়। সুতরাং যৌবনের অভ্যাস পরিত্যাগ না করিলে বৃদ্ধ বয়সে অতিরিক্ত খাদ্যের জন্য দেহ স্থূলকায় হইয়া পড়িবে।

কেহ কেহ আবার বাড়ীতে কম খায়, কিন্তু হোটেল, রেস্তোরাঁয় মাখন, টোস্ট, মাংস, আইসক্রীম, কেক, রুটি, মোগলাই পরটা, শরবত ইত্যাদি উচ্চ তাপমূল্যের খাদ্য প্রচুর পরিমাণে খাইয়া থাকে। তাহারা প্রায়ই এই ভাবিয়া আশ্চর্য হয় যে অল্প খাইয়াও কি করিয়া দিন দিন মোটা হইতেছে।

সুতরাং প্রয়োজনের অধিক তাপ-মূল্যের খাদ্য-দ্রব্য প্রত্যহ গ্রহণ করিবার অভ্যাসই অত্যধিক মোটা হইবার বা ওজন বৃদ্ধি পাইবার সর্বপ্রধান কারণ।

আবার অনেক সময় থাইরয়েড (Thyroid) এবং পিটুইটারী (Petuitary) গ্রন্থি হইতে উপযুক্ত হরমোন (Hormone) নিঃসৃত না হওয়ায় মেটাবলিজম্

(metabolism) ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে দেহ স্থূলকায় হয় এবং ওজন বৃদ্ধি পায়। তবে এই কারণে মোটা হওয়া লোকের সংখ্যা শতকরা ৫ ভাগেরও কম।

সুতরাং অতিরিক্ত মোটা হইবার দ্বিতীয় কারণ দেহে প্রয়োজনীয় হরমোনের অভাব

চিকিৎসা ঃ দেহের মেদ বা ওজন কমাইবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে দৈনিক খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন করিয়া প্রয়োজনীয় ক্যালরি অপেক্ষা প্রত্যহ কিছু কিছু কম ক্যালরি বা তাপমূল্যের খাদ্য গ্রহণ করা। দৈনিক প্রয়োজনীয় মোট ক্যালরি হইতে ৮০০—১০০০ ক্যালরি বাদ দিলে মাসে প্রায় ৬—৮ পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইবে। এই ব্যবস্থাই স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। দ্রুত ওজন কমাইবার জন্য অত্যধিক ক্যালরি হ্রাস করিলে শরীর ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। প্রতি সপ্তাহে ওজন লইয়া দেখিতে হইবে যে দেহের ওজন নির্দিষ্ট অনুপাতে হ্রাস পাইতেছে কিনা। অনেক সময় শরীরে জল জমিবার জন্য পর পর ২।৩ সপ্তাহ দেহের কোন ওজন হ্রাস পাইতে দেখা যায় না। এইজন্য অনেকেই নিরাশ হইয়া পড়ে। এইরূপ ক্ষেত্রে নিরাশ না হইয়া ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিতে হয়।

খাদ্য-তালিকার পরিবর্তনের সাথে সাথে শারীরিক পরিশ্রমের পরিমাণও একটু বাড়াইয়া দেওয়া ভাল। ইহাতে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়।

অনেকে ওজন হ্রাস বা অতিরিক্ত মেদ হ্রাস করিবার জন্য নানাপ্রকার ঔষধের সাহায্য লইয়া থাকে। এক্ষেত্রে তাহাদের মনে রাখা উচিত যে খাদ্য-তালিকার পরিবর্তন না করিয়া শুধু ঔষধ গ্রহণ করিলে কোন সুফল ফলিবে না। কিছুদিন পূর্বে ডাইনাট্রো ফেনল (Dinitro Phenol) অতিরিক্ত মেদ কমাইবার জন্য ব্যবহার করা হইত। ইহা দেহের মেটাবলিজম্ (metabolism) বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত মেদ কমাইতে সাহায্য করে। কিন্তু এই ঔষধের অত্যধিক বিষক্রিয়ার জন্য আজকাল আর উহা ব্যবহার করা হয় না। অ্যামফেটামাইন (Amphetamine) এই জাতীয় আর একটি ঔষধ এবং ইহাও বিষাক্ত। শরীরকে অত্যধিক উত্তেজিত করিয়া ইহা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ইহা ছাড়া পেটের নানাপ্রকার রোগও এই ঔষধ ব্যবহারে দেখা দেয়। অন্যান্য যে সকল ঔষধ প্রচলিত আছে তাহার সমস্তই শরীরে নানাপ্রকার বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুতরাং ঔষধের সাহায্যে মেদ বা ওজন হ্রাস করিবার চেষ্টা না করাই ভাল।

খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিবার নীতি ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে খাদ্যের ক্যালরি মূল্য কমাইয়া খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানই দেহে তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে সাধারণতঃ খাদ্যের কার্বোহাইড্রেট এহং স্নেহ পদার্থের পরিমাণ কমাইয়াই ক্যালরির পরিমাণ হ্রাস করিতে হয়। খাদ্যের ক্যালরি হ্রাস করিবার জন্য প্রোটিনের পরিমাণ কমানো চলিবে না। প্রোটিন দেহ নির্মাণ এবং দেহের ক্ষয়পূরণের শ্রেষ্ঠ উপাদান। সুতরাং প্রোটিনের অভাব হইলে শরীর ভাঙিয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। ইহা ছাড়া প্রোটিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত পেটে থাকে বলিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতেও ইহা সহায়তা করিয়া থাকে। সুতরাং মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি বিশেষ কমানো চলিবে না। খাঁটি দুধ অপেক্ষা মাখন তোলা দুধ এই সময় বেশী উপকারী। অনেকে স্নেহ পদার্থ খাদ্য হইতে সম্পূর্ণরূপে

বর্জন করেন। কিন্তু সামান্য স্নেহ পদার্থ খাদ্যে থাকিলে খাদ্য খাইয়া তৃপ্তি হয় এবং ইহার সহিত কিছু ভাইটামিনও পাওয়া যায়। তেল, ঘি, বনস্পতি বাদ দিয়া সামান্য মাখন খাওয়া যাইতে পারে। তবে এই মাখনের পরিমাণও পূর্বাপেক্ষা কমাইতে হইবে। চিনি, গুড়, মিষ্টান্ন, আলু, রুটি, জেলী, মিশ্রি, কেক, যে কোন ভাজা দ্রব্য একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। চকোলেট, আইসক্রীম ইত্যাদিও উচ্চ তাপমূল্যের খাদ্য। সুতরাং ঐ সকল বর্জনীয়।

খাদ্যের ভাইটামিন ও ধাতব লবণের পরিমাণ কোন প্রকারেই কমানো চলিবে না। ইহাদের অভাব হইলে শরীর রুগ্ন ও অসুস্থ হইবে এবং দেহ ভাঙিয়া পড়িবে। খাদ্যের ক্যালরি হ্রাস করিবার ফলে যদি ভাইটামিন এবং ধাতব লবণের হ্রাস ঘটে তবে ঐ অভাব অন্য প্রকার খাদ্য হইতে পূরণ করিতে হইবে। সুতরাং খাদ্যে তরি-তরকারি, শাক-সবজি ও ফলমূলের পরিমাণ হ্রাস না করিয়া বরং এই সময় বাড়াইতে হয়। ক্যালরি কমাইবার জন্য অনেক সময় ক্ষুধাবোধ হইতে পারে। ক্ষুধাবোধ হইলে, ফলমূল তরি-তরকারির সাহায্যেই তাহা পূরণ করিতে হইবে।

নিচে একজন মেদবহুল ব্যক্তির খাদ্যের নমুনা দেওয়া হইল ঃ

খাদ্য নির্বাচনের রীতি ঃ

মেদবহুল ব্যক্তির খাদ্য পরিকল্পনার সময় নিম্নলিখিত খাদ্য বর্জন করিয়া চলিবে ঃ—

(১) মিষ্টি, চকোলেট, গুড়, জ্যাম, মধু, সংরক্ষিত খাদ্য, পুডিং, কেক ইত্যাদি।
(২) কন্দ ও মূল।
(৩) ভাজা খাবার।
(৪) শুষ্ক ফল ও বাদাম।
(৫) উত্তেজক এবং চিনিমিশ্রিত যে কোন পানীয়।
(৬) ক্রীম ও স্নেহপদার্থ।
(৭) কলা, আতা, খেজুর প্রভৃতি মিষ্টি ফল।

*** খাদ্যের নমুনা ঃ**

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
গমের রুটি	৬০	৯০
ভাত	৩০	৬০
অন্যান্য সবজি	২০০	২০০
সবুজ শাকসবজি	২০০	২০০
ডাল	৫০	৩০
টকজাতীয় ফল অথবা টমেটো	২০০	২০০

* Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institution of Nutrition, ICMR, Hyderabad, 1971.

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
গরুর দুধ	৬০০ মি. লিটার	২৫০ মি. লি.
মাখনতোলা দুধ	২০	—
তেল অথবা ঘি	৭	১২
স্বল্প মেদযুক্ত মাছ	—	৫০ গ্রাম
ডিম	—	১টি

এই খাদ্যে—

ক্যালরির পরিমাণ	১২০০
প্রোটিন	৬০ গ্রাম
স্নেহ পদার্থ	৩০ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	১৭০ গ্রাম

কৃশ ব্যক্তির খাদ্য অথবা অধিক তাপযুক্ত খাদ্য

(Diet during underweight or high calorie diet)

অতিরিক্ত মোটা হওয়া যেমন অস্বাস্থ্যের লক্ষণ তেমনি অতিরিক্ত কৃশ হওয়া বা দেহের অতিরিক্ত ওজন কমিয়া যাওয়াও অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ। দেহের স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা শতকরা দশভাগের বেশী ওজন হ্রাস পাইলেই ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া জানিবে। অতিরিক্ত ওজন হ্রাস পাইলে শরীর যক্ষ্মা ইত্যাদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। নিম্নলিখিত কারণে দেহের ওজন স্বাভাবিক অপেক্ষা কম হইতে পারে ঃ

(১) যক্ষ্মা প্রভৃতি ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হইলে দেহের ওজনের হ্রাস ঘটে। (২) কখনও কখনও থাইরয়েড গ্রন্থির (Thyroid gland) কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাইবার জন্য দেহের ওজন হ্রাস পায়। (৩) পরিপাক যন্ত্র ঠিকমত কাজ না করিলে দেহ প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে না। এইজন্যও দেহের ওজন হ্রাস হইতে পারে। (৪) নিদ্রাহীনতা, অনিয়মে খাওয়া, অথবা উপযুক্ত খাদ্যের অভাবেও ওজন হ্রাস ঘটিতে পারে।

খাদ্য-ব্যবস্থা ঃ যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জন্য ওজন হ্রাস ঘটিলে প্রথমে ঐ রোগ আরোগ্য করিতে হইবে। রোগ আরোগ্য হইলে খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তন করিলেই ওজন বৃদ্ধি পাইবে। খাদ্যদ্রব্য এমনভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে যেন দৈনিক প্রয়োজনীয় ক্যালরি অপেক্ষাও খাদ্যে প্রায় ৩০০ ক্যালরি অধিক তাপ বা শক্তি থাকে। প্রতিদিন এইভাবে ৩০০ ক্যালরি অতিরিক্ত তাপমাত্রার খাদ্য গ্রহণ করিলে সপ্তাহে প্রায় আধ পাউন্ড ওজন বৃদ্ধি পাইবে। প্রতি সপ্তাহে দেহের ওজন পরিমাপ করিয়া প্রয়োজনীয় ক্যালরি খাদ্য হইতে পাওয়া যাইতেছে কিনা দেখিতে হইবে।

প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। যদি এই সময় কোন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ হইয়া থাকে তবে ঐ রোগের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য প্রোটিনের পরিমাণ অবশ্যই বেশ কিছু বাড়াইতে হইবে।

ভাইটামিন এবং খনিজ লবণের অভাব যদি পূর্বে লক্ষিত হইয়া থাকে তবে শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদি দ্বারা উহা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে হইবে।

খাদ্য নির্বাচনের নীতি ঃ

রোগীর যদি জ্বর থাকে অথবা দীর্ঘদিন রোগেভোগের পর আরোগ্যলাভ করিতে থাকে তবে নিম্নলিখিত খাদ্য বর্জন করিয়া চলিবে ঃ

(১) ভাজা খাবার
(২) শুষ্ক ফল ও বাদাম

খাদ্যের নমুনা

কাঁচা অবস্থায় খাদ্যের পরিমাণ

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
শস্যদানা	২৫০	৩০০
ডাল	১০০	৫০
কন্দ ও মূল	৫০	৭৫
অন্যান্য শাকসবজি	৫০	৫০
রুটি	৬০	৬০
মাখন	১০	২০
দুধ	৭৫০ মি. লিটার	৩০০ মি. লি.
দই	১০০	—
চিনি	৫০	৫০
ঘি অথবা তেল	৩০	৩০
কলা	১৫০	২৫০
ডিম	—	১টি
মাছ অথবা মাংস	—	১০০

এই খাদ্যে—

ক্যালরির পরিমাণ	২৭০০
প্রোটিন	৮০ গ্রাম
স্নেহ	৭০ "

* স্বল্প স্নেহযুক্ত খাদ্য
(Low Fat Diet)

স্বাভাবিক খাদ্য তবে দিনে প্রায় ২০ গ্রাম স্নেহ পদার্থ কমাইবার চেষ্টা করা হয়। পিত্তস্থলী (Gall bladder), যকৃত (liver), অগ্ন্যাশয়ের পীড়া (pancreatic diseases) এবং খাদ্যের চর্বি জারিত বা শোষিত না হইলে (steatorrhea) এইরূপ স্বল্প স্নেহযুক্ত খাদ্যের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

* Source : Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institute of Nutrition, ICMR, 1971.

খাদ্য নির্বাচনের নীতি ঃ

নিম্নলিখিত খাদ্য বর্জন করিয়া চলিতে হয় ঃ

(১) বাদাম, চিজ প্রভৃতি অধিক স্নেহযুক্ত খাদ্য।

(২) ভাজা খাবার।

(৩) ক্রীম ও স্নেহ পদার্থ।

খাদ্যের নমুনা

খাদ্যবস্তু	নিরামিষ (গ্রাম)	আমিষ (গ্রাম)
শস্যদানা	২০০	২৫০
ডাল	১০০	৭৫
গরুর দুধ	—	১০০ মি. লি.
মাখন তোলা দুধ	৫০	—
গরুর দুধের দই	২০০	—
সবুজ শাকপাতা	১০০	১০০
অন্যান্য তরকারি	১০০	১০০
আলু	৫০	৫০
চিনি	৫০	৫০
কলা	৭৫	৭৫
কমলালেবু	১০০	১০০
রন্ধনে ব্যবহৃত ঘি বা তেল	৭	৫
মাছ বা মুর্গীর মাংস	—	১০০
ডিম	—	১টি

এই খাদ্যে—

ক্যালরির পরিমাণ	২১০০
প্রোটিন	৭৫ গ্রাম
স্নেহ	২০ গ্রাম
কার্বোহাইড্রেট	৪০০ গ্রাম

---

* Source : Some Therapeutic Diets : Swaran Pasricha, National Institute of Nutrition, ICMK, 1971.

* পরিমিত লবণযুক্ত খাদ্য
(Low Sodium Diet)

স্বাভাবিক খাদ্য তবে লবণের পরিমাণ ইহাতে স্বল্প থাকে। এইরূপ খাদ্য-প্রস্তুতির সময় লবণ ব্যবহার করা হয় না এবং উচ্চ লবণযুক্ত খাদ্য বর্জন করিয়া চলা হয়। সাধারণতঃ শোথ (Oedema), বৃক্কের প্রদাহ (nephritis), কোন হৃৎপিণ্ডের পীড়া (Cardiac diseases), গর্ভাবস্থায় বিপাকক্রিয়াঘটিত বিষক্রিয়া (toxemia) এবং রক্তচাপের (hypertension) বেলায় এই খাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

খাদ্য নির্বাচনের রীতি ঃ

খাদ্য নির্বাচনের সময় নিম্নলিখিত খাদ্য বর্জন করিয়া চলিবে—

(১) রন্ধনে লবণের ব্যবহার কিংবা পাতে লবণ খাওয়া।
(২) সামুদ্রিক মাছ, লবণ দ্বারা জারিত মাংস, শুষ্ক মাছ ও মেটে ইত্যাদি।
(৩) লবণাক্ত মাখন ও চিজ।
(৪) যেসব খাদ্যে লবণ অথবা খাইবার সোডা (Baking soda) ব্যবহার করা হইয়াছে।
(৫) আচার ও চাটনি।

খাদ্যের নমুনা

খাদ্যবস্তু	আমিষ (গ্রাম)	নিরামিষ (গ্রাম)
ভাত	২০০	২২৫
ডাল	১০০	৭৫
ফল	২০০	২০০
তরকারি	২০০	২০০
আলু	১০০	১২৫
গরুর দুধ	৩০০ মি. লি.	২০০ মি. লি.
মাখন তোলা দুধ	৭৫	২৫
তেল	৩০	৩০
চিনি	৫০	৫০
মাছ বা মাংস	—	১০০
ডিম	—	১টি

এই খাদ্যে—

ক্যালরির পরিমাণ	২২০০
প্রোটিন	৮০ গ্রাম
সোডিয়াম (সোডিয়াম রূপে)	১ গ্রাম

* Source : Some Therapeutic Diets, Swaran Pasricha, National Institute of Nutrition, ICMR, Hyderabad, 1971.

C. সমাজের জন্য পুষ্টি
(Nutrition for the Community)
1. খাদ্যের অভাবজনিত রোগ
(Common deficiency diseases in India)

আমাদের দেশের অধিকাংশ জনসাধারণ খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের কি খাওয়া উচিত এই জ্ঞান অনেকেরই নাই। আমাদের যাহাদের খাদ্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান আছে তাহাদের আবার অর্থের অভাব। অর্থের অভাবে তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পারে না। আবার অনেকে বংশগত ধারা বজায় রাখিতে গিয়া পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে দেশের বহু লোক নানাপ্রকার রোগে ভুগিয়া অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে ১-৬ বৎসর বয়সের শিশুরাই অভাবজনিত রোগে অধিক ভোগে। আমাদের দেশের মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৪০ ভাগ হইতেছে এই শিশু। তাছাড়া গর্ভিণী ও প্রসূতিদের মধ্যেও অনেকে এই অভাবজনিত রোগে ভুগিতেছে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে যে সকল রোগ আমাদের দেশে দেখা যায় তার মধ্যে কোয়াশিওরকর, ম্যারাসমাস রাতকানা রোগ, অন্ধত্ব, রক্তাল্পতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জনসাধারণের খাদ্য-দ্রব্য পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে তাহাদের খাদ্যে প্রধানতঃ প্রোটিন, ক্যালরি, ভাইটামিন 'এ', 'বি' ও লৌহের অভাব সর্বাপেক্ষা অধিক। ১-৬ বৎসরের শিশুদের খাদ্যে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ ক্যালরি করিয়া ঘাটতি পড়ে। প্রোটিনের পরিমাণে ঘাটতি অবশ্য সামান্যই; কিন্তু যে সকল প্রোটিনজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা হয় তাহাতে প্রধানতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনই থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন যাহা দেহ গঠনে বিশেষ উপযোগী তাহা তাহারা সামান্যই খায়। ইহার একটি বড় কারণ এই যে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনজাতীয় খাদ্য যথা, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি একেবারে অগ্নিমূল্য এবং আমাদের অধিকাংশ জনসাধারণ অতিশয় দরিদ্র। ফলে মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি তাহারা সংগ্রহ করিতে পারে না। এই প্রোটিন-ক্যালরির অভাবের জন্য দরিদ্র শিশুদের মধ্যে কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাস—এই দুইটি রোগ যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। ভাইটামিন 'এ'-র অভাবে লক্ষ লক্ষ শিশু দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া অকালে অন্ধ হইয়া যাইতেছে। লৌহঘটিত খাদ্যের অভাবে গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদের মধ্যে রক্তাল্পতা রোগ বৃদ্ধি পাইতেছে। শিশু প্রধানতঃ মায়ের দুধের উপরই নির্ভর করে এবং দুধে উপযুক্ত পরিমাণে লৌহ না থাকায় শিশুরা রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। কোন কোন খাদ্যে 'বি' ভাইটামিনের অভাবও দেখা যায়। ফলে মুখে, জিভে ও মুখের কোনায় ঘা হয়। আবার যাহারা অতিরিক্ত খেসারীর ডাল খায় তাহারা ল্যাথিরিজম (Lathyrism) নামক এক প্রকার রোগে ভোগে। এই রোগে দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অবশ হইয়া যায়। মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে এই রোগ অধিক পরিমাণে দেখা যায়। জোয়ার যাহাদের প্রধান খাদ্য তাহাদের মধ্যে পেলেগ্রা রোগ দেখা যায়। নিকোটিনিক অ্যাসিডের অভাবে এই রোগ হয়। এই রোগটি প্রধানতঃ দাক্ষিণাত্যে অধিক পরিমাণে এবং ভারতের অন্যান্য জায়গায় অল্পবিস্তর দেখা যায়। নিম্নে প্রোটিন-ক্যালরি, ভাইটামিন 'এ' ও লৌহের অভাবজনিত রোগ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইল ঃ

প্রোটিন-ক্যালরিজনিত অপুষ্টি
(Protein-Calorie malnutrition)

উপযুক্ত প্রোটিনজনিত ক্যালরির অভাবে যে সকল উপসর্গ দেখা দেয় তাহাকে **কোয়াশিওরকর** (Kwashiorkor) বলে। সিসিলি উইলিয়ামস (Cicely Williams) নামে একজন শিশুবিদ্ পশ্চিম আফ্রিকার শিশুদের মধ্যে মাই ছাড়াইবার সময় এই ব্যাধিটি লক্ষ্য করেন এবং দুগ্ধ পান করাইয়া তিনি উহা নিরাময় করিতে সমর্থ হন। কোয়াশিওরকর শব্দটির দেশজ অর্থ হইল "নতুন শিশুটি জন্মাইবার পরে অগ্রজর মধ্যে যে ব্যাধি দেখা দেয়।" উইলিয়ামস সর্বপ্রথম এই নামটি ব্যবহার করিতে শুরু করেন এবং এইভাবে প্রোটিনজনিত ক্যালরির অপুষ্টি ব্যাধিটি আজ কোয়াশিওকর নামে সারা বিশ্বে প্রচলিত হইয়াছে। পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলিতে বিশেষতঃ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার যেসব অঞ্চলে প্রয়োজনের তুলনায় কম প্রোটিন উৎপাদন করা হয় সেইসব অঞ্চলে এই রোগটির আধিক্য দেখা দেয়। শিশুরাই এই ব্যাধির শিকার হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ১-৬ বৎসরের শিশুদের একটি বৃহৎ অংশ এই রোগের কবলে পড়ে। কারণ এই সময় শিশুরা হাঁটাচলা ও দৌড়াদৌড়ি করিতে শেখে। ফলে তাহাদের প্রোটিন-ক্যালরির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং শিশুদের যদি উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া না হয় তবে তাহারা প্রোটিন-ক্যালরিজনিত অপুষ্টিতে ভুগিবে।

প্রোটিন ও ক্যালরির অভাব হইলে শিশুদের নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। ইহার মধ্যে একটি প্রধান উপসর্গ এই যে শিশুর বয়স অনুযায়ী তাহাদের উচ্চতা বিশেষতঃ ওজন বৃদ্ধি পায় না। আর অন্য যেসব উপসর্গ দেখা দেয় সেগুলি এই :

(১) শিশু ঠিকমত বাড়ে না, ক্রমেই রোগা হইয়া যাইতে থাকে। সব সময় ঘ্যান ঘ্যান করে অথচ ঠিকমত খায় না।

(২) চামড়া শুকাইয়া খসখসে হইয়া যায় এবং সঙ্গে মৃদু অ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

(৩) গায় চর্বি বা মেদ জমে না। নানারকম ঘা ও চর্মরোগ দেখা দেয়।

(৪) মাথার চুল পাতলা হইয়া আসে, চুলের রঙ কটা হয় এবং চুল টানিলেই উঠিয়া আসে, কোন ব্যথা বোধ হয় না।

(৫) মুখখানা বিবর্ণ দেখায়, শিশু খাদ্যদ্রব্য হজম করিতে পারে না এবং ঘন ঘন পেট খারাপ হয়। যকৃতে চর্বি (fatty liver) জমে এবং যকৃত স্ফীত হয়।

(৬) মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। ফলে মানসিক গুণের বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(৭) বিভিন্ন দেহকলায় জল জমিয়া রসস্ফীতি (Oedema) দেখা দেয় এবং রোগ-প্রতিরোধশক্তি কমিয়া যায়।

প্রাক্ কোয়াশিওরকর হইতে কোয়াশিওরকর পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের এইগুলি হইল সুস্পষ্ট লক্ষণ।

রোগের কারণ : বয়স্কদের চেয়ে শিশুর প্রোটিনের প্রয়োজন বেশী। একজন বয়স্ক লোকের যেখানে প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে গড়ে ১ গ্রাম প্রোটিনের প্রয়োজন শিশুর প্রয়োজন সেখানে প্রতি কিলোগ্রামে ২ গ্রাম করিয়া প্রোটিন এবং তারও দুই-তৃতীয়াংশ

হওয়া উচিত প্রাণিজ প্রোটিন বা মিশ্র প্রোটিন। প্রধানতঃ দারিদ্র্য এবং খাদ্যসম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ শিশুরা তাহাদের প্রকৃত খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়। ফলে দেখা দেয় প্রোটিন-জনিত ক্যালরির অভাব। শিশুর অপুষ্টির অন্যান্য যেসব কারণ থাকে সেগুলি এই ঃ

(১) দীর্ঘ দিন ধরিয়া শিশুকে মাতৃস্তন্য পান করান এবং বিলম্বে তাহাকে বদলি খাদ্যের অভ্যাস করান।

(২) অপর্যাপ্ত বদলি খাদ্য দেওয়া। শিশুকে মাই ছাড়াইবার সময় কিংবা পরে অনেক দিন পর্যন্ত যদি তাহাকে প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, রুটি, মুড়ি, সাগু, বার্লি, চিনি কিংবা মিশ্রির উপরে রাখা হয় তবে শিশু অপুষ্টিতে ভুগিবে।

(৩) অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন বাসনপত্র ভালভাবে না ফুটাইয়া তাহাকে খাওয়ানর ফলে ঘন ঘন পেট খারাপের প্রবণতা দেখা দেয়।

(৪) পেটের পীড়া উপশমের জন্য সর্বপ্রকার খাদ্য বন্ধ করিয়া প্রধানতঃ ওষুধের উপর রাখা হয়।

ম্যারাসমাস (Marasmus) ঃ খাদ্যে প্রোটিনের সহিত মোট ক্যালরির অভাবকে **ম্যারাসমাস** বলে। এই ব্যাধিতে শিশুর দেহ সুগঠিত হয় না। শরীরটি ক্রমশঃ



কোয়াশিওরকর



ম্যারাসমাস

শুকাইয়া অস্থিচর্মসার হয়। এটি একটি অনাহারজনিত শিশুব্যাধি। কোন কারণে শিশু মাতৃস্তন্য পানে ব্যর্থ হইলে কিংবা যে খাদ্য খাইতেছে দেহে যদি তাহা না

লাগে অর্থাৎ পুষ্টিসাধনে ব্যর্থ হয় তবে শিশু ম্যারাসমাসের কবলে পড়ে। ঘন ঘন পেট খারাপ এই ব্যাধিটির অন্যতম মূল কারণ। অনূর্ধ এক বছরের শিশুরাই এই ব্যাধির শিকার হয়। এই রোগে যকৃতে চর্বি জমে না ও রসস্ফীতি হয় না। দেহে চর্বির লেশমাত্র থাকে না। হাত পা শীর্ণ হইয়া যায়, পঞ্জরাস্থি স্পষ্ট দেখা যায় এবং যকৃতের বিকার (Cirrhosis of liver) ঘটে। রক্তাল্পতা ও চরম দৌর্বল্য দেখা দেয়।

কোয়াশিওরকর ও ম্যারাসমাসের তুলনা

	কোয়াশিওরকর	ম্যারাসমাস
(১)	প্রোটিনজনিত ক্যালরির অভাব দেখা দেয়।	প্রোটিনের সহিত মোট ক্যালরির অভাব ঘটে।
(২)	১২—৪৮ মাস বয়সে বেশী হয়।	৬—১৮ মাস বয়সে বেশী দেখা দেয়।
(৩)	জল জমে, শরীর ফুলিয়া যায়, মুখ গোলাকার দেখায়।	জল জমে না।
(৪)	মাংসপেশী ও চর্বির ক্ষয় (+ থেকে ++)	মাংসপেশী ও চর্বির ক্ষয় হয় বেশী (++++); দেহে চর্বির লেশমাত্র থাকে না।
(৫)	ত্বকের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এক ধরনের চর্মরোগ (Crazy pavement dermatosis) দেখা দেয় এবং রঞ্জক পদার্থের আধিক্য দেখা দেয়।	ত্বকের বেশী পরিবর্তন হয় না, তবে ত্বক শুষ্ক দেখায়।
(৬)	ফ্যাটি লিভার হয় (+++)।	ফ্যাটি লিভার হয় না (0+)।
(৭)	আহারে দারুণ অনীহা।	খাদ্য গ্রহণে ইচ্ছুক।
(৮)	উচ্চ ক্যালরি ও প্রোটিনযুক্ত খাবার ৪ সপ্তাহ ধরিয়া খাওয়াইলে সন্তোষজনকভাবে ওজন বৃদ্ধি হয়। তাই আরোগ্যলাভে সময় কম লাগে।	ঐরূপ খাবার দিলে অত্যন্ত মন্থর গতিতে ওজন বৃদ্ধি হয়। আরোগ্যলাভে সময় বেশী লাগে।

প্রতিকারের উপায় (Cure) ঃ এই জাতীয় রোগে সহজ গ্রহণযোগ্য এবং সহজপাচ্য খাদ্য দেওয়া উচিত এবং সেই খাদ্যে প্রোটিন ক্যালরি এবং অন্যান্য খাদ্যোপাদান বজায় থাকা চাই। দেহে যদি কোন সংক্রমণ থাকে তবে তাহার চিকিৎসা করাইতে হইবে। রোগাক্রান্ত শিশুর দৈহিক ওজন অনুযায়ী প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য ১৪০-১৫০ কিলোক্যালরির প্রয়োজন। প্রথম দিকে ১ সপ্তাহ ধরিয়া তরল খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। খাদ্যের মধ্যে সাধারণতঃ মাখনতোলা দুধ, চিনি বা গুড়, রান্না করা শস্যদানাজাতীয় এবং পাকা কলা বিশেষ উপযোগী। দ্বিতীয় সপ্তাহ হইতে ফ্যাট জাতীয় খাদ্য দেওয়া হয়। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং শস্যদানার সঙ্গে পাকা কলা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। প্রতি কিলো ওজনে ৩ হইতে ৫ গ্রাম করিয়া প্রোটিন খাওয়াইতে পারিলে দ্রুত আরোগ্যলাভ করা সম্ভব হয়। চিকিৎসার গোড়ার দিকে

দুধের প্রোটিনই উৎকৃষ্ট কারণ তখন পরিপাকশক্তি কম থাকে বলিয়া ডালজাতীয় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন হজম হয় না। অধিকাংশ শিশুই 'এ' ভাইটামিনের অভাবে ও রক্তাল্পতায় ভোগে বলিয়া গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি হইতে ভাইটামিন বড়ি খাওয়ান দরকার।

প্রতিরোধের উপায় (Prevention) ঃ রোগ-প্রতিরোধের একমাত্র উপায় শিশুকে প্রথম হইতে প্রোটিন সমৃদ্ধ খাদ্য দেওয়া। ৫-৬ মাস বয়স হইতেই তাহাকে পর্যাপ্ত বদলি খাদ্যে অভ্যস্ত করাইতে হইবে। মায়ের দুধ এই বয়সে আর যথেষ্ট নয়। সুতরাং শিশুর খাদ্যে গরুর দুধ কিংবা বাজারের টিনের গুঁড়া দুধ দিতে হইবে। দুধ-মাছ-মাংস-ডিম ইত্যাদি প্রাণিজ প্রোটিন কিনিবার ক্ষমতা না থাকিলে বাদামচূর্ণ, ছোলার ছাতু গুঁড়া দুধ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে খিচুড়ি খাওয়ান অভ্যাস করিলে ক্যালরির চাহিদা পূরণ হইবে।

(১) রোগ প্রতিরোধের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা। সংক্রামক রোগের কবলে পড়িলে অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা কমিয়া যায়।

(২) উন্নত ধরনের খাদ্যশস্য ফলান দরকার। সয়াবীন এবং সকল প্রকার শুঁটি-জাতীয় খাদ্যের ফলন বাড়াইতে হইবে।

(৩) হাঁস-মুর্গীর (Poultry) চাষ করিয়া গরু-ছাগল পুষিয়া ডিম-মাংস এবং খাঁটি দুধের জোগান বাড়াইতে হইবে এবং সুলভে জান্তব প্রোটিনের অভাব মিটাইতে হইবে।

(৪) সবচেয়ে বড় কথা হইল জনসাধারণকে শিক্ষিত এবং খাদ্যসম্বন্ধে কুসংস্কার-মুক্ত করিয়া তোলা। খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের যে এক নিবিড় সম্বন্ধ রহিয়াছে, মাছ-মাংস-ডিম-দুধের বদলে যে অপেক্ষাকৃত সস্তার ডাল-ছোলা-বাদাম সয়াবীন ইত্যাদি খাদ্যের সাহায্যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় একথা অনেকেই জানেন না। জনগণকে শিক্ষিত করিয়া তোলাই হইবে রোগ প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ।

'এ' ভাইটামিনের অভাবজনিত রোগ (Vitamin 'A' malnutrition)

নিম্নমানের খাদ্য গ্রহণ করিলে সাধারণতঃ 'এ' ভাইটামিনের অভাব ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণ ভারত, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্মদেশ, মালয় এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্-বিদ্যালয়গামী শিশুদের (১-৬ বৎসর বয়স্ক) এই রোগের শিকার হইতে দেখা যায়। অপুষ্টির স্তর অনুযায়ী **রাতকানা, জেরোথালমিয়া এবং ক্যারাটোম্যালেশিয়া** নামক চোখের ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে।

রাতকানা (Night blindness) ঃ 'এ' ভাইটামিনের মৃদু অভাবে প্রথমে রাতকাণা রোগের সৃষ্টি হয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে এই রোগটি বেশী দেখা যায়। রাতকাণা রোগে প্রথমে রাতে অথবা অন্ধকারে দেখার অসুবিধা ঘটে। জোরালো আলো হইতে অন্ধকারে আসিলে চোখে ধাঁধা লাগে। এই রোগে ভাইটামিন 'এ'র অভাবে অক্ষিপটের দণ্ড নামক গ্রাহক যন্ত্রগুলিতে রডপসিন নামক পদার্থের সংশ্লেষণ কমিয়া যায় এবং স্তিমিত আলোকে দেখিবার শক্তি হ্রাস পায়।

প্রতিকার ঃ কয়েক সপ্তাহ ভাইটামিন 'এ' প্রয়োগ করিয়াও সুফল পাওয়া না গেলে বুঝিতে হইবে রোগের কারণ অপুষ্টি নয়। অন্য কোন শারীরিক বিশৃংখলার জন্য উহার উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

জেরোথালমিয়া (Xeropthalmia) ঃ 'এ' ভাইটামিনের বেশী অভাব ঘটিলে চোখের তারার চারপাশের পাতলা পর্দা শুকাইয়া আসে। ফলে চোখের চকচকে সুন্দর ভাবটা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকেই শুকনো চোখ বা Xeropthalmia বলে।

প্রতিকার ঃ গুরুত্ব অনুসারে ঘনীভূত 'এ' ভাইটামিন প্রয়োগ করিতে হয়, সঙ্গে কডলিভার অয়েল বা মাখন-কিংবা-ঘি-মেটে-গাজর ইত্যাদি ক্যারাটিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ান দরকার।

ক্যারাটোম্যালেশিয়া (Keratomalacia) ঃ এই রোগে চোখের অচ্ছোদপটলের স্বাভাবিক সজীব আবরক কলা নষ্ট হইয়া গিয়া তাহার স্থানে শুষ্ক স্তরযুক্ত কেরাটিন সম্পৃক্ত আবরক কলা সৃষ্টি হয়। নেত্রবর্ত্মকলার (conjuntiva) প্রদাহ ঘটে এবং ক্রমে অচ্ছোদপটলে ঘা হয়। তারপর আক্রান্ত ব্যক্তি চোখের দৃষ্টি হারায়। আমাদের দেশের বহু লোক এই শ্রেণীর অন্ধ।

অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করিবার পূর্বেই সময়মত প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

শারীরিক আবরণী কলার (epithelial tissue) অবক্ষয় ঃ আবরণী কলার বৃদ্ধি এবং সুস্থতা নির্ভর করে 'এ' ভাইটামিন আত্মস্থ করার উপর। 'এ' ভাইটামিনের নিরবচ্ছিন্ন অভাব ঘটিলে আবরণী কলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; টিস্যুটি কুঁকড়াইয়া যায়, কোষগুলির ক্ষয় হইতে থাকে এবং তাহার ফলে রোগজীবাণু সংক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কমিয়া আসে। সেবাসিয়ান গ্রন্থি ও স্বেদ গ্রন্থি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও লোমকূপ কেরাটিন স্তূপদ্বারা বন্ধ হইয়া যায়। ত্বক ব্যাঙের ত্বকের মত গুটিযুক্ত ও কর্কশ হয়। বৃক্ক ও মূত্রনালীর আবরণী কলা নষ্ট হইয়া বৃক্কীয় পাথর সৃষ্টি হয়।

প্রতিকার ঃ ব্যাধিপীড়িত অঞ্চলগুলিতে মাখন তোলা গুঁড়া দুধ খাওয়াইয়া প্রতিকার পাওয়া গিয়াছে। গুঁড়া দুধের প্রোটিন ও ক্যালরি মূল্য অধিক হইলেও উহাতে 'এ' ভাইটামিন থাকে না। তাই যেসব গুঁড়া দুধে 'এ' ভাইটামিন মিশ্রিত থাকে সেগুলিই বেশী কার্যকরী হয়।

দারিদ্র্যের সঙ্গে জনসাধারণের খাদ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা এইসব অপুষ্টিজনিত ব্যাধিগুলির অন্যতম কারণ। ক্যারটিন সমৃদ্ধ সবুজ শাকপাতা, কমলা এবং হলুদ রঙের তরকারি ও ফলের দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে হইবে কারণ অজ্ঞাতবশতঃ অনেকেই এইসব শাকসবজি তরকারি এবং ফলকে অবহেলা করিয়া থাকে। এইসব সাধারণ শাকসবজি কেবল ক্যারটিনেরই উৎস নয় পরন্তু অনেক মূল্যবান খনিজ পদার্থ এবং নানারকম ভাইটামিন উহাদের মধ্যে পাওয়া যায়।

শৈশবে নিম্নমানের খাদ্যগ্রহণের ফলে 'এ' ভাইটামিনের অভাবজনিত ব্যাধিগুলির সৃষ্টি হয়। সংক্রামক রোগের আক্রমণের ফলে উহারা তীব্র আকার ধারণ করে, যাহারা ব্যাধির কবল হইতে মুক্তি পায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হয়, কেহবা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া যায়।

অ্যানিমিয়া (Anaemia)

দরিদ্র এবং অনগ্রসর দেশে এবং উষ্ণমণ্ডলের অন্তর্গত অঞ্চলগুলিতে রক্তাল্পতা বা অ্যানিমিয়া রোগটির প্রকোপ দেখা যায়। যে কোন লোকেরই অ্যানিমিয়া হইতে পারে। তবে শিশু, বর্ধিষ্ণু বালক বালিকা, অন্তঃসত্ত্বা এবং স্তন্যদায়ী নারীরা সহজেই এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পাইলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিকের তুলনায় কমিয়া গেলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে অ্যানিমিয়া বলে। অত্যধিক রক্তক্ষরণে বা অতিরিক্ত মাত্রায় লোহিত কণিকা বিনষ্ট হইলে অ্যানিমিয়া ঘটে। এই রোগে গায়ের রঙ, জিহ্বা, নখ, চোখের কোল ফ্যাকাশে বা রক্তশূন্য হইয়া যায়। কাজকর্মে উৎসাহ থাকে না এবং একটু কাজকর্ম বা চলাফেরা করিলেই হাফ ধরিয়া যায়। তাছাড়া কখনও কখনও হাত পা ফুলিয়া যায়।

রোগের কারণ ঃ নানা কারণে অ্যানিমিয়া হইতে পারে, যেমন ঃ

(১) **লোহিত কণিকার বিনাশবৃদ্ধি ঃ** ম্যালেরিয়া, সিফিলিস জাতীয় রোগে এই জাতীয় অ্যানিমিয়া দেখা যায়। উদাহরণ, সিকল সেল অ্যানিমিয়া, হিমোলাইটিক অ্যানিমিয়া।

(২) **রক্তপাত ঃ** অত্যধিক রক্তক্ষরণ হইলে লোহিত কণিকার ক্ষতিপূরণ সম্ভব হয় না। বাহির হইতে লোহার যোগান দিলে ইহা দূর করা যায়। উদাহরণ, নরমোসাইটিক ও নরমোক্রোমিক অ্যানিমিয়া।

(৩) **লোহিত কণিকার ত্রুটিপূর্ণ উৎপাদন ঃ** দেহে ভাইটামিন বি১২, ফোলিক অ্যাসিড, প্রোটিন তামা; জিঙ্ক, পিত্তলবণ ইত্যাদির অভাব ঘটিলে অস্বাভাবিক বা ত্রুটিপূর্ণ লোহিত কণিকার সৃষ্টি হয় এবং অ্যানিমিয়া দেখা দেয়। পার্নিসাস ও মেগালোব্লাসটিক অ্যানিমিয়া ইহার উদাহরণ।

(৪) **অস্থিমজ্জার ত্রুটি ঃ** মজ্জার নিষ্ক্রিয়তা, x-ray, মজ্জার ক্যানসার, বৃক্ক রোগ, জৈব রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতির বিক্রিয়া হইতে লোহিত কণিকার স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হয়। এই জাতীয় রক্তাল্পতাকে এপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া বলে।

(৫) **লৌহঘটিত অ্যানিমিয়া ঃ** লোহা হিমোগ্লোবিনের 'হিম' নামক অংশে পরফিরিন নামক রঞ্জক পদার্থের সহিত যুক্তভাবে থাকে। এইজন্য লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদন ও হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণের জন্য লোহা অপরিহার্য। খাদ্যে লোহার অভাব হইলে লোহিত কণিকার আয়তন ক্ষুদ্রতর এবং হিমোগ্লোবিন স্বল্পতর হইয়া গিয়া রক্তাল্পতা জন্মায় এবং লোহার বিশোষণ বৃদ্ধি পায়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের অভাবের জন্য যে রক্তাল্পতা দেখা দেয় তাহাকে হাইপোক্রোমিক বা মাইক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া বলে। ফোলাসিন নামে বি বর্গীয় ভাইটামিনের অভাবে মেগালোব্লাসটিক বা ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। ইহাতে শ্বেত রক্তকণিকার হ্রাস এবং অন্ত্রের ক্ষত দেখা দেয়। কোবালামিন বর্গীয় ভাইটামিনের অভাবে মেগালোব্লাসটিক বা ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া হয়। এই রোগে রক্তাল্পতা ছাড়াও বৃদ্ধি হ্রাস এবং স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষত দেখা দেয়।

কোন্ বয়সে রক্তে কতটা হিমোগ্লোবিন থাকা বাঞ্ছনীয় নিম্নে দেখান হইল :

বয়স	হিমোগ্লোবিন (গ্রাম/১০০ মিলিমিটার রক্তে)
শিশু	
০·৬ থেকে ৪ বৎসর	১০·৮
৫ থেকে ৯ বৎসর	১১·৫
১০ থেকে ১৪ বৎসর	১২·৫
প্রাপ্তবয়স্ক	
পুরুষ	১৪
নারী	১২
নারী (অন্তঃসত্ত্বা)	১০

(৬) হুকওয়ার্ম নামক এক প্রকার কৃমিও লোহার অবশোষণে বাধা জন্মায়। আর্দ্র আবহাওয়ায় হুকওয়ার্ম সহজেই বৃদ্ধি পায়। ভারতের বহু অঞ্চলে অ্যানিমিয়ার অন্যতম কারণ হুকওয়ার্মের বিস্তার। উহার সঙ্গে গ্রামবাসীদের খাদ্যে আবার লোহার পরিমাণ কম থাকায় ব্যাধিটি অনেক জায়গায় গুরুতর আকার ধারণ করে।

শিশু এবং গর্ভবতী নারীর অ্যানিমিয়া : শিশু এবং গর্ভবতী রমণীরা সহজেই অ্যানিমিয়ার শিকার হইয়া থাকে। গর্ভবতী নারীর রক্তশূন্যতার কারণ প্রধানতঃ তিনটি—

(১) গর্ভাবস্থায় পুষ্টিকর খাদ্য নির্বাচনে জ্ঞানের অভাব এবং অবহেলা ;
(২) ঘন ঘন গর্ভধারণ এবং
(৩) হুকওয়ার্ম নামক কৃমি।

গর্ভিণী ও প্রসূতিদের খাদ্যে লোহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। কারণ শিশুরা তাহাদের প্রয়োজনীয় লোহা মায়ের নিকট হইতে পাইয়া থাকে। এইজন্য মায়েদের দেহে লোহার অভাব হইলে মা এবং শিশু উভয়েরই অ্যানিমিয়া হইবার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভবতী নারীর খাদ্যে ফোলিক অ্যাসিডেরও চাহিদা খুব বেশী। গর্ভের শেষ তিন মাস উপযুক্ত পরিমাণে এই ভাইটামিন পাইলে সুস্থ সন্তান প্রসব হয়।

যেসব শিশুরা প্রধানতঃ দুধের উপর পুরাপুরি নির্ভর করে তাহাদের অ্যানিমিয়া হইবার সম্ভাবনা থাকে কারণ দুধে পর্যাপ্ত লোহা থাকে না।

শিশু, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, প্রসূতি এবং সকল শ্রেণীর লোকের ক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া হইবার মূল কারণগুলি হইল :

(১) ত্রুটিপূর্ণ খাদ্য যেমন কার্বোহাইড্রেট প্রধান প্রোটিনবিহীন এবং ভাইটামিন বর্জিত খাদ্য গ্রহণ,
(২) রোগ সংক্রমণ এবং বিস্তারের সুবিধা
(৩) লোহা অবশোষণে অসুবিধা এবং
(৪) ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব।

আমাদের দেশে দারিদ্র্য-অ্যানিমিয়া-আরও-দারিদ্র্য যেন দুষ্ট চক্রের মত আবর্তিত হইতেছে।

প্রতিরোধের উপায়ঃ প্রতিদিন কিছু মাছ, মাংস, ডিম, ডাল এবং সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি লোহা এবং ফোলিক অ্যাসিডযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা কর্তব্য। বেশী পরিমাণে সবুজ শাকসবজি গ্রহণ করিয়া মাছ-মাংসের অভাব পূরণ করিতে হইবে। তাছাড়া স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস এবং পারিপার্শ্বিক অনাময় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন দরকার।

প্রয়োজনমত উপযুক্ত চিকিৎসা দরকার। অ্যানিমিয়া নিবারণের জন্য সরকারের পক্ষ হইতে ফোলিফার বড়ি গর্ভিণী, প্রসূতি এবং শিশুদের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক হাসপাতালে এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে ঐ বড়ি পাওয়া যায়।

গলগণ্ড (Goitre).

খাদ্য ও পানীয়ে আয়োডিনের অভাব ঘটিলে গলগণ্ড রোগটি দেখা দেয়। ইহাতে থাইরয়েড গ্রন্থির আয়তন বৃদ্ধি পায় কিন্তু থাইরয়েড হরমোণ কম পরিমাণ ক্ষরিত হয়। গলার দিকে গ্রন্থিটি ফুলিয়া একটি টিউমারের মত হয়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শিশুদের ক্ষেত্রে 'ক্রেটিনিজম' এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে 'মিক্সিডিমা' দেখা দেয়। পার্বত্য অঞ্চলের মাটিতে আয়োডিন কম থাকার ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা গলগণ্ড রোগের শিকার হয়। ১৯৫৭ সালের এক রিপোর্টে প্রকাশ ভারতে ৯০ লক্ষ লোক এই রোগের কবলে পড়িয়াছে। যাহারা হাসপাতাল এবং ক্লিনিকগুলিতে আসিয়াছিল তাহাদের ভিত্তিতেই এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাই মনে হয় প্রকৃত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা আরও বেশী। যে অঞ্চলে এই রোগটির প্রাদুর্ভাব ঘটে সেখানকার দুগ্ধপোষ্য শিশুরাও রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পায় না।

প্রতিকারঃ গেঁড়ি গুগলি, সামুদ্রিক মাছ ও আয়োডিন ঘটিত লবণ আহার্য লবণের সহিত মিশাইয়া খাইতে দিলে এই রোগ কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বাঁধাকপি, ফুলকপি, মূলা প্রভৃতি বেশী খাইলে এগুলি অন্য খাবারের মধ্যে যেটুকু আয়োডিন থাকে তাহা শরীরের কাজে লাগিতে দেয় না। এই প্রকার খাদ্যকে তাই 'গয়েট্রোজেনিক' খাদ্য বলা হয়।

রিকেটস ও অস্টিওম্যালেসিয়াঃ 'ডি' ভাইটামিনের অভাব ঘটিলে বাল্যকালে রিকেটস্ ও বয়ঃপ্রাপ্তির পর অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ দেখা যায়। এই রোগে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের বিপাক ব্যাহত হয়। এতে অস্থি ঠিকমত বৃদ্ধি পায় না, অস্থিতে খনিজ লবণের পরিমাণ কমিয়া যায়। পায়ের অস্থি দেহভারে বক্র হইয়া যায় এবং অনেক সময় ধনুকের আকার ধারণ করে। অস্থি ভঙ্গুর হইয়া পড়ে। কয়েক স্থানের তরুণাস্থি (cartilage) অস্থিতে পরিণত না হইয়া ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তাহার ফলে মণিবন্ধ, হাঁটু এবং বক্ষঃপঞ্জরের প্রান্তগুলি স্ফীত হইয়া যায়। শিশুর করোটির অস্থিগুলির ঠিকমত বৃদ্ধি হয় না এবং দাঁত উঠিতে বিলম্ব ঘটে এবং অন্ত্রে ক্যালসিয়াম ও ফস-ফরাসের বিশোষণ কমিয়া যায়।

শিশুকে কডলিভার হ্যালিব্যাট লিভারের তেল খাওয়াইলে এবং নিয়মিত সূর্যালোকে রাখিলে এই রোগের আশঙ্কা কম থাকে। স্ত্রীলোকের প্রধানতঃ গর্ভাবস্থা ও প্রসূতি অবস্থায় অস্টিওম্যালেসিয়া দেখা যায়।

স্কার্ভিঃ 'সি' ভাইটামিনের অভাবে এই রোগ হয়। এই রোগে দেহকলাগুলির অন্তরকোষ সংযোজক পদার্থের উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাহত হয়। অস্থির দৌর্বল্য, মাড়িতে স্ফীতি ও রক্তপাত, ক্ষতনিরাময়ে বিলম্ব, বিভিন্ন গাঁটে বেদনা ও রক্তপাত দেখা দেয়। অকালে দাঁত পড়িয়া যায়। লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায়। তঞ্চন প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা যায়। কার্বোহাইড্রেটের বিপাকক্রিয়া ব্যাহত হয়।

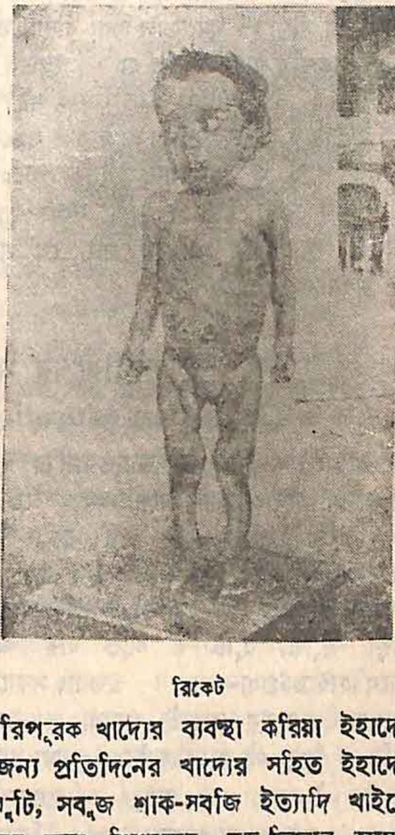
খাদ্যে যথেষ্ট তাজা টক ফল ও সবজি থাকিলে এই রোগ নিবারণ করা যায়। পেয়ারা, টমেটো, কমলালেবু, মুসাম্বি, আনারস, লেবু; বাঁধাকপি, কাঁচালঙ্কা, শাক, বরবটি ইত্যাদিতে প্রচুর পাওয়া যায়।

2. **রোগ-প্রবণদের অতিরিক্ত খাদ্যব্যবস্থা** (Supplementary feeding for Vulnerable groups)ঃ শিশু, গর্ভিণী ও প্রসূতিরাই অধিক রোগ-প্রবণ। ইহারা অতি সহজেই রোগাক্রান্ত হয়। সরকারী পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় দেশের মোট মৃত্যুসংখ্যার শতকরা ৪৩ ভাগ হইতেছে শিশু। আবার শিশুদের মধ্যে ১-৬ বৎসরের শিশুদের মধ্যে অধিক রোগ-শোক দেখা যায়। এই রোগের একটি কারণ হইতেছে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে তখন সে মায়ের রক্ত হইতেই নিজের পুষ্টি আহরণ করে। গর্ভিণী যদি উপযুক্ত খাদ্য না পায় তবে গর্ভস্থ ভ্রূণেরও পরিপুষ্টি হয় না। ফলে ভূমিষ্ঠ শিশুর ওজন স্বাভাবিক ওজন অপেক্ষা কম হয় এবং এই অপুষ্ট শিশুর রোগ প্রতিরোধক শক্তি কম থাকে বলিয়া সে জন্ম হইতে নানারকম রোগে ভুগিতে থাকে। জন্মের পর ৬ মাস পর্যন্ত মাতৃদুগ্ধই শিশুর প্রধান খাদ্য। শিশু যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণ মাতৃদুগ্ধ পায় তাহার জন্য প্রসূতিকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া প্রয়োজন। ৬ মাসের পর শুধু মাতৃদুগ্ধে শিশুর পুষ্টি হয় না। এই সময় তাহাকে বদলি খাদ্য ধরাইতে হয়। আমরা বদলি খাদ্য হিসাবে সাধারণতঃ শিশুকে সাগু, বার্লি বা ভাত, রুটি খাইতে দিই। ইহাতে শিশুর যথাযথ পুষ্টি হয় না। আবার ১ বৎসর বয়স হইলেই শিশু হাঁটা-চলা করা শিখে। এই হাঁটা-চলা এবং দৌড়াদৌড়ির জন্য তাহার অধিক ক্যালরির খাদ্য প্রয়োজন হয়। কিন্তু এই সময় আমরা শিশুর জন্য অতিরিক্ত কোন খাদ্য ব্যবস্থা করি না। ফলে শিশু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ রুগ্ন হইতে থাকে।

সুতরাং শিশুর অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রধানতঃ ৬ মাস বয়সে এবং ১ বৎসর বয়সে দেখা দেয়। গর্ভিণীদের অতিরিক্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় শিশু গর্ভে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এবং শিশু যতদিন মাতৃদুগ্ধ পান করে ততদিন এই প্রয়োজনীয়তা থাকে।

সরকারী পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদের খাদ্যে প্রধানতঃ প্রোটিন-ক্যালরি, ভাইটামিন 'এ' ও লৌহঘটিত খাদ্যের অভাব ঘটে। আমাদের দেশের গর্ভিণী ও প্রসূতিদের প্রতিদিনের খাদ্যে প্রায় ৪০০-৫০০ ক্যালরি তাপমূল্যের খাদ্যের অভাব ঘটে। তাছাড়া মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর

প্রোটিন জাতীয় খাদ্য তাহাদের খুব কমই খাইতে দেওয়া হয়। প্রোটিনের চাহিদা তাহারা প্রধানতঃ ডাল ও খাদ্যশস্য হইতেই পূরণ করে। এই জাতীয় খাদ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন থাকে এবং দেহ গঠনে ইহা তেমন উপযোগী নয়। লৌহঘটিত খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে না পাওয়ায় তাহারা রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। শিশুদের খাদ্যে প্রতিদিন প্রায় ৩০০ ক্যালরির অভাব ঘটে। প্রসূতি এবং গর্ভিণীদের ন্যায় শিশুদের খাদ্যেও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিনের অভাব ঘটে। তাছাড়া ভাইটামিন 'এ' ঘটিত খাদ্যের অভাবের জন্য বহু শিশু অন্ধ হইয়া যায়। লৌহের অভাবে শিশুরাও রক্তাল্পতা রোগে ভোগে। কখনও কখনও ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসঘটিত খাদ্যের অভাবে ইহারা "রিকেট" রোগে আক্রান্ত হয়।



রিকেট

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে গর্ভিণী, প্রসূতি ও শিশুদের ক্যালরি, প্রোটিন, ভাইটামিন (প্রধানতঃ 'এ') এবং লৌহ, ধাতব লবণ (শিশুদের খাদ্যে লৌহ, ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফরাস) ঘটিত খাদ্যের অভাব হইতেছে। সুতরাং অতিরিক্ত বা পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া ইহাদের খাদ্যের এই অভাব দূর করিতে হইবে। এইজন্য প্রতিদিনের খাদ্যের সহিত ইহাদের আরও কিছু কিছু মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, রুটি, সবুজ শাক-সবজি ইত্যাদি খাইতে দেওয়া উচিত। ভাইটামিন 'এ'র অভাবের জন্য শিশুদের কড-লিভার অয়েল বা শার্ক-লিভার অয়েল দেওয়া যাইতে পারে। অথবা সিন্‌থেটিক ভাইটামিন 'এ' বড়ি বছরে কয়েক মাস প্রতিদিন খাইতে দেওয়া যাইতে পারে। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অগ্নিমূল্য। এইজন্য সাধারণ লোকের পক্ষে এই সকল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে খাদ্যশস্য ও ডালের পরিমাণ যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে (৫ : ১) তবে উহাদের মিলিত প্রোটিন দেহগঠনে বিশেষ সহায়তা করে। কিন্তু আমাদের জনসাধারণ খাদ্যশস্য অধিক পরিমাণে খায় এবং সেই তুলনায় ডাল অনেক কম খায় (অনুপাত ১০ : ১)। সুতরাং যাহারা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে পায় না তাহারা ডাল অধিক পরিমাণে খাইবে। খিচুড়ী একটি পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য। শিশুদের মাঝে মাঝে খিচুড়ী খাইতে দিলে তাহাদের প্রোটিন-ক্যালরির চাহিদা পূরণ হইবে। সরকারও শিশুদের পরিপুষ্টির জন্য মাঝে মাঝে খিচুড়ী খাওয়াইয়া থাকে। অল্প পয়সায় পুষ্টিকর খাদ্য কিভাবে প্রস্তুত করা যায় সেই সম্বন্ধে National Institute

of Nutrition, Hyderabad-এ গবেষণা করা হইয়াছে। ঐ Institute হইতে বিভিন্ন প্রকার পুষ্টিকর খাদ্য-প্রস্তুতির প্রণালী সম্বন্ধে পুস্তিকা বাহির করা হইয়াছে। এই সকল খাদ্য ব্যবস্থার মূল উপাদান হইল চাউল, গম, ডাল, বাদাম ও পাউডার মিল্ক বা দুধের গুঁড়া। গম, ডাল এবং বাদাম ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া একসঙ্গে মিশাইলে একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর খাদ্য প্রস্তুত হয়। ইহাতে খরচও কম পড়ে, কিন্তু শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। National Institute পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে যাহারা মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদির অভাবে রোগা ও দুর্বল হইতেছে তাহারা এই গম, বাদাম ও ডালের খাদ্যে আবার পুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান হইতে পারে। এইজন্য সরকার জনসাধারণের জন্য পরিপূরক খাদ্য হিসাবে, এই সকল খাদ্য ব্যবহার করিতে নির্দেশ দিয়া থাকেন। সরকার পরিপূরক খাদ্যের জন্য যে সকল প্রকল্প গ্রহণ করিয়াছেন সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হইবে।

3. জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য-শিক্ষা বিস্তার (Nutrition education for the community)

বাঙালী তথা সমগ্র ভারতবাসীর খাদ্য বিচার করিলে আমরা কি দেখিতে পাই? আমাদের খাদ্যের মোটা অংশই ভাত, আটা, রুটি ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয়। এই সকল অল্পমূল্যের খাদ্যের দ্বারা কোন উপায়ে পেট পূর্ণ করাই আমাদের খাদ্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। অধিকাংশ লোকই সুস্থ ভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কোন্ কোন্ খাদ্য কতটুকু পরিমাণে খাওয়া উচিত তাহা জানে না। অনেক বাড়িতেই সকালে ও বিকালে চিড়া, মুড়ি, রুটি ও গুড় দ্বারা জল খাবার সম্পন্ন করা হয়। এইগুলিও কার্বোহাইড্রেটপ্রধান খাদ্য। সুতরাং সকালে, দুপুরে, বিকালে, রাত্রে, যখনই আমাদের ক্ষুধার উদ্রেক হয় তখনই আমরা প্রধানতঃ কার্বোহাইড্রেট দ্বারাই তাহা নিবৃত্ত করিয়া থাকি। কিন্তু এই কার্বোহাইড্রেট আমাদের দেহে শুধু জ্বালানীর কাজই করিয়া থাকে। অর্থাৎ এই সকল খাদ্য বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পুড়িয়া তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিয়া আমাদের কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু যাহারা অল্প পরিশ্রম করে তাহাদের খাদ্যের অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট মেদ বা চর্বিতে পরিণত হইয়া দেহকে মেদ-বহুল করিয়া তোলে। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যে ওজন বৃদ্ধি পাইয়া obesity রোগেরও লক্ষণ দেখা দেয়।

কিন্তু খাদ্যের যেটি প্রধান উপাদান প্রোটিন, তাহারই অভাব আমাদের খাদ্যে প্রধানতঃ দেখা যায়। আমাদের দেহের নিত্যনৈমিত্তিক ক্ষয় পূরণের ও পুষ্টির জন্য প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অপরিহার্য। কার্বোহাইড্রেট দ্বারা কখনও প্রোটিনের কাজ চলিতে পারে না, যদিও প্রোটিন দ্বারা কার্বোহাইড্রেটের কাজটা চলিতে পারে। ম্যাক্কে নামক একজন বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রোটিন কম খাওয়ার জন্যই বাঙালীর ওজন কম, আকার খর্ব ও খাটিবার শক্তি কম। তাহার মতে প্রোটিনের স্বল্পতার জন্য রক্তে যথেষ্ট নাইট্রোজেন থাকে না। ফলে বাঙালীর কিড্নি শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। এই প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের অভাবেই যক্ষ্মারোগের আক্রমণও বেশী। দেখা গিয়াছে যাহারা প্রোটিন জাতীয় খাদ্য অধিক গ্রহণ করে তাহারা অধিক পরিশ্রমী

স্বাস্থ্যবান ও শক্তিশালী হয়। দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। দুধে প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ছাড়াও ক্যালসিয়াম, ফসফরাস প্রভৃতি ধাতব লবণ ও ভাইটামিন ইত্যাদি খাদ্যের প্রায় সকল উপাদানই আছে। তাছাড়া রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক পাভলভ পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে দুধ হজম করিবার জন্য অধিক পরিপাকশক্তির প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য খাদ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অল্প পাচক রসাদিতেই দুধ হজম হইয়া যায়। এমন কি শিরার মধ্যে ইন্‌জেকশন করিয়া দুধ যদি রক্তের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যায় তবে পেটে পরিপাক না হওয়া সত্ত্বেও ইহা শরীরের মধ্যে গৃহীত হইতে পারে। এই সকল কারণে সভ্য ও শিক্ষিত জগতে দুধের ব্যবহার দিনদিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা মাথাপিছু গড়পড়তা প্রায় তিনপোয়া দুধ খায়। আমেরিকা ও ব্রিটেনের লোকেরা মাথাপিছু প্রায় আধসের ও একপোয়া দুধ প্রত্যহ খাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে হিসাব লইয়া দেখিলে গড়পড়তা মাথাপিছু দুধের পরিমাণ সিকি ছটাকও হইবে কিনা সন্দেহ।

তরি-তরকারি অবশ্য আমরা কিছু কিছু খাইয়া থাকি। তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় সামান্যই। তরি-তরকারি শাকসবজি প্রত্যহ যে পরিমাণে খাইলে আমাদের দৈনিক ধাতব লবণ ও ভাইটামিনের চাহিদা পূরণ হয় সেই পরিমাণ তরি-তরকারি আমাদের খাদ্যে থাকে না। ইহাতে আমাদের রক্তে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তরি-তরকারি যথাযথরূপে রান্না করিবার পদ্ধতিও অনেক গৃহিণীরই জানা নাই। ফলে ঐ সকল খাদ্যের ভাইটামিন অনেক নষ্ট হইয়া যায়। ভাইটামিন 'সি' জাতীয় খাদ্য রান্না করিলে উহাদের ভাইটামিন প্রায় অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য এই জাতীয় খাদ্য কাঁচা ও টাটকা অবস্থায়ই প্রত্যহ কিছু কিছু খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ পরিবারে এই নিয়ম প্রচলিত নাই। ফলে ভাইটামিন 'সি'র অভাব আমাদের খাদ্যে থাকিয়াই যায়।

তাছাড়া স্নেহ বা তৈলজাতীয় খাদ্যও আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী খাই না। তেল জাতীয় খাদ্যে প্রচুর তাপ ও শক্তি উৎপন্ন হয়। তাছাড়া কোন কোন ভাইটামিন এই তৈলজাতীয় খাদ্যের মাধ্যমেই দেহ গ্রহণ করিয়া থাকে। এইজন্য আমাদের খাদ্যে প্রতিদিন কিছু কিছু মাখন বরাদ্দ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে মাখনের ব্যবহার অতি সামান্য। রান্নার জন্য যে তেল ব্যবহার করা হয় স্নেহ পদার্থের চাহিদা পূরণের জন্য অধিকাংশ পরিবার তাহার উপরই নির্ভর করে। ফলে তাহাদের খাদ্যে স্নেহ পদার্থেরও ঘাটতি থাকিয়া যায়। আবার কোন কোন পরিবারে বিশেষতঃ অশিক্ষিত ধনী পরিবারে দালদা ও ঘিয়ের ব্যবহার এত বেশী যে ঐ সকল পরিবারের লোক অকালেই মেদ ও চর্বির প্রাচুর্যে অকর্মণ্য ও রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। সুতরাং দেশের এক শ্রেণীর লোক স্নেহ পদার্থের অভাবে এবং অপর এক শ্রেণীর লোক স্নেহ পদার্থের আধিক্যে রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের খাদ্যের আরও একটি দোষ আমরা দেখিতে পাই। খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও মুখরোচক করিবার জন্য আমরা অধিক পরিমাণে মশলা অর্থাৎ হলুদ, ধনে, লঙ্কা, জিরা, সরিষা ইত্যাদি ব্যবহার করি। খাদ্য মুখরোচক ও সুস্বাদু হইলে তাহা পরিপাকে সহায়তা করে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু অধিক মশলা আবার পরিপাক যন্ত্রকে বিকল করিয়া দেয়।

ফলে খাদ্যের আসল উদ্দেশ্যই নষ্ট হইয়া যায়। তাহা ছাড়া এই সকল মশলার খাদ্য হিসাবে কোন মূল্য নাই। কেবল দৃষ্টি ও স্বাদ তৃপ্ত করাই উহাদের উদ্দেশ্য।

সুতরাং আমাদের খাদ্যে প্রধানতঃ যে সকল দোষ-ত্রুটি আমরা দেখি তাহা হইতেছে ঃ

(১) ভাত, রুটি, মুড়ি, চিড়া, গুড় ইত্যাদি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যের প্রাধান্য।

(২) মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি প্রোটিন বহুল খাদ্যের স্বল্পতা

(৩) তরি-তরকারি, শাক-সবজি ইত্যাদির অপ্রাচুর্য।

(৪) প্রতিদিন কিছু কাঁচা ও টাটকা ফল না খাওয়ার বদ অভ্যাস।

(5) কোন কোন খাদ্যে দালদা, ঘি ইত্যাদি স্নেহ বস্তুর আধিক্য, আবার কোন কোন খাদ্যে ইহার অভাব।

(৬) খাদ্যে অধিক মশলা ব্যবহার।

সুন্দর ও সুস্থ দেহের অধিকারী হইতে হইলে আমাদের খাদ্যের এই সকল দোষ-ত্রুটি দূর করিয়া সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রোটিনের স্বল্পতা বা অভাবই আমাদের খাদ্যের প্রধান ত্রুটি, সুতরাং খাদ্যের ত্রুটি দূর করিতে হইলে প্রথমেই প্রোটিনের কথা চিন্তা করিতে হইবে। প্রোটিনবহুল খাদ্যগুলিকে মোটামুটি দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। ডিম, দুধ, মাছ, মাংস ইত্যাদি অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিনবহুল খাদ্য। এই সকল খাদ্যের প্রোটিনে দেহ গঠনের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিডসমূহ সমস্তই যথোপযুক্ত পরিমাণে থাকে। এইজন্য এই শ্রেণীর খাদ্য প্রতিদিন কিছু খাইতেই হইবে। তাহা না হইলে দেহের পুষ্টি সাধন সুসম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই সকল খাদ্য এত অগ্নিমূল্য যে সাধারণের পক্ষে দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা এই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা পূরণ করা একেবারে অসম্ভব। সুতরাং কোনও সস্তা বা অল্পমূল্যের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে যাহাতে সাধারণ লোক তাহাদের প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এইদিক হইতে বিবেচনা করিলে ডাল একটি উত্তম খাদ্য। এক ছটাক যে কোন প্রকার ডালে প্রোটিনের পরিমাণ ১ ছটাক মাংসের প্রোটিনের সমান, ১ ছটাক ডিমের প্রোটিনের দ্বিগুণ এবং ১ ছটাক দুধের প্রোটিনের প্রায় সাতগুণ। সুতরাং দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ ডালের ব্যবস্থা করিলে অধিকাংশ প্রোটিনের চাহিদাই পূরণ হইবে।

3. পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্য-তালিকা (Daily Food Pattern)

সংসারের ব্যয়ের সীমার মধ্যে পরিবারের প্রতিটি লোকের প্রয়োজন ও রুচি অনুযায়ী উপযুক্ত সুষম খাদ্যতালিকা প্রস্তুত করাকেই 'খাদ্য-পরিকল্পনা' বলে। খাদ্য পরিকল্পনার সময় দৈহিক পুষ্টি, পরিবারের আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যক্তিগত রুচি এই তিনটি দিকই বিবেচনা করিতে হয়। প্রথমেই পুষ্টির কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

পুষ্টির দিক ঃ যে কোন পরিবারের খাদ্য-পরিকল্পনার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে গৃহের প্রত্যেকটি লোকের যেন প্রয়োজনীয় দৈহিক তাপ ও শক্তি রক্ষিত হয়। খাদ্য পরিকল্পনায় এই পুষ্টির দিকটি সর্বাপেক্ষা প্রথম বিবেচনার বিষয়। পরিবারের পুষ্টি বজায় রাখিতে হইলে খাদ্যতালিকা প্রস্তুতির পূর্বে প্রত্যেক পরিবারের কতখানি খাদ্য উপাদান দরকার তাহা জানা উচিত।

আমরা জানি যে একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ, স্বাভাবিক ও কর্মক্ষম ব্যক্তির দৈনিক প্রায় ৩০০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই পরিমাণ খাদ্যকে খাদ্যের (standard diet) একক ধরিয়া পরিবারের বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয় এবং উক্ত পরিমাণ খাদ্যকে এক ব্যক্তি-মূল্য (Man-value) বলে। একজন ভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন ঐ মাপকাঠিতে প্রকাশ করিলে উহাই ঐ নারী বা পুরুষের ব্যক্তি-মূল্য (Man-value, Factor, Index or Co-efficient) বলিয়া ধরা হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ এবং স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রায় ২৫০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন এবং ইহা ৩০০০ ক্যালরি খাদ্যের প্রায় ০·৮৩ অংশ $\left(\frac{২৫০০}{৩০০০}=\frac{২৫}{৩০}=\frac{৫}{৬}=০·৮৩\right)$। সুতরাং একজন নারীর ব্যক্তি-মূল্য বা factor হইতেছে ০·৮৩।

এইরূপে বিভিন্ন বয়সী নারী ও পুরুষের দৈনিক প্রয়োজনীয় খাদ্য ব্যক্তি-মূল্যের সাহায্যে প্রকাশ করিয়া নিম্নে দেওয়া হইল :

	ব্যক্তি-মূল্য (Man-value)
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম পুরুষের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
একজন প্রাপ্ত-বয়স্ক, স্বাভাবিক কর্মক্ষম নারীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালকের প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮৩
১৪ বৎসরের উপরে একজন বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	১·০
১২ হইতে ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৯
১০ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৮
৮ হইতে ১০ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৭
৬ হইতে ৮ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৬
৩ হইতে ৬ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৫
২ হইতে ৩ বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকার প্রয়োজনীয় খাদ্যের পরিমাণ ...	০·৪

একটি পরিবারের দৈনিক মোট খাদ্যের পরিমাণ ঐ পরিবারের মোট ব্যক্তি-মূল্যের (Total man-value) সাহায্যে নির্ণয় করিতে হয়। পরিবারের লোকসংখ্যা এবং

তাহাদের বয়স জানা থাকিলে ইহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। মনে কর; একটি পরিবারের স্বামী, স্ত্রী এবং ৫, ৭ ও ১০ বৎসরের তিনটি বালক-বালিকা আছে। এই পরিবারের খাদ্যের মোট ব্যক্তি-মূল্য নিম্নরূপ ঃ—

স্বামীর প্রয়োজনীয় খাদ্যের	পরিমাণ	১·০	ব্যক্তি-মূল্য (Man-value)
স্ত্রীর ,,	,,	০·৮৩	,, ,,
৫ বৎসরের বালক-বালিকার	,,	০·৫	,, ,,
৭ ,, ,,	,,	০·৬	,, ,,
১১ ,, ,,	,,	০·৮	,, ,,
মোট খাদ্যের পরিমাণ		৩·৭৩	,, ,,

এই ব্যক্তি-মূল্য হইতে প্রয়োজনীয় প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি-মূল্যের খাদ্যে ১০০ গ্রাম প্রোটিন, ১০০ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ৪৫০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। এই হিসাবে ৩·৭৩ ব্যক্তিমূল্যের খাদ্যে,

প্রোটিনের	পরিমাণ	১০০ × ৩·৭৩ = ৩৭৩	গ্রাম
স্নেহপদার্থের	,,	১০০ × ৩·৭৩ = ৩৭৩	,,
কার্বোহাইড্রেটের	,,	৪৫০ × ৩·৭৩ = ১৬৭৮·৫	,,

অর্থাৎ ঐ পরিবারের দৈনিক মোট ৩·৭৩ × ৩০০০ ক্যা. বা ১১১৯০ক্যা. তাপমূল্যের খাদ্যের প্রয়োজন এবং ঐ খাদ্যে ৩৭৩ গ্রাম প্রোটিন, ৩৭৩ গ্রাম স্নেহপদার্থ এবং ১৬৭৮·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকিবে। এই পরিবারের খাদ্য প্রস্তুতির সময় লক্ষ্য করিবে যেন খাদ্য-দ্রব্যে উক্ত পরিমাণ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ বর্তমান থাকে ; এই সকল খাদ্যোপাদান এক প্রকার খাদ্য হইতে গ্রহণ না করিয়া বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য হইতে গ্রহণ করিলে দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ধাতব লবণসমূহ স্বাভাবিক উপায়েই ঐ খাদ্যে বর্তমান থাকিবে এবং কখনও উহাদের অভাব হইবে না। এই জন্যই খাদ্যতালিকা প্রস্তুতিতে প্রধানতঃ খাদ্যের প্রোটিন; কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ-পদার্থের পরিমাণই নির্ণয় করিতে হয়।

তোমরা জান প্রোটিনের আবার শ্রেণী বিভাগ রহিয়াছে। উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের তুলনায় প্রাণিজ প্রোটিনই শ্রেষ্ঠ এবং দেহ গঠনের সমস্ত উপাদান প্রাণিজ প্রোটিনেই বর্তমান রহিয়াছে। এইজন্য প্রত্যেকের খাদ্যতালিকায় কিছুটা প্রাণিজ প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করিবে।

কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য নির্বাচন প্রোটিন নির্বাচনের মত গুরুত্বপূর্ণ নয়, তথাপি এই বিষয়েও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। উল্লিখিত পরিবারের মোট ১৬৭৮·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের অভাব যদি শুধু চিনি; মিছরি প্রভৃতি বিশুদ্ধ শর্করা জাতীয় দ্রব্যাদির সাহায্যে পূরণ করা হয় তাহা হইলে পাকস্থলী উত্তেজিত হইয়া উদরাময় রোগের সৃষ্টি হইবে। তাই ভাত, রুটি, চিনি, মিছরি, আলু ইত্যাদি বিভিন্ন মিশ্র খাদ্যের সাহায্যে কার্বোহাইড্রেটের প্রয়োজনীয়তা মিটাইলে ঐ সকল খাদ্যের অন্যান্য উপাদানসমূহও দেহের কাজে আসিবে।

স্নেহপদার্থ নির্বাচনেও একটু সতর্ক হইলে ঐ স্নেহপদার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভাইটামিন 'এ' এবং 'ডি'র অভাবও কিছু কিছু পূরণ হইতে পারে।

প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহপদার্থ নির্বাচন করিয়া খাদ্যের ভাইটামিনের কথা বিবেচনা করিতে হইবে, কারণ, বিভিন্ন ভাইটামিনের অভাবে বিভিন্ন অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য হইতে খাদ্যের ঐ প্রধান তিনটি উপাদান নির্বাচন করিলে ভাইটামিনের অভাব অনেকটা এমনিতেই পূরণ হইয়া যায়। অবশিষ্ট ভাইটামিনের জন্য সবুজ শাক-সবজি, ফল-মূল ইত্যাদিও দৈনন্দিন খাদ্যের তালিকাভুক্ত করা কর্তব্য।

উপরোক্ত খাদ্যোপাদান ব্যতীত খাদ্য পরিকল্পনায় জলেরও স্থান নির্দিষ্ট থাকা প্রয়োজন। জল আমাদের রক্তের তারল্য বজায় রাখে, দেহের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করে এবং হজমে ও দেহের ক্লেদ নিঃসরণে সহায়তা করে।

আর্থিক দিক ঃ খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির সময় সর্বদা আর্থিক সঙ্গতির কথা স্মরণ রাখিবে। বস্তুতঃ প্রত্যেক পরিবারে আর্থিক সঙ্গতির উপরেই খাদ্যতালিকা নির্ভর করে। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি প্রাণিজ প্রোটিনবহুল খাদ্যগুলি সাধারণ পরিবারের প্রায় আয়ত্তের বাহিরে। এই ক্ষেত্রে গৃহিণী ডাল, বাদাম, সয়াবীন প্রভৃতি অল্প মূল্যের বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে প্রোটিনের অভাব পূরণ করিতে পারেন। অবশ্য এই শেষোক্ত খাদ্যগুলি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন নয় এবং এই জন্যই দেহের পরিপূর্ণ পুষ্টি ও বৃদ্ধি এই জাতীয় প্রোটিনের সাহায্যে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। দেহের যথাযথ পুষ্টির জন্য অবশ্যই কিছু পরিমাণ উৎকৃষ্ট প্রোটিন অর্থাৎ মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি গ্রহণ করা কর্তব্য। তবে প্রয়োজনীয় প্রোটিনের এক-তৃতীয়াংশ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রোটিন হইতে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট প্রোটিনের অভাব অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য হইতে সহজেই পূরণ করা যায়।

প্রোটিনের মতই স্নেহপদার্থও দুই শ্রেণীর—প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিজ্জ স্নেহপদার্থ স্বভাবতঃই প্রাণিজ স্নেহের তুলনায় সস্তা। এই ক্ষেত্রেও সাধারণ পরিবারের লোকেরা শুধুমাত্র প্রাণিজ স্নেহের সাহায্যে স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ না করিয়া উদ্ভিজ্জ স্নেহের সাহায্য লইতে পারেন। মাখন. ঘি, মাছের তেল ইত্যাদির সঙ্গে কিছু তেল, দালদা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ স্নেহ গ্রহণ করিলে সস্তায় স্নেহপদার্থের অভাব পূরণ করা যায়।

রুচির দিক ঃ খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির অন্যতম লক্ষ্য হইবে খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা। একই খাদ্য প্রতিদিন আহার করিলে খাদ্য একঘেয়ে লাগে এবং আহারে অরুচি জন্মায়। অরুচিকর খাদ্য হজমেরও ব্যাঘাত জন্মায়। সুতরাং রন্ধনে বৈচিত্র্য আনা একান্ত প্রয়োজন। উত্তম ও বিভিন্ন প্রকারের পদ দেখিলে আপনা হইতেই আহারের ইচ্ছা তীব্র হয়। খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ, বর্ণ বদলাইয়া আহারে বৈচিত্র্য আনা যায়। আহার্য বস্তু পর পর দুইটি যেন এক জিনিস দিয়া কিংবা একই পদ্ধতিতে রান্না না হয়। যেদিন আলু পটলের ডালনা হইল সেইদিনই আবার মাছের ঝোলে আলু পটল দেওয়া উচিত নয়। তেমনি আবার এক বেলার আহার্যে দুইটি ডালনা জাতীয় তরকারি থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়। প্রতিদিন এক ধরনের ডাল না খাইয়া বদলাইয়া রান্না করা চলে।

অনুরূপভাবে শাক-সবজি, মাছ ও আনাজ প্রত্যহ নতুন নতুন পরিবেশন করা যায়। বস্তুতঃ প্রতিদিন এক ধরনের খাদ্য গ্রহণ করাও উচিত নয়। খাদ্যের উপাদানগুলি সকল বস্তুতে এক পরিমাণে উপস্থিত থাকে না। একটু সতর্কতার সঙ্গে বিভিন্ন খাদ্য গ্রহণ করিলে প্রয়োজনীয় সব রকমের উপাদানই পাওয়া যায়। দেহের এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্যও খাদ্যে বৈচিত্র্য আনা দরকার।

বাদামেও প্রচুর প্রোটিন আছে। সুতরাং প্রোটিনের জন্য ডালের সহিত বাদামও খাওয়া যাইতে পারে। তবে বাদামে স্নেহের পরিমাণ বেশী থাকায় অধিক বাদাম খাইলে হজমের গন্ডগোল হইতে পারে। অবশ্য মাছ, মাংস, ডিম, দুধের পরিবর্তে শুধু ডাল বা বাদামে প্রোটিনের চাহিদা পুরাপুরিভাবে মিটে না। কারণ ডাল ও বাদামের প্রোটিন দ্বিতীয় শ্রেণীর। এইজন্য ডাল ও বাদামের সহিত কিছু কিছু মাছ, মাংস, ডিম বা দুধের ব্যবহার অবশ্যই করিতে হইবে। অর্থাৎ দৈনিক প্রোটিনের চাহিদার অধিকাংশই ডাল, বাদাম ইত্যাদি সস্তা খাদ্য হইতে খাইয়া অবশিষ্ট সামান্য প্রোটিনের চাহিদা মাছ, মাংস ইত্যাদি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্য হইতে পূরণ করিলে শরীরও রক্ষা পাইবে এবং খরচও কম পড়িবে। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে দুধ অগ্রগণ্য। কারণ দুধে এই প্রোটিন ছাড়া অন্যান্য ধাতব লবণ ও ভাইটামিন থাকে। শরীরের পুষ্টির জন্য অবশ্য প্রতিদিন ১ সের করিয়াই দুধ খাওয়া উচিত। কিন্তু আর্থিক দিক বিবেচনা করিয়া অন্ততঃ ১ পোয়া দুধ প্রতিদিনের খাদ্যে ব্যবস্থা করিতেই হইবে। তাছাড়া সামান্য কিছু মাছ অথবা মাংস বা একটি ডিম এই সঙ্গে ব্যবস্থা করিতে পারিলে দৈনিক প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হইতে পারে। সয়াবিনেও প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন অল্প পরিমাণে থাকে। সুতরাং যাহারা মাছ, মাংস ইত্যাদি আমিষ জাতীয় খাদ্য খায় না তাহারা সয়াবিন হইতেও কিছু প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন গ্রহণ করিতে পারে।

প্রোটিনের পরেই ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কথা চিন্তা করা প্রয়োজন। ভাইটামিনের অভাবে সহজেই শরীর নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা থাকে আর ধাতব লবণ যেমন দেহের গঠনের জন্য প্রয়োজন তেমনি রক্ত তথা দেহের সুস্থতার জন্যও এই লবণের প্রয়োজন হয়। প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য অ্যাসিডিক। শাক-সবজি ও ফল-মূলের ধাতবলবণই ঐ সকল খাদ্যের অ্যাসিড প্রশমিত করিয়া দেহকে সুস্থ রাখে। সুতরাং প্রতিদিন প্রায় আধ সের হইতে তিন পোয়া বিভিন্ন প্রকারের তরিতরকারি ফল-মূল খাওয়া উচিত। ইহার মধ্যে কিছু টমেটো, লেবু ইত্যাদি ভাইটামিন 'সি' জাতীয় খাদ্য প্রতিদিনই কাঁচা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। শাক-সবজি রান্না করিবার সময় যথাযথ নিয়মে রান্না করা প্রয়োজন যাহাতে অযথা ভাইটামিন ও ধাতব লবণের অপচয় না ঘটে।

তাছাড়া খাদ্যদ্রব্যে অধিক মশলা ব্যবহার বন্ধ করা উচিত; খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু ও মুখরোচক করিবার জন্য যেটুকু না হইলে নয় ততটুকু মশলা ব্যবহার করা উচিত। ইহাতে পাকস্থলী, লিভার (যকৃত) ইত্যাদি দেহযন্ত্রগুলি সুস্থ ও সবল থাকিবে। অধিক মশলাযুক্ত খাদ্য খাইলে এই সকল দেহ-যন্ত্রগুলি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া শেষে অকর্মণ্য হইয়া পড়িবে।

সুতরাং আমাদের প্রচলিত খাদ্যের ত্রুটি দূর করিতে হইলে ঃ

(১) খাদ্যে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কিছু কমাইয়া উহার পরিবর্তে প্রচুর ডাল, কিছু বাদাম, এক পোয়া দুধ, কিছু মাছ অথবা মাংস বা ১টি ডিমের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ কমাইয়া প্রোটিনের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

(২) তরি-তরকারি, শাক-সবজি, ফল ইত্যাদির পরিমাণ বাড়াইতে হইবে।

(৩) প্রত্যহ কিছু টাটকা ও কাঁচা ভাইটামিন 'সি' জাতীয় ফল খাইতে হইবে।

(৪) রান্নায় অধিক মশলা ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে।

সুতরাং খাদ্য কি, খাদ্যের কোন্ কোন্ উপাদান আমাদের অধিক প্রয়োজন, কিভাবে অল্পব্যয়ে তাহা সংগ্রহ করা যায়, কিভাবে রান্না করিলে খাদ্য-মূল্য বজায় থাকে, আমাদের খাদ্যের ত্রুটি কি এবং কি ভাবে তাহা দূর করা যায়—এই সকল কথা প্রত্যেকটি নাগরিককে বিশেষতঃ গৃহিণীদের বুঝাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় বংশগত প্রথা এবং খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত-ধারণা বা বিকৃত রুচির জন্য অনেকে পুষ্টিকর খাদ্য হইতে বঞ্চিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে তাহাদের এই ধারণার পরিবর্তন হইবে এবং তাহারা পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে শিখিবে। আমাদের জনসাধারণ অধিকাংশই অতি দরিদ্র। মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি অগ্নিমূল্যের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। সুতরাং অল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাদ্য কিভাবে সংগ্রহ করিতে হয় সে শিক্ষা তাহাদের দিতে হইবে। এইজন্য সরকারী প্রচার যন্ত্রকে সক্রিয় হইতে হইবে। শুধু মুখে মুখে প্রচার করিলেই কাজ শেষ হইবে না। সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে রাঁধিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে কিভাবে রান্না করিলে খাদ্যমূল্য বজায় থাকে। এইজন্য সরকার কতকগুলি পরিকল্পনা হাতে নিয়াছেন। এই সকল পরিকল্পনায় দুর্বল ও অসুস্থদের-পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াইয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হাতে-কলমে দেখাইয়া দেওয়া হয়। এই সম্বন্ধে-অন্যত্র আলোচনা করা হইয়াছে। সিনেমা ও বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমেও এই শিক্ষা প্রচার করা যায়। স্কুলে-কলেজে প্রত্যেকটি মেয়ের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া শিক্ষা দপ্তরের ঘোষণা করা উচিত। কারণ এই সকল মেয়েরাই পরবর্তী জীবনে গৃহিণী হইবে এবং গোটা পরিবারের লালন-পালন, খাওয়াদাওয়ার ভার তাহাদের উপরই ন্যস্ত হইবে। সুতরাং মেয়েদের যদি এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া না হয় তবে গোটা পরিবারকেই তাহার কুফল ভোগ করিতে হইবে।

4. পরিবারের খাদ্য ও রুচি নির্ধারণের পদ্ধতি

(Methods for survey of food consumption and food habits in families)

পরিবারের খাদ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ঃ জনস্বাস্থ্য পুষ্টিকর খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। খাদ্যের অভাবে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং নানা প্রকার রোগ দেখা দেয়। এইজন্য সকল দেশেই সরকার জনস্বাস্থ্য উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে দেশবাসীর খাদ্যের বিচার করিতে হয়। তাহাদের প্রতিদিনের খাদ্য বিচার করিয়া দেখিতে হয় যে তাহারা খাদ্যে প্রত্যেকটি উপাদান

উপযুক্ত পরিমাণে পাইতেছে কিনা। যদি তাহা না পায় তবে কি কারণে তাহা পাইতেছে না তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এবং সেই অসুবিধা দূর করিবার জন্য সরকারকে তৎপর হইতে হইবে। কোন কোন এলাকায় হয়তো জলের খুব অভাব, খাল, বিল, পুকুর ইত্যাদিতে জল না থাকায় সেখানে মাছের চাষ তেমন হয় না। সেইজন্য সেই এলাকার জনসাধারণ মাছ খাইতে পায় না। সুতরাং সরকারকে হয় অন্য এলাকা হইতে সেখানে মাছের আমদানী করিতে হইবে, নতুবা পোল্ট্রি করিয়া মাছের বিকল্প খাদ্য ডিম, দুধ, মাংস, ইত্যাদির উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। সুতরাং জনসাধারণের খাদ্য ও রুচি নির্ধারণের উপর ভিত্তি করিয়া সরকারী কৃষি ও খাদ্যনীতি প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কাজও ইহার উপর নির্ভর করে।

দেশের জনগণের খাদ্য ও রুচি নির্ধারণের জন্য প্রথমে সমগ্র দেশটিকে কয়েকটি এলাকাতে ভাগ করা হয় এবং প্রত্যেকটি এলাকার বিভিন্ন পরিবারের মধ্য হইতে কয়েকটি পরিবার নির্বাচিত করিয়া তাহাদের খাদ্য বিচার করিতে হয়। ইহার ফলে পরিবারের লোকেরা কি ধরনের খাদ্য খায় এবং তাহাতে তাহাদের পুষ্টি হইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে পরিবারের লোকদের খাদ্য সম্বন্ধে রুচির পরিচয়ও পাওয়া যায়। তাছাড়া খাদ্যের জন্য পরিবারকে কত অর্থ ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ খাদ্যের আর্থিক দিকটিও জানিতে পারা যায়। এইরূপে কোন এলাকার পরিবারের খাদ্য নির্ধারিত করিয়া ঐ এলাকার জনসাধারণের পুষ্টি সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যায়। তারপর গোটা দেশের জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগৃহীত হয়।

পদ্ধতি : একটি পরিবারের খাদ্য নির্ধারণের অর্থ হইতেছে ঐ পরিবারটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (সাধারণতঃ প্রতি সপ্তাহে) কতটুকু খাদ্য খায় তাহা নির্ণয় করা। এই কাজের জন্য প্রথমে কোন এলাকার কতগুলি পরিবার নির্বাচন করিতে হয়। বিক্ষিপ্ত ভাবে ঐ এলাকার ধনী, দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতেই করিতে হয়। যে সকল পরিবার এই কাজে নির্বাচিত হয়—তাহাদের সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ ভালভাবে সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং পরিবারের লোকেরা যদি সহযোগিতা করিতে না চায় তবে সেই পরিবারকে বাদ দেওয়াই ভাল। গ্রামের যিনি মোড়ল প্রথমে তাহার সহযোগিতা যাহাতে পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিতে হয়। এই পরীক্ষা বছরের যে কোন সময়েই করিলে চলে না, কারণ কোন সময়ে খাদ্য-দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং সস্তা থাকে। তখন লোকে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে পারে; কিন্তু খরা বা বর্ষার সময় যখন খাদ্য-দ্রব্য কম হয় তখন লোকেরা ভাল খাদ্য তেমন সংগ্রহ করিতে পারে না। এইজন্য কোন একটি এলাকার শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা ইত্যাদি ঋতুতে বছরে প্রায় ৩।৪ বার এই কাজটি করিয়া একটি গড় হিসাব লইতে হয়। পরিবারের খাদ্য নির্ধারণের কাজটি নিম্নলিখিত যে কোন একটি পদ্ধতিতে করা যায় :

(১) **Food Account :** এই পদ্ধতিতে কোনও পরিবারের জন্য যে খাদ্য যে পরিমাণে ক্রয় করা হয় তাহার একটি হিসাব কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া রাখা হয়। অর্থাৎ প্রতিদিন পরিবারের জন্য যে সকল খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করা হয় সে সকল দ্রব্যের এবং উহার

জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তাহার একটি হিসাব রাখা হয়। কয়েক সপ্তাহ পরে (যেমন দুই সপ্তাহ পরে) মোট দ্রব্যের পরিমাণ ও মোট অর্থ যোগ করিলে পরিবারের দুই সপ্তাহের একটি হিসাব পাওয়া যায়। এই পদ্ধতির একটি অসুবিধা হইল এই যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্থাৎ ঐ দুই সপ্তাহের মধ্যে যে সকল দ্রব্য ক্রয় করা হইল তাহা সমস্তই খাওয়া হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়। প্রকৃত পক্ষে ঐ সময়ের মধ্যে সমস্ত খাদ্য-দ্রব্য খাওয়া না-ও হইতে পারে এবং কিছু কিছু খাদ্য-দ্রব্য অবশিষ্ট থাকিতে পারে। তাছাড়া যেদিন হইতে এই পরীক্ষা আরম্ভ হইল সেই দিন এবং পরের কয়েকদিন ধরিয়া হয়তো পূর্বের মজুত করা চাল, ডাল ইত্যাদিই খাওয়া হইতেছে। তাহার হিসাব এই পদ্ধতিতে ধরা পড়ে না (ফলে এই পদ্ধতিতে অনেক ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকে। অবশ্য দুঃস্থ পরিবারের জন্য যাহারা দিন আনে দিন খায় তাহাদের জন্য এই পদ্ধতি ভালই।

(২) Food List ঃ এই পদ্ধতিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ খাদ্য খাওয়া হইতেছে তাহার একটি হিসাব রাখিতে হয় এবং সপ্তাহ শেষে উহা যোগ করিয়া গত এক সপ্তাহের খাদ্যের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিটি উপরের পদ্ধতি অপেক্ষা ভাল। কারণ এখানে ক্রয় করা খাদ্যের হিসাব না করিয়া প্রকৃতপক্ষে যে পরিমাণ খাদ্য প্রতিদিন খাওয়া হইতেছে তাহারই হিসাব রাখা হয়। ফলে যে পরিমাণ খাদ্য প্রকৃত পক্ষে খাওয়া হইতেছে তাহারই হিসাব পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে হিসাব করা একটু কষ্টকর। কারণ গৃহিণীকে রাঁধিবার পূর্বে ওজন করিয়া বা মাপিয়া রান্না করিতে হয়। উপরের পদ্ধতিতে বাজারের ওজন হইতেই হিসাব করা হয়, গৃহিণীকে আর ঐজন্য ওজন করিতে হয় না।

(৩) Food Record ঃ এই পদ্ধতিতে পরীক্ষার প্রথমে গৃহের মজুত খাদ্য-দ্রব্যের ওজন লওয়া হয় এবং প্রতিদিন বাজার হইতে যে সকল খাদ্য-দ্রব্য আনা হয় তাহারও ওজন রাখা হয়। পরীক্ষার শেষে অর্থাৎ এক সপ্তাহ পরে যে সকল খাদ্য উদ্বৃত্ত থাকে তাহার ওজন লইয়া খাদ্যের মোট ওজন হইতে উহা বাদ দিয়া যে পরিমাণ খাদ্য এক সপ্তাহে খাওয়া হইল তাহা নির্ণয় করা হয়। তাছাড়া রান্নার সময় যদি কোন অপচয় হয় বা পরিবেশনের সময় বা খাইবার সময় যদি খাদ্যের কোন অপচয় হয় তবে সেই অপচয়ও উপেক্ষা করা হয় না। সুতরাং এই পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা কষ্টকর হইলেও ইহাই সর্বাপেক্ষা নির্ভুল পদ্ধতি।

পরিবারের খাদ্য নির্ধারণের সময় কতকগুলি সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। যেমন বাড়ীতে যদি ২।১ দিনের জন্য অতিথি আসে তবে তাহার খাদ্য-ব্যবস্থা ভিন্নভাবে করিতে হয় কারণ অতিথিকে পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় না। অথবা রাঁধিবার পূর্বে বা পরে যদি খাদ্য-দ্রব্য কাহাকেও দান করা হয় বা ধার দেওয়া হয় তবে তাহারও একটি হিসাব রাখিতে হয়। তাহা না হইলে প্রকৃত তথ্য-পাওয়া যায় না।

এই পারিবারিক খাদ্য নির্ধারণের পদ্ধতিতে কিন্তু পরিবারের কোনও একটি ব্যক্তি উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য পাইতেছে কিনা তাহা বুঝিতে পারা যায় না। কোনও একটি পরিবারে হয়তো প্রতিদিন যথেষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য আসিতেছে কিন্তু পরিবারের কোনও ব্যক্তি ভ্রান্ত বা বিকৃত রুচির জন্য ঐ সকল খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে। অনেক সময়

খাদ্য পরিবারের সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টিতও হয় না। সুতরাং ব্যক্তিগত পুষ্টি নির্ধারণের জন্য ঐ ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে প্রতিদিন কি খাইতেছে তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

5. জনগণের পুষ্টির জন্য সরকারী প্রচেষ্টা

(Current National Nutritional Programmes in India)

সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য খাদ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া তাহাদের এই বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কতকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রকল্পেরই মূল উদ্দেশ্য খাদ্য সম্বন্ধে জনসাধারণকে সজাগ করিয়া তোলা অর্থাৎ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের কি খাওয়া উচিত, আমাদের খাদ্যের দোষ বা ত্রুটি সংশোধন করিয়া কিভাবে সুন্দর, সবল ও সুস্থ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় সেই সম্বন্ধে জনসাধারণকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু শুধু মুখের শুকনো বুলিতে কোন কাজ হয় না, সেই কথা কেউ শোনে না। সরকার সেই কথা ভাল ভাবেই জানেন। সেইজন্য মৌখিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহা হাতে-কলমে দেখাইবার জন্য প্রত্যেকটি প্রকল্পের সঙ্গে একটি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থাও রহিয়াছে। এই ব্যবস্থায় সরকার কিছু কিছু লোকের সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করিয়া জনসাধারণকে তাহাদের শিক্ষার যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ফলে জনসাধারণ সরকারী শিক্ষার মূল্য স্বীকার করিয়া নিজেদের খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। সরকারের পক্ষে এই বিপুল জনসাধারণের সুষম খাদ্যের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই পরীক্ষামূলক খাদ্য ব্যবস্থার জন্য সরকার দেশের গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুদের নির্বাচন করিয়াছেন। কারণ দেশে শিশু-মৃত্যুর হারই সর্বাধিক। এই ব্যবস্থায় বছরে ২৫০—৩০০ দিন পরিপূরক (Supplementary) খাদ্যের বন্দোবস্ত করা হয়। আমরা বাড়ীতে যাহা খাই তাহা সুষম খাদ্য নয়। ঐ খাদ্যের সঙ্গে যে পরিমাণ বাড়তি খাদ্য খাইলে সুষম খাদ্য হয় সেই পরিমাণ বাড়তি খাদ্যকেই পরিপূরক খাদ্য বলে। অর্থাৎ সরকার যে সকল লোক নির্বাচন করিবেন তাহাদের প্রত্যেককেই বাড়ীর খাদ্যের সহিত এই সরকারী খাদ্য খাইতে হইবে, শুধু সরকারী খাদ্য খাইলে চলিবে না। সরকার এই সমস্ত প্রকল্প শহরের বস্তি এলাকাতে এবং পাহাড়ী অনুন্নত এলাকাতে প্রথমে চালু করেন। এই ব্যাপারে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা যুক্ত আছে তাহাদের মধ্যে সমাজকল্যাণ বিভাগ (Department of Social Welfare), শিশুকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ (Department of Child Welfare and family Planning), উপজাতি কল্যাণ বিভাগ (Department of Tribal Welfare), কমিউনিটি উন্নয়ন বিভাগ (Department of Community Development), লায়নস ক্লাব (Lions Club), হরিজন সেবক সংঘ (Harijan Sevak Sangha), ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব চাইল্ড ওয়েলফেয়ার (Indian Council of Child Welfare), কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বোর্ড (Central Social Welfare Board) ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। এই খাদ্য-ব্যবস্থা করিতে গিয়া সরকার যেমন উহার পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছেন

তেমনি উহার খরচের দিকটাও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন। খাদ্যের জন্য অত্যধিক মূল্য দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং যত কম খরচে এবং স্থানীয় খাদ্য-দ্রব্য হইতে খাদ্য নির্বাচন করা যায় সরকার সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। দেখা গিয়াছে প্রতিদিনের পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে সরকারকে মাথাপিছু ২৫ পয়সার অধিক ব্যয় করিতে হয় নাই। জনসাধারণ যাহাতে সহজেই পরিপূরক খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারে সেইজন্য স্থানীয় খাদ্যের উপর সরকার জোর দিয়াছেন। এইজন্য সরকারকে বাংলা দেশে একরকম এবং গুজরাটে আরেক রকম খাদ্য ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। জনসাধারণের রুচির দিকও অবহেলা করা হয় নাই। বাঙালী ও গুজরাটির রুচি একপ্রকার নয়। সুতরাং বাঙালী খাদ্যে গুজরাটির রুচি না হওয়াই স্বাভাবিক। সেইজন্য বাংলা দেশে উৎপন্ন খাদ্য হইতে বাঙালীর খাদ্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকার এই সকল প্রকল্পে যে খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার মধ্যে দুধ, রুটি, বিস্কুট, বালাহার (বাদাম, গম ও সয়াবীন হইতে প্রস্তুত খাদ্য), পরিজ (Porridge), হালুয়া, কাঞ্জি, (Kanji), উপ্পুমা (Uppuma), বাজরার খিচুড়ী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গর্ভবতী, প্রসূতি ও শিশুর ক্যালরিমূল্য একরকম নয়। সরকার যে পরিপূরক খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার ক্যালরিমূল্য নিম্নরূপ :

১ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্যে—	২০০ ক্যালরি, ৮—১০ গ্রাম প্রোটিন
১—৬ " "	৩০০ ক্যালরি, ১২ গ্রাম প্রোটিন;
গর্ভবতী ও প্রসূতির খাদ্যে	৫০০ ক্যালরি, ২০ গ্রাম প্রোটিন

এই খাদ্য সরকার বিভিন্ন স্কুলে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, বালওয়াদিতে বন্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই পর্যন্ত সরকার যে যে প্রকল্প চালু করিয়াছেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) **Mid-day Meal Programme** : ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সরকারের শিক্ষাবিভাগ এই প্রকল্পটি দেশে চালু করেন। এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ দুইটি— (১) বিদ্যালয়ের শিশুদের পুষ্টির অভাব দূর করা এবং (২) বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক শিশু আকর্ষণ করা ও তাহাদের নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা। সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট কৃতকার্য হইয়াছেন। যে সকল স্কুলে এই ব্যবস্থা চালু হইয়াছে সেখানে ছাত্রদের স্বাস্থ্যের উন্নতিতো হইয়াছেই; উপরন্তু খাওয়ার লোভে ঐ সকল স্কুলের ছাত্র-সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু স্কুলের ছাত্রই নয়, কিছু কিছু প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশুরাও এই প্রকল্পের মধ্যে আসিয়াছে। [১—৫ বৎসরের ছেলে-মেয়েদের প্রাক্‌বিদ্যালয়ের শিশু বলিয়া গণ্য করা হয়।] প্রায় ১১৯ লক্ষ শিশু এই ব্যবস্থার আওতায় আসিয়াছে এবং ইহার মধ্যে ১০ লক্ষেরও অধিক এই প্রাক্‌বিদ্যালয়ের শিশু।

(২) **Supplementary feeding for pre-school children** : এই প্রকল্পটি সরকারের Social Welfare Department ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে দেশে চালু করেন। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দেশের প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশুদের খাদ্যের মান উন্নত করা। প্রায় ১৯ হাজার শিশু এই প্রকল্পে উপকৃত হয়।

(৩) **Special Nutrition Programme** : ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে Central Social Welfare Department এই প্রকল্পটি চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল গর্ভবতী,

প্রসূতি এবং প্রধানতঃ প্রাক্-বিদ্যালয়ের শিশুদের পুষ্টির ব্যবস্থা করা। ভাইটামিনের অভাব পূরণের জন্য প্রত্যেকটি শিশুকে একটি করিয়া ভাইটামিন 'এ-ডি' বড়ি এবং প্রসূতি ও গর্ভিণীদের একদিন অন্তর একদিন করিয়া 'মাল্টি-ভিটামিন' বড়ি দেওয়া হইত। এই প্রকল্পে প্রায় ২০ লক্ষ শিশু উপকৃত হয়।

(৪) **Applied Nutrition Programme**ঃ এই প্রকল্পটি ১৯৭০ খৃঃ সরকারের Community Development Department কর্তৃক চালু হয়। মাছ, মাংস, ডিম, তরি-তরকারি ইত্যাদি রক্ষাকারী খাদ্যের প্রচলন বৃদ্ধি করিয়া জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। এইজন্য এই সকল খাদ্য-দ্রব্যের উৎপাদন কি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয় এবং কিভাবে ঐ সকল খাদ্য সংরক্ষিত করিতে হয় তাহা সরকার হাতে-কলমে দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। এমনকি এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অনেককে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। পরীক্ষামূলক ভাবে বহু শিশু ও নারীকে বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে বছরে প্রায় ২০০ দিন এই জাতীয় খাদ্য বিনা পয়সায় বিতরণ করেন।

(৫) **Composite Nutrition Programme**ঃ ইহা Community Development Department কর্তৃক পরিচালিত আরেকটি প্রকল্প। যে সকল এলাকায় Applied Nutrition Programme চালু করা সম্ভব হয় নাই, সেই সেই এলাকায় এই প্রকল্পটি চালু করা হয়। ইহারও মূল উদ্দেশ্য জনসাধারণের পুষ্টির মান উন্নত করা এবং অন্যান্য প্রকল্পের ন্যায় এই প্রকল্পেও পরীক্ষামূলক খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা আছে।

খাদ্য-মূল্য তালিকার ব্যবহার ও খাদ্যদ্রব্যের খাদ্য-মূল্য নির্ণয় (Use of food value tables and calculation of nutrition values of diets.) খাদ্যের একটি প্রধান কাজ আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় তাপ ও শক্তি সরবরাহ করা। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ এবং প্রোটিনই আমাদের শরীরে তাপ ও শক্তি সৃষ্টি করিয়া থাকে। খাদ্যের তাপ ও শক্তি পরিমাপ করিবার জন্য যে একক ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাকে ক্যালরি (Calorie) বলে। এক কিলোগ্রাম (বা ১০০০ গ্রাম) জলের এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে এক ক্যালরি বলে। পদার্থবিদ্যায়ও তাপের একক হিসাবে ক্যালরি ব্যবহার করা হয়। এই ক্যালরি খাদ্যের পরিমাপে ব্যবহৃত ক্যালরি হইতে স্বতন্ত্র। এক গ্রাম জলের এক ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতা বৃদ্ধি করিতে যতটুকু তাপের প্রয়োজন হয় তাহাই পদার্থবিদ্যায় এক ক্যালরি হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং খাদ্যে ব্যবহৃত ক্যালরি পদার্থবিদ্যার ক্যালরি হইতে ১০০০ গুণ বড়।

আমাদের দেহে ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ৪ ক্যালরি, ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ হইতে ৯ ক্যালরি এবং ১ গ্রাম প্রোটিন হইতে ৪ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়।

খাদ্যের তাপমূল্য নির্ণয়ঃ খাদ্যের তাপমূল্য নির্ণয় করিতে হইলে খাদ্যের কোন্ কোন্ উপাদানের তাপমূল্য বা ক্যালরি-মূল্য আছে এবং কোন্ কোন্ উপাদানের ক্যালরি-মূল্য নাই তাহা আগে জানা প্রয়োজন। খাদ্যের উপাদানগুলিকে আমরা পূর্বে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছি। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রোটিন,

কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ উপাদানই আমাদের তাপশক্তি বা ক্যালরি জোগাইতে পারে। খাদ্যের অপর দুইটি উপাদানের অর্থাৎ ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালরি-মূল্য নাই। অতএব ভাইটামিন ও ধাতব লবণ আমাদের দেহে তাপশক্তি বা ক্যালরি উৎপাদন করিতে পারে না। সুতরাং শুধু ভাইটামিন বা ধাতব লবণসম্পন্ন খাদ্যের ক্যালরি-মূল্য কিছুই নাই।

আমরা যে খাদ্যদ্রব্য খাই তাহার অধিকাংশই মিশ্র-জাতীয় অর্থাৎ ঐ সকল খাদ্যে ঐ পাঁচটি উপাদানের একের বেশী উপাদান থাকে। দুধের কথাই ধরা যাউক। দুধে প্রোটিন; কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ, ভাইটামিন, ধাতব লবণ ইত্যাদি পাঁচটি উপাদানই আছে। কলা একটি ফল। কিন্তু ইহাতেও ঐ পাঁচটি উপাদানই আছে। কলা প্রভৃতি ফলে ভাইটামিন ও ধাতব লবণই বেশী থাকে। কিন্তু প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ উপাদানও অনেক ফলেই কমবেশী পাওয়া যায়। ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালরিমূল্য নাই, সুতরাং কলা বা অন্যান্য ফলের ক্যালরিমূল্য খুবই সামান্য এবং ঐ সামান্য ক্যালরিমূল্য উহার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানের জন্যই। এইরূপে রুটি, চা, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস, তরিতরকারি ইত্যাদি সমস্তই মিশ্র জাতীয় খাদ্য। তবে এমন খাদ্যও আছে যাহাতে কেবলমাত্র একটি উপাদানই পাওয়া যায়। এই জাতীয় খাদ্যকে আমরা বিশুদ্ধ খাদ্য বলিতে পারি। চিনি, গ্লুকোজ ইত্যাদি বিশুদ্ধ খাদ্য। কারণ ইহাতে কার্বোহাইড্রেট ছাড়া খাদ্যের অন্য কোন উপাদান নাই। তেমনি সর্ষের তেলও একটি বিশুদ্ধ খাদ্য, কারণ উহাতে স্নেহ উপাদান ছাড়া কিছুই থাকে না। কিন্তু কড্‌লিভার অয়েল বা শার্কলিভার অয়েল ইত্যাদি প্রাণিজ তেলে ভাইটামিন 'এ' ও 'ডি' থাকে। সুতরাং এই সকল প্রাণিজ তেল মিশ্র খাদ্যের অন্তর্গত।

তবে একটি কথা মনে রাখিবে যে একেবারে বিশুদ্ধ খাদ্যের সংখ্যা খুবই নগণ্য, অধিকাংশ খাদ্যই মিশ্র খাদ্যের অন্তর্গত।

মনে কর, একটি খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমেই লক্ষ্য করিবে খাদ্যটি মিশ্র না বিশুদ্ধ জাতীয়। যদি বিশুদ্ধ খাদ্য হয় তবে খাদ্যের কোন্ উপাদানটি উহাতে আছে? ভাইটামিন অথবা ধাতব লবণ থাকিলে ঐ খাদ্যের ক্যালরিমূল্য শূন্য হইবে, কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ভাইটামিন ও ধাতব লবণ এই দুইটি উপাদানের কোন ক্যালরি-মূল্য নাই। অপর তিনটি উপাদানের যে কোন একটি থাকিলেই আর ক্যালরিমূল্য শূন্য হইবে না। তখন ঐ খাদ্যের প্রকৃত ওজন অনুযায়ী উহার ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। উদাহরণস্বরূপ চিনির কথাই ধরা যাউক। মনে কর, ১০ গ্রাম চিনির ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। চিনি একটি বিশুদ্ধ খাদ্য। উহাতে, কার্বোহাইড্রেট ছাড়া আর কোন উপাদানই নাই। পূর্বেই বলিয়াছি ১ গ্রাম যে-কোন কার্বোহাইড্রেটের তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য ৪ ক্যালরি। সুতরাং ১০ গ্রাম চিনির তাপমূল্য বা ক্যালরি মূল্য ৪×১০ ক্যালরি বা ৪০ ক্যালরি। অর্থাৎ আমরা যদি ১০ গ্রাম চিনি খাই তবে উহা আমাদের দেহে ৪০ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন করিবে।

আরও একটি উদাহরণ ধরা যাউক। মনে কর, একটি মাছ ১০ গ্রাম সরিষার তেলে ভাজিয়া রান্না করা হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ ১০ গ্রাম তেলের তাপমূল্য

কত? অর্থাৎ ঐ মাছ ভাজা খাইলে ঐ ১০ গ্রাম তেল হইতে আমাদের দেহে কত ক্যালরি মূল্যের তাপ উৎপন্ন হইবে? মনে কর, ঐ তেল সমস্তটাই ভাজার কাজে লাগিয়াছে এবং তেলের কোনরকম অপচয় হয় নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ১ গ্রাম স্নেহ বা তেলজাতীয় খাদ্য হইতে ৯ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ১০ গ্রাম তেল হইতে ১০×৯=৯০ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হইবে। অর্থাৎ ঐ মাছ ভাজা খাইলে মাছের মধ্যের ঐ ১০ গ্রাম তেল হইতেই দেহে ৯০ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হইবে।

কিন্তু অধিকাংশ খাদ্যই মিশ্রজাতীয়। এই সকল খাদ্যের ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইলে প্রথমে উহাতে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা জানা প্রয়োজন। অবশ্য ভাইটামিন ও ধাতব লবণের পরিমাণ জানিবার কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ উহার ক্যালরিমূল্য শূন্য। কেবলমাত্র প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ এই তিনটি উপাদান আছে কিনা এবং থাকিলে কোন্‌টি কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা জানিতে হইবে। এইজন্য খাদ্যের উপাদান মুখস্থ রাখিবার কোনও প্রয়োজন নাই। খাদ্যমূল্য তালিকায় (Food value chart) ঐ সকল মিশ্র খাদ্যের কোন্‌টিতে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে (বইএর শেষে Food Value Chart)। কোন একটি খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ জানিতে হইলে ঐ খাদ্যমূল্য তালিকা দেখিয়াই নির্ণয় করা যায়।

মনে কর, এক আউন্স পাঁউরুটির তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। প্রথমেই পাঁউরুটিতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহ উপাদানের কোন্‌গুলি আছে এবং কি পরিমাণে আছে তাহা ঐ চার্ট বা তালিকা দেখিয়া নির্ণয় কর। ঐ তালিকা হইতে দেখা যায় যে এক আউন্স রুটিতে ১১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ০.৬ গ্রাম স্নেহ এবং ৩.১ গ্রাম প্রোটিন আছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট হইতে ৪ ক্যালরি তাপ; ১ গ্রাম প্রোটিন হইতে ৪ ক্যালরি তাপ এবং ১ গ্রাম স্নেহ হইতে ৯ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ১ আউন্স রুটির ক্যালরিমূল্যঃ

১১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য	=১১.২×৪=৪৪.৮ ক্যালরি
০.৬ গ্রাম স্নেহের জন্য—	০.৬×৯= ৫.৪ ক্যালরি
৩.১ গ্রাম প্রোটিনের জন্য	৩.১×৪=১২.৪ ক্যালরি
মোট ক্যালরির পরিমাণ	=৬২.৬ ক্যালরি।

যদি প্রত্যহ কেহ ১০ আউন্স রুটি খায় তবে ঐ ১০ আউন্স রুটির তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য হইবে ৬২.৬×১০=৬২৬ ক্যালরি। অর্থাৎ একজন লোক প্রতিদিন ১০ আউন্স রুটি হইতে তাহার দেহে ৬২৬ ক্যালরি তাপ উৎপন্ন হইবে। এইরূপ যে কোনও খাদ্যের ওজন জানা থাকিলে খাদ্য-মূল্য-তালিকার সাহায্যে ঐ ওজনের খাদ্যের ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করা যায়।

কিন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট ওজনের খাদ্যের পরিবর্তে একটি গোটা খাদ্যের ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হয়। যেমন একটি কলার ক্যালরিমূল্য, এক কাপ দুধের বা এক কাপ চায়ের ক্যালরিমূল্য একটি আপেল ও একটি কমলালেবুর ক্যালরিমূল্য

ইত্যাদি। মনে কর, একটি কলার ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। এই ক্যালরিমূল্যের জন্য ঐ কলার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং স্নেহের পরিমাণ জানা প্রয়োজন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে কোন খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ জানিতে হইলে খাদ্য-মূল্য-তালিকার সাহায্য লইতে হইবে। খাদ্য-মূল্য তালিকায় ওজনের ভিত্তিতে সকল খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ দেওয়া আছে। কিন্তু গোটা খাদ্যের উপাদান দেওয়া হয় নাই। অর্থাৎ একটি কলা, এক কাপ চা, একটি আপেল, একটি ডিম ইত্যাদি গোটা খাদ্যের ওজন বা উপাদানের পরিমাণ খাদ্যমূল্য-তালিকা হইতে জানা যায় না। অতএব প্রথমে এই সকল গোটা খাদ্যের ওজন জানিয়া পরে ঐ তালিকার সাহায্যে ঐ সকল খাদ্যের উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয়। এখন এই সকল গোটা খাদ্যের ওজন আবার উহাদের আকৃতি এবং আয়তনের উপর নির্ভর করে। যেমন বড় কলা, আপেল বা ডিমের বেশী ওজন এবং ছোট কলা, আপেল বা ডিমের কম ওজন হইবে। তেমনি এক কাপ দুধ বা ওজন ঐ কাপের আয়তনের উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই সকল গোটা খাদ্যের একটা গড়-পড়তা ওজন প্রমাণ ওজন (standard weight) হিসাবে ধরিয়া লওয়া হয়। যেমন একটি কলার (ছোট) প্রমাণ ওজন ১০০ গ্রাম ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং কলা বলিলেই সাধারণতঃ উহার ওজন ১০০ গ্রাম ধরিয়া লইতে হইবে, এখন এই ওজন হইতে অনায়াসেই খাদ্য-মূল্য-তালিকার সাহায্যে উহার উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। ঐ তালিকা হইতে দেখা যায় যে ১০০ গ্রাম কলায় ০·৮ গ্রাম প্রোটিন, ০·৫ গ্রাম স্নেহ পদার্থ এবং ২২·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে। অতএব ১টি কলার তাপমূল্য ঃ—

০·৮ গ্রাম প্রোটিনের জন্য	০·৮×৪= ৩·২ ক্যালরি
০·৫ গ্রাম স্নেহ পদার্থের জন্য	০·৫×৯= ৪·৫ ক্যালরি
২২·৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য	২২·৫×৪=৯০·০ ক্যালরি
	মোট তাপমূল্য=৯৭·৭ ক্যালরি

এক কাপ দুধ বা চায়ের প্রমাণ ওজন ২৪০ গ্রাম ধরা হয়। অর্থাৎ এক কাপ দুধ বা চা বলিলেই উহার ওজন এই ২৪০ গ্রাম ধরিতে হইবে। এখন খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে এই ওজনের দুধ বা চায়ে কি কি উপাদান কতটুকু পরিমাণে আছে তাহা নির্ণয় করা যায়। মনে কর, এক কাপ চায়ের ক্যালরিমূল্য বাহির করিতে হইবে। খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে দেখা যায় ২৪০ গ্রাম চায়ের মধ্যে ০·৮ গ্রাম প্রোটিন, ০·৮ গ্রাম স্নেহ পদার্থ এবং ৬·৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে।

অতএব ১ কাপ চায়ের তাপমূল্য—

০·৮ গ্রাম প্রোটিনের জন্য	০·৮×৪=৩·২ ক্যালরি
০·৮ গ্রাম স্নেহের জন্য	০·৮×৯=৭·২ ক্যালরি
৬·৮ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য	৬·৮×৪=২৭·২ ক্যালরি
মোট তাপমূল্য	=৩৭·৬ ক্যালরি

এইরূপে গোটা খাদ্যের প্রমাণ ওজন জানা থাকিলে খাদ্য-মূল্য তালিকার সাহায্যে উহার ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করা যায়। নিম্নে কয়েকটি গোটা খাদ্যের প্রমাণ ওজন দেওয়া হইল।

১ কাপ দুধ—	২৪০ গ্রাম	১ চামচ (চায়ের) মাখন	৫ গ্রাম
১ কাপ চা—	২৪০ „	১ টি আপেল (মাঝারি)	১০০
১ টি ডিম—	৫০ „	১ টি কলা (ছোট)	১০০ „
১ খণ্ড রুটি—	২৫ „	১ টি কমলালেবু (ছোট)	১০০ „
১ টি আলু (মাঝারী)—	১৫০ „	১ টি টমেটো (ছোট)—	১০০ „

উপরোক্ত পদ্ধতিতে আমরা যে-কোন খাদ্যের ক্যালরি-মূল্য বা তাপমূল্য নির্ণয় করিতে পারি। মনে রাখিবে কোন খাদ্যের তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য নির্ণয়ের জন্য (১) প্রথমে খাদ্যের ওজন জানা প্রয়োজন, (২) ঐ ওজন হইতে খাদ্য-মূল্য তালিকার (Food value chart) সাহায্যে উহার প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হয় ; (৩) শেষে ঐ প্রোটিনের ওজনকে ৪ দ্বারা, কার্বোহাইড্রেটের ওজনকে ৪ দ্বারা এবং স্নেহের ওজনকে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সমস্ত গুণফল যোগ করিলেই ঐ খাদ্যের ক্যালরিমূল্য বাহির হয়।

খাদ্যের ভাইটামিন ও ধাতব লবণের কোন ক্যালরি-মূল্য নাই।

এখন আমরা অনায়াসেই কোনও ব্যক্তির দুপুরের এবং রাত্রের খাবারের বা সকাল ও বিকালের জলখাবারের তাপমূল্য বা ক্যালরিমূল্য নির্ণয় করিতে পারি। কোনও এক বেলার খাবারে সাধারণতঃ একাধিক বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য থাকে। এই সকল খাদ্যের ক্যালরিমূল্য পূর্বোক্ত প্রণালীতে নির্ণয় করিয়া যোগ করিলেই ঐ বেলার খাবারের মোট ক্যালরিমূল্য বাহির হইবে। মনে কর, একটি লোক সকালের জলখাবার ২ খণ্ড পাঁউরুটি, একটি অর্ধসিদ্ধ মুর্গীর ডিম, ১টি কলা ও ১ কাপ চা দ্বারা সম্পন্ন করিল। এই জলখাবারে ক্যালরিমূল্য নিম্নলিখিত রূপে নির্ণয় করা যায়।

দুইখণ্ড পাঁউরুটির তাপমূল্য নির্ণয়—

দুইখণ্ড পাঁউরুটির মোট ওজন—২৫ × ২ = ৫০ গ্রাম। কারণ একখণ্ড পাঁউরুটির প্রমাণ ওজন ২৫ গ্রাম। খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে দেখা যায় যে এই ৫০ গ্রাম রুটিতে ৩·৯ গ্রাম প্রোটিন, ০·৩৫ গ্রাম স্নেহ এবং ২৬·২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আছে (Food value chart দেখ) অতএব দুই খণ্ড পাঁউরুটির তাপমূল্য ঃ—

৩·৯ গ্রাম প্রোটিনের জন্য— ৩·৯ × ৪ = ১৫·৬ ক্যালরি
০·৩৫ গ্রাম স্নেহের জন্য— ০·৩৫ × ৯ = ৩·১৫ ক্যালরি
২৬·২৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেটের জন্য—২৬·২৫ × ৪ = ১০৫·০ ক্যালরি

মোট তাপমূল্য = ১২৩·৭৫ ক্যালরি

একটি মুর্গীর ডিমের তাপমূল্য নির্ণয় ঃ—

একটি মুর্গীর ডিমের প্রমাণ ওজন ৫০ গ্রাম। খাদ্য-মূল্য-তালিকা হইতে দেখা যায় যে এই ৫০ গ্রাম ডিমে ৬·৬৫ গ্রাম প্রোটিন ও ৬·৬৫ গ্রাম স্নেহ পদার্থ আছে (ডিমের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট নাই)। অতএব একটি ডিমের তাপমূল্য—

৬·৬৫ গ্রাম প্রোটিনের জন্য—৬·৬৫ × ৪ = ২৬·৬ ক্যালরি
৬·৬৫ গ্রাম স্নেহের জন্য— ৬·৬৫ × ৯ = ৫৯·৮৫ ক্যালরি

মোট তাপমূল্য = ৮৬·৪৫ ক্যালরি

একটি কলা ও এক কাপ চায়ের তাপমূল্য যথাক্রমে ১৫২·৬ ক্যালরি ও ৩৭·৬ ক্যালরি (পূর্বে নির্ণয় করা হইয়াছে)।

অতএব দুই খণ্ড পাঁউরুটি, ১টি মুর্গীর ডিম, ১টি কলা ও ১ কাপ চা দ্বারা প্রস্তুত জলখাবারের মোট তাপমূল্য ঃ—

দুই খণ্ড পাঁউরুটির জন্য—	১২৪·২৩ ক্যালরি
১ টি মুর্গীর ডিমের জন্য—	৮৬·৪৫ ক্যালরি
১ টি কলার জন্য—	৯৭·৭০ ক্যালরি
১ কাপ চায়ের জন্য—	৩৭·৬০ ক্যালরি

সর্ব মোট তাপমূল্য = ৩৪৫·৯৮ ক্যালরি

সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতির পদ্ধতি

একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের জন্য সুষম খাদ্য-তালিকা প্রস্তুতির সময় কয়েকটি বিষয় যেমন পরিবারের পুষ্টি, রুচি, বৈচিত্র্য, আবহাওয়া বা ঋতু এবং আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

সুষম খাদ্যতালিকায় ব্যক্তির পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা অগ্রাধিকার লাভ করিবে। এই প্রয়োজনীয়তা তাহার বয়স, ওজন ও পরিশ্রমের সঙ্গে যেন সঙ্গতি রক্ষা করে। (১) প্রথমে দেখা উচিত তাহার খাদ্যতালিকার ক্যালরি মূল্য যেন ন্যূনতম প্রয়োজন মেটায়। যদি একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার অল্প কায়িক পরিশ্রমে ক্যালরির প্রয়োজন হয় ১৯০০ ক্যালরি তবে তাহার খাদ্য তালিকার ক্যালরির মানও যেন ১৯০০ ক্যালরি হয়।

(২) ইহার পর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। ICMR (১৯৬৮) এর নির্দেশ অনুযায়ী এই প্রয়োজন প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের ১ গ্রাম হওয়া উচিত। ∴ উপরিউক্ত মহিলার দৈহিক ওজন ৪৫ কিগ্রা হইলে তাহার প্রোটিনের প্রয়োজন হইবে ৪৫ গ্রাম এবং ইহার অন্ততঃ $\frac{১}{৩}$ অংশ জান্তব প্রোটিন হইলে ভাল হয়।

(৩) তারপর ফ্যাটের পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে। ভারতীয় খাদ্য তালিকায় ফ্যাটের পরিমাণ দৈনিক ৩৮ হইতে ৪০ গ্রাম হইলে ভাল হয় এবং এই ফ্যাটের $\frac{১}{৩}$ অংশ হওয়া উচিত উদ্ভিজ্জ ফ্যাট।

৪৫ গ্রাম প্রোটিনের ক্যালরিমূল্য ৪৫ × ৪ = ১৮০ ক্যালরি
৪০ গ্রাম ফ্যাটের ক্যালরিমূল্য ৪০ × ৪ = ৩৬০ ক্যালরি
৫৪০ ক্যালরি

১৯০০ − ৫৪০ = ১৩৬০ ক্যালরি কার্বোহাইড্রেট হইতে আসিবে।

(৪) এইবার কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ সহজেই নির্ণয় করা যাইবে।

১৩৬০ ÷ ৪ = ৩৪০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট প্রয়োজন।

অথবা মোট ক্যালরির
প্রোটিনের জন্য ১০-১৫% ক্যালরি
ফ্যাটের জন্য ২০-২৫% ক্যালরি
কার্বোহাইড্রেটের জন্য ৬০-৭০% ক্যালরি হইলে ভাল হয়।

(৫) ধাতব লবণ ও অন্যান্য ভাইটামিনগুলি সরবরাহের একমাত্র উপায় খাদ্যতালিকার উপকরণগুলি খাদ্যের বিভিন্ন বিভাগ হইতে গ্রহণ করা। মাত্র কয়েক ধরণের খাদ্য প্রতিদিন আহার করা উচিত নয়। বিভিন্ন বিভাগ হইতে খাদ্য বাছাই করার সময় প্রতিদিন খাদ্যের পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য রক্ষা করিয়া চলিলে উপরিউক্ত উপাদানগুলির অভাব ঘটিবে না।

এইবার এই খাদ্য প্রস্তুতির সময় রন্ধন পদ্ধতিতে পুষ্টিমূল্যের অপচয় যেন সর্বাপেক্ষা কম হয় এবং খাদ্যের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা হয়। তাছাড়া সময়ের অপচয়ও যেন কম হয়। প্রস্তুত খাদ্য যেন রুচিকর হয়। উহা বৈচিত্রে, বর্ণে, সুগন্ধে এবং পরিবেশনার গুণে আহার গ্রহণকারীকে যেন আকৃষ্ট করে। পরিতৃপ্ত আহারেই সুষম খাদ্যতালিকা প্রস্তুতির সার্থকতা।

খাদ্যতালিকা প্রস্তুতির পূর্বে প্রস্তুতকারীর নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকিতে হইবে।

(১) খাদ্য মূল্য তালিকা (Food Value chart) এবং উহার সীমিত প্রয়োগ;

(২) সাধারণ ঘরোয়া মাপ (Common Kitchen/Household measures);

(৩) খাদ্য বিনিময় তালিকা (Food exchange list)

প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এক গ্লাস অন্যথায় এক কাপ দুধ থাকা চাই। কিছু টাটকা শাকসবজি অথবা ফল থাকিলে ধাতব লবণ ও ভাইটামিনের অভাব-যথাসম্ভব এড়ান যায়।

নীচে একটি আদর্শ খাদ্যতালিকার উদাহরণ দেওয়া হইল।

খাদ্যতালিকা

খাদ্যশস্য	পরিমাণ	মাপ
ভাত, গম, রুটি	৩০০ গ্রাম	৫½ কাপ
আলু		১টি মাঝারি
ডাল	৪৫ গ্রাম	১ কাপ ঘন
ডিম	৩০ গ্রাম	১ টি ছোট মুর্গীর
মাছ/মাংস/মুর্গী	৩০ গ্রাম	ডিম = ½ হাঁসের ডিম
		১ টুকরা মাছ
		অথবা ১/½ মুর্গীর পা
দুধ	১০০ গ্রাম	½ কাপ
ফল	৩০ গ্রাম	১টি ছোট কলা বা
সবুজ শাকসবজি		আপেল বা পেয়ারা
অন্যান্য সবজি		½ কাপ রান্না করা শাক
		½ কাপ রান্না করা
		বেগুন/পটল/কফি ইত্যাদি
তেল/ঘি	২০ গ্রাম	১½ টেবিল চামচ
গুড় চিনি	৩০ গ্রাম	১½ টেবিল চামচ

একটি বিনিময় তালিকা (Food exchange list)

মাংসের বিনিময় (Meat exchange)

৩০ গ্রাম রান্না করা মাংস
½ মুর্গীর পা
১টি ডিম
২ টেবিল চামচ বাদামের মাখন
পাঁচটি ছোট মৌরলা/চিংড়ি মাছ

উপরোক্ত যে কোন একটি খাদ্য হইতে ৭ গ্রাম প্রোটিন ও ৫ গ্রাম ফ্যাট পাওয়া যাইবে।

ফ্যাটের বিনিময় (Fat exchange)

১ টেবিল চামচ বাদাম বা সর্ষের তেল
১ চা চামচ মাখন
১ চা চামচ মেয়োনেজ
১ চা চামচ ডালডা

ইহাদের যে কোন একটি খাদ্য হইতে ৫ গ্রাম ফ্যাট পাওয়া যাইবে।

ফলের বিনিময় (Fruit Exchange)

১টি ছোট আপেল
১টি ছোট কমলা
½ কলা
২ টেবিল চামচ কিসমিস

ইহাদের যে কোন একটি খাদ্য হইতে ১০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, সামান্য প্রোটিন ও ফ্যাট পাওয়া যাইবে।

ভাত/রুটি বিনিময় Rice/Bread exchange

½ কাপ ভাত
১ টুকরা রুটি
½ কাপ আলু সিদ্ধ
১ কাপ কর্নফ্লেকস
¼ কাপ ডাল সিদ্ধ

উক্ত খাদ্যের যে কোন একটি হইতে ১৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ২ গ্রাম প্রোটিন মিলিবে।

FOOD VALUE CHART

Source ঃ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ ; "খাদ্য বিশ্লেষণ", বীরেশচন্দ্র গুহ

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
1. তণ্ডুল ও দানাশস্য ঃ		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাব			
চাল (ঢেঁকি ছাঁটা)	৩৪৯	৮·৫	০·৬	৭৭·৪	৩৯·০	৩০৩	২·০	১৫	০·২৭	০·১২	৪·০	
চাল (কলে ছাঁটা)	৩৪৫	৬·৪	০·৪	৭৯·০	২৪·০	১৩৬	০·৮		০·২১	০·০৯	৩·৮	
গমের আটা	৩৪১	১২·১	১·৭	৬৯·৪	৪১·০	৩৭২	৩·৩		০·৫৫	০·১২	৪·৩	
পাঁউরুটি (সাদা)	২৪৫	৭·৮	০·৭		১১·০		১·১		০·২১		২·৫	
চিঁড়া (Rice flakes)	৩৪৬	৬·৬	১·২	৭৭·৩	২০·০	২২৩	৫·৫		০·১২	০·০৫	৪·০	
মুড়ি (Rice puffed)	৩২৫	৭·৫	০·১	৭৩·৬	২৩·০	১৫০	৬·৬		০·২১	০·১২	৪·১	
খৈ	৩৬৩	৭·২	০·৪	৮২·৬	৯·০	৯২	০·৯		০·০৫	০·০৩	১·৪	
বার্লি	৩৩৬	১১·৫	১·৩	৬৯·৬								
		৮·২	১·০	৭৮·৮	১৬·০	১৮৯	২·০	৭	০·৪৭	০·২০	৫·৪	
সুজি	৩৪৮	১০·৪	০·৬	৭৪·৮	১৬·০	১০২	১·৬		০·১২	০·৮	০·৩১	
ভুট্টা	৩৬৫	৯·১	৩·৭	৭৩·৯	১৮·০	২৪৮	২·৭		০·৪১	০·১২	১·৭	

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
ছোলার ডাল (Bengal gram)	৩৮৫	২০'৮	৫'৬	৫৯'৮	৫৬	৩৩১	৯'১	২১৬	০'৪৮	০'১৮	২'৪	১'০
মটর ডাল	৩৫৪	২৪'৫	১'১	৭১'৩	৭০	৩০৩	৪'৭	১৫৮	০'৪৭	০'৩৯	২'১	১'০
মুগ ডাল (Green Gram dal)	৩৫৮	২৪'৫	১'২	৫৯'৯	৭৫	৪০৫	৮'৫		০'৪৬			
অড়হর ডাল (Black gram dal)		২২'৩	১'৭	৫৭'৬	৭৩	৩০৪	৫'৮	২২০	০'৪৫	০'৫১	২'৬	
মসুর ডাল (Lentil)	৩১৬	২০'৫					২'০					
	৩৭১	২৫'১	০'৭	৫৯'৯	৬৯	২৪২	৪'৮	৪৫০	০'৪৫	০'৪৯	১'৫	
মাসকলাই (Black gram dal)	৩২৬	২৪'০	১'৪	৫৯'৬	১৫৪	৩৮৫	৯'১	৬৪	০'৪২	০'৩৭	২'০	
খেসারির ডাল (Khesari)	৩২৭	২২'৯	০'৭	৫৫'৭	৯০	৩১৭	৬'৩					
ছোলা—গোটা (Bengal gram)	৩২৩	১৭'১	৫'১	৬০'৯	১৯০	১৮৪	৯'৮	৩১৬	০ ৩	০'৫	২'১	৩'০
সয়াবিন	৩৫০	৩৪'৯	১৮'১	১২'০	১৯০	৬৩১	৬'৯					
	৪৫৩	৪৩'২	১৯'৫	২০'৯	২৪০	৬৯০	১১'৫	৭১০	০'৭	০'৭	২'৪	
2. শাক-সবজি												
কলমি শাক (Ipomoea)	২৮	১'৭	০'৪	৪'৩	১১০	৫০	৩'৯	৩০০০	০'০৫	০'১২	০'৬	১৩৭
কচুশাক-ডাঁটা (কালচে)	২১	০'৩	০'৩	৪'২	৩৯	২০	০'৫	৬০০		০'১		
ডাঁটাশাক	৩৪	১'৬	০'৫	৫'৬	৫৮	১০৩	৮'৩	৪২৫	০'০১	০'১৮		১০
নটে শাক (Amaranth)	৪৬	৪'০	০'৫	৬'৩	৩৯৭	৮৩	২৫'৫	৯২০০	০'০৩	০'১০	১'২	৯৯
পালং শাক (Spinach)	৩৪	৫'১	০'৯	৭'৭	৫৯৫	৯৩	১৯'৫	৯৩০০	০'০৩	০'০৭	০'৫	২৮
পুঁই শাক		১'২			১৫০	৪৬০	১'৪					
পেঁয়াজ কলি	৪১	০'৯	০'২	৮'৯	৫০	৫০	৭'৫	৯৯৩		০'০৩	০'৩	১৭

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান

(প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
পলতা শাক (Parwar Sag)		৫.১			৬০	২৫০	০.৮	৩৭২০	৩৬.০	৬৩.০		২১.৬
নিমপাতা	১৫৮	১১.৬			১৩০	১৯০	৬.৮	২৭৩৬				
সজনে শাক (Drumstick leaves)		৬.৭			৪৪০	৭০	৭.০	১১.৩০০	০.০৬	০.০৫	০.৮	২২০
কুমড়ো শাক					৩৯২	১১২						
মুলো শাক (Raddish top)					৩১০	৬০	১৬.১	১৮.৬৬০	০.০৩	০.১৬	০.৩	১০৩
সজনে ডাঁটা (Drumstick)	২৬	২.৫	০.১	৩.৭	৩০	১১০	৫.৩	১৮৪	০.০৫	০.০৭	০.২	১২০
সিম	৩৩-৬২	২.৫	০.৩	৫.১	২১	৪৯	০.৬			+		+
আলু	৮৩	২.০	০.১	১৯.১	১১	৫৬	০.৭	৪০	০.১১	০.০১	১.২	১৭
উচ্ছে	৬০	২.৯	১.০	৯৮	৫০	১৪০	৯.৪	২১০	০.০৭	০.৯	০.৫	২৭
ওল (Yam)	১১০	২.৪	০.১	২৪	৬০	২০	১.৩	১৩০	০.০৭		০.৭	
ওলকপি	৩০	১.১	০.১	৫.৯	২০	৪০	০.৪	+		+		+
কচু (Colocasia)	১০০				৪০	১৪০	২.১	৪০	০.০৯	০.০৩	০.০৪	
কড়াইশুঁটি (Green peas)	১১২	৭.২	.	১৯.৮	৩৮	১০৪	১.৪	৮৩.৪				
কাঁচ কলা (Green plantain)	৬৪	১.৪	০.২	১৪.৭	১০	৩০	০.৬	৫০	০.০৫	০.০২	০.৩	২৪
কাঁঠালবিচি (Jackfruit seed)	১৮৪	৬.৬	০.৪	৩৮.৪	৫০	১৩০	১.২	১৭	০.২৫	০.১১	০.৩	১১
কাঁচা পেঁপে	২৯	০.৪	০.৩	৬.২	২১/৩৪	১৫/৬৪	০.৯		০.১	০.০১	০.১	১২

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যাল-সিয়াম	ফস-ফরাস	লোহা	'এ'/ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
	গ্রাম হিসাবে				মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
কুমড়ো (pumpkin)	২৫	১'৪	০'১	৪'৬	১০	১৯	০'৩	৮৪	০'০৬	০'০৪	০'৫	২
কুমড়ো (চাল)	৯	০'৪		১'৭	৩০	২০	০'৮		০ ০৬	০'০১	০'৪	১
গাজর (Carrot)	৪৮	১'২	০'৩	১০'৭	৩৯	৩৭	০'৮	৩১৫০	০'০৪			
									০ ৩৬	০'০২	০'৬	৩
চিচিঙ্গে (Snake Gourd)	২৩	১'০	+	৪'৪	৫০	২০	১'১	১৬০	০'০৪	০'০৬	০'৩	
ঝিঙ্গে (Ridge Gourd)	১৭	০'৫	০'১	৩'৪	৪০	৪০	১'৬	৫৬	০'০৭	০'০১	০'২	৫
ডুমুর (Figs)	৩৭	১'৩	০'২	৭'৬	৬০	৩০	১'২	২৭০	০'০৬	০'০৫	০'৪	১৮০
ঢ্যাঁড়স (Ladies finger)	৩৫	১'৯	+	৬'৪	৬৬	৫৭	১'৫	৫১	০'০৪	০'১	১'০	৫৬
থোড় (Plantain Stem)	৪২	০'৫	০'১	৯'৭	১০	১০	১'১		০'০২	০'০১	০'২	৭
পটল (Parwar)	২০	২'০	০'৩	২'২	৩০	৪০	১'৭	২৫৫	০'০৫	০'০৬	০'৫	২৯
ফুলকপি (Cauliflower)	১১-৪৩	১'৫-৩'৫	+	৩'৫-৫'৩	৩৩	৫৭	১'৫	৫১	০'০৪	০'১	১'০	৫৬
বরবটি	২৭	১'৭		৪'৭								
বাঁধাকপি (Cabbage)	৩০	১'১	০'১	৫'৯	৩৯	৪৪	০'৮	২০০০	০'০৬	০'০৩	০'৪	১২৪
বিট (Beet)	৪৬	১'৪	+	৯'৬	২০০	৫৫	১'০		০'০৪	০'০২	০'৬	৮৮
বিন (Bean)	১৫৮	৭'৪	১'০	২৯'৮	৫০	১৬০	২'৬	৫৭	০'৩৪	০'১৯		২৭
বেগুন (Brinjal)	২৪	০'৩	০'৩	৪'০	১৮	৪৭	০'৯	১২৪	০'০৪	০'১১	০'৯	১২
মোচা (Plantain flower)	৩৪	১'৭	০'৭	৫'১	৩২	৪২	১'৬	৪৬	০'০৫	০'০২	০'৪	১৬
মূলা (Raddish)	২২	০'৬	+	৪'২	৫০	২০	০'৫	৫	০'০৬	০'০২	০'৪	১৬

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান
(প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যাল-সিয়াম	ফস-ফরাস	লোহা	'এ'/ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
রাঙ্গালু	১২৫		০·৭	২০·৯	৩০	৪৯	০·৭	১০	০·০৮	০·০৪	০·৭	২৪
লংকা—কাঁচা	২৯	২·৯	০·৬	৩·০	৩০	৮০	১·২	২৯২	০·১৯	০·৩৯	০·৯	১১১
লাউ (Calabash)	১২	০·২	০·১	২·৫	২০	১০	০·৭		০·০৩	০·০১	০·২	৬
শালগম (Turnip)	৩৫	১·১	+	৭·৬	৩০	৪০	০·৪		০·০৪	০·০৪	০·৫	৪৩
3. ফল ঃ												
আখ (Sugar Cane)	৮৩	০·১	০·১	২০·৫	১০	২০	০·৩					
আখের রস	৩৯	০·১	০·২	৯·১	১০	১০	১·১	১০		০·০৪		
আতাফল (Sithaphal)	১১৪	১·৬	০·৩	২৬·২	৩৯৮	৪০	০·৩		০·৩৩	০·৪৪	১·৩	২৬
আম (ল্যাংড়া)	৮২	০·৮	০·৮	১৭·৮	১০	২০	০·৯	১০০৩			১·৫	৮৩
আম (গোলাপখাস)	৬৮	০·৬	০·২	১৬·০	১৬	১৪						
আম (ফজলি)	৬৯	০·৫	০·৪	১৫·৮	২০	২০		১২২০			০·৬	
আম (আলফানশো)	৭৫	০·৪	০·৯	১৬·২	৪২	১৬	১·৬	১১৪২০	০·০৭	০·১০	১·৬	৩৭
আঙ্গুর (Grape fruit)	৭১	০·৫	০·৩	১৬·৫	২০	৩০	১·৫		০·১২	০·০২	০·৩	৩১
আনারস (Pineapple)	৪৬	০·৪	০·১	১০·৮	২০	৯	১·২	৩০	০·২	০·১২	০·১	৩৯
আপেল (Apple)	৫৫	০·৩	০·১	১৩·৩	৯	২০	১·০		০·১২	০·০৩	০·২	২

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
কলা (Banana)	৯৮	০·৮	০·৫	২২·৫	১০	৩০	০·৫	৫০-৮০	০·৩	০·১	০·৬	৮
কমলালেবু (Orange)-নাগপুর	৪০	০·৬	০·২	৮·৯	৫০	২০	০·১	৩২৬ / ১৮০০	০·১২	০·০৬	০·৩	৩০ / ৬৮
কাঁঠাল (Jackfruit)	৮৮	১·৯	০·১	১৯·৮	২০	৪১	০·৫	২৯২	০·০৩	০·১৩	০·৪	৭
কালোজাম (Jambu fruit)	৬২	০·৭	০·৩	১৪·০	১৫	১৫	১·০	৮০		০·১	০·২	১৮
কিসমিস (Raisins)	৩০১	১·৮	০·৫	৭২·২	৭০ / ১০০	৮০	৭·১		০·১২	০·২৩	০·৫	৩
কুল (Plums)	৪৪	০·৭	০·৪	৯·৫	১০	১০	০·৬	৬০৮	০·০১	০·১৯	০·৪	৫
খরমুজ (Melon musk)	+	+	+	+	৬৫	২০	১·০					
খেজুর (Dates)	১৪৪	১·২	০·৪	৩৩·৮	১২০	৫০	৭·৩	৪৪	০·০১	০·০২	০·৯	৩
জলপাই (Olive)					৩৭	২৬	৩·১	৩১৭	০·০২	০·০৬	০·৩	
জামরুল (Pannirkoya)	৪৩	০·৭	০·২	৯·৭	১০	৩০	০·৫	২৩৫	০·০১	০·০৫	০·৪	৩
টমাটো (Tomato)-পাকা	২০	০·৯	০·৬	৫·৮	৪৮	২০	০·৪	৫৮৫	০·১২	০·০৬	০·৪	২৭
টঁ্যাপারি (Cape Goosebery)	৫৩	১·৮	০·২	১১·১	১০	৬৭	২·০	২০৮০	০·০৫	০·০২	০·৩	৪৯
ডালিম (Pomegranate)	৬৫	১·৬	০·১	১৪·৫	১০	৭০	০·৩		০·০৬	০·১	০·৩	১৪
ডাবের জল-কচি সবুজ-(Coconut)	২২	০·১	০·১	৫·০	২০	১০	০·১		+	+	০·১	২
তরমুজ (Melon water)	১৬	০·২	০·২	৩·৩	১১	১২	৭·৯		০·০২	০·০৪	০·১	১
তালশাঁস (Palmyra)	২৯	০·৬	০·১	৬·৫	১০	২০	০·৫		০·০১	০·০১	০·২	৪

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান
(প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসামে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
নারকেল—ঝুনো	৬৬২	৬·৮	৬২·৩	১৮·৪	৪০০	২১০	২·৭		০·০৮	০·০৬	০·৬	৭
নোনা (Bullock-heart)	৭০	১·৪	০·২	১৫·৭	১০	১০	০·৬	১১০		০·০৭	০·৬	৫
ন্যাসপাতি-দেশী (Pears)	৫৮	০·৩	০·৩	১৩·৪	২০	২০	৩·৬	১৪	০·০২	০·০৩	০·২	
পাকা পেঁপে (Papayya)	৩২	০·৬	০·১	৭·২	১৭	১৩	০·৫	১১১০	০·০৪	০·২৫	০·২	৫৭
পীচফল (Peaches)	৫০	১·২	০·৩	১০·৫	১৫	৪১	২·৪		০·০২	০·০৩	০·৫	৬
পেয়ারা (Guava)	৫১	০·৯	০·৩৩	১১·২	১০	২৮	১·৪		০·০৩	০·০৩	০·০৪	২১২
ফুটি (Melon white)	২৫	০·৬	০·১	৫·৪	১৫	১০	১·০	২৬৫			০·১	১০
বাতাবি লেবু (Pummelo)	৪৪	০·৬	০·১	১০·২	৩০	৩০	০·৩	২০০	০·০৩	০·০৩	০·২	২০
বেল (Baelfruit)	১৩৭	১·৮	০·৩	৩১·৮	৮৫	৫০	০·৬	৯৩	০·১৩	১·১৯	১·১	৮
মুসাম্বি (Sweet lemon)	৩৫	০·৭	০·৩	৭·৩	৪০	২০	০·৩					৫০
লিচু (Lichis)	৬১	১·১	০·২	১৩·৬	১০	৩৫	০·৭		০·০২	০·০৬	০·৪	৩১
লেবু (কাগজি-পাতি) (Lemon)	৫৭	১·০	০·৯	১১·১	৯০	২০	০·৩		০·০২	০·০২	০·১	৬৩
শশা (Cucumber)	১৩	০·৪	০·১	২·৫	১০	২৫	১·৫		০·০৩	০·০১	০·২	৭
সবেদা (Sapota)	৯৪	০·৫										৬
	১১০	১·১	১·২	২২·৩	১০	২০	০·৩		০·০১		০·১	১০

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
4. তৈলবীজ :												
বাদাম (Almond)	৬৫৫	২০·৮	৫৮·৯	১০·৫	২৩০	৪৯০	৪·৫		০·২৪	০·২৫	২·৫	
কাজুবাদাম (Cashew nut)	৫৯৬	২১·২	৪৬·৯	২২·৩	৫০	৪৫০	৫·০	১০০	০·৬৩	০·১৯	২·১	
চিনাবাদাম (Ground nut)	৫৪৯	২৬·৭	৪০·১	২০·৩	৫০	৪৪০	০·৩	৬৩	০·৯	০·৩	১৪·৩	
চিনাবাদাম (ভাজা)	৫৬১	৩১·৫	৩৯·৮	১৯·৩	৫০	৩৯০	১·৬	০	০·৩৯	০·১৩	৮·৮	
নারকেল	৬৬২	৬·৮	৬২·০	১৮·৪	৪০০	২১০	২·৭		০·০৮	০·০৬	০·৬৭	
তিল (Gingelly Seeds)	৫৬৩	১৮·৩	৪৩·৩	২৫·০	১৪৫০	৫৭০	১০·৫	১০০	১·০১	০·১১	৪·৪	
5. স্নেহপদার্থ :												
মাখন	৭২৯	০	৮১·০	২·৫				৩২০০				
ঘি	৮২৮	০	৯২·০					২০০০				
উদ্ভিদের তেল	৯০০	০	১০০·০					২৫০০				
বনস্পতি	৯০০	০	১০০·০									
দুধ—গরু	৬৭	৩·২	৪·১	৪·৪	১২০	৯০	০·২	১৭৪	০·০৫	০·১৯	০·১	২
দুধ—মহিষ	১১৭	৪·৩	৮·৮	৫·১.	২১০	১৩০	০·২	১৬০	০·০৪	০·১০	০·১	১
দুধ—ছাগল	৭২	৩·৩	৪·৫	৪·৬	১৭০	১২০	০·৩	১৮২	০·০৫	০·০৪	০·৩	১
দুধ—মানুষ	৬৫	১·১	৩·৪	৭·৪	২৮	১১	০·১	১৩৭	০·০২	০·০২		৩
দুধ—মাখন তোলা (Skimmed)	২৯	২·৫	০·১	৪·৬	১২০	৯০	০·২				০·১	১
দুধ—গুঁড়া (Whole-powder)	৪৯৬	২৫·৮	২৬·৭	৩৮·০	৯৫০	৭৩০	০·৬	১৪০০	০·০১	১·৩৬	০·৮	৪

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান
(প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাব			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
দই (গরুর দুধের)	৬০	৩·১	৪·০	৩·০	১৪৯	৯৩	০·৩	১০২	০·০৫	০·১৬	০·১	১
ছানা (গরুর দুধের)	২৬৫	১৮·০	২০·৮	১·২	২০৮	১৩৮		৩৬৩	০·০৭	০·০২		৩
পনির	৩৪৮	২৪·১	২৫·১	৬·৩	৭৯০	৫২০	২·১	২৭৩				
নারকেলের দুধ	৪১৮	২·৪	৪১·৩	৯·১	২০	১৬০	১·৪		০·০৬	০·০৫	০·৪	৪
কডলিভার তেল	৯০০		১০০·০					৬০০০০				
ঘোল (Butter milk)	১৫	০·৮	১·১	০·৫	৩০	৩০	০·৮					
					১১৮	৯৩	০·০৭	+				
6. মিষ্টি ঃ												
গুড় (Jaggery)	৩৮৩	০·৪	০·১	৯·৫	৮০	৪০	১১·৪	০-২৮০	০·০২		১·০	
চিনি (আখের)	৩৯৪	০·১		৯৮	১২-২৮	১-৪						
মধু (Honey)	৩১৯		০·২	৭৯৫	৫	১৬	০·৯			০·০৪	০·০২	৪
7. ডিম-মাংস-মাছ ঃ												
ডিম—হাঁসের	১৮১	১৩·৫	১৩·৭	০·৮	৭০	২৬০	৩·০	১২০০	০·১২	০·২৮	০·২	
ডিম—মুরগীর	১৭৩	১৩·৩	১৩·৩		৬০	২২০	২·১	১২০০	০·১০	০·১৮	০·১	

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যাল-সিয়াম	ফস-ফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
মাংস—মুরগী	১০৯	২৫.৯	০.৬		২৫	২৪৫						
—ছাগল	১১৮	২১.৪	৩.৬		১২	১৯৩						
—শূকর	১১৪	১৮.৭	৪.৪		৩০	২০০			০.৫৪	০.০৯	২.৮	২
—ভেড়া	১৯৪	১৮.৫	১৩.৫		১৫০	১৫০.	২.৫	৩১	০.১৮	০.২৭	৬.৮	
—গরু	১১৪	২২.৬	২.৬		১০	১৯০	০.৮	৬০	০.১৫	০.০৪	৬.৪	২
—কচ্ছপ	৯৩	১৫.০	১.২		৪৩	১৯৬						
		১৮.০	২.৩		৬১০	৫৩০	১.৩					
—কাঁকড়া	৫৯	৮.৯	১.১	৩.৩	১৩৭০	১৫০					৫.৬	
	১৬৯	১১.২	৯.৮	৯.৯	১৬০৬	২০৩	২১.২	১৩০০			৩.১	
মেটুলি (Liver)—ভেড়ার	১০৭	২০.০	৩.০		১৭	২৭৯						
মাছ—আড়	৮৯	১৫.৯	১.৩	৩.৫	৩৮০	১৮০	০.৭					
—ইলিশ	২৭৩	২১.৮	১৯.৪	২.৯	১৮০	২৮০	২.১					
—কই	৭০	১৪.৮	৮.৮	৪.৪	৪১০	৩৯০	১.৪					
—কাতলা	১০৬	১৮.৬	১.৯	৩.৭	৫১০	২১০	০.৮					
—খলসে	১১২	১৬.১	৩.৯	৩.১	৪৬০	৩৬০	০.৯					
—খয়রা	১২০	১৮.০	৩.০	৫.২	৫৯০	২২০	০.৭					
—গুড়জাওয়ালি	৭৬	১৬.১	১.১	০.৫	৩৮০	২৮০	২.১					
—চিংড়ি—মোচা	৯০	২০.৫	০.৯	০	৯০	২৪০	০.৮					
—বাগদা	৮৬	২০.৮	০.৩	০								

বিভিন্ন খাদ্যবস্তুতে পুষ্টি-উপাদান
(প্রতি 100 গ্রাম ওজনে)

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
মাছ—ট্যাংরা	১৩৪	১৯.২	৬.৪	০	২৭০	১৭০	২.১					
—পমফ্রেট	৭৮	১৫.১	১.০	২.২	২০০	২৯০	০.৯					
—পাবদা	১১৪	১৯.২	২.১	৪.৬	৩১০	২১০	১.৩					
—পুঁটি—ছোট	১০৬	১৮.১	২.৪	৩.১	১২০	৯৬	১.০					
—সর	১৬১	১৬.৫	৯.৪	২.৩	২২০	১২০	০.৫					
—ফলুই	৮২	১৯.৮	১.০	১.০	৫৯০	৪৫০	১.৭					
—বাচা	১৪৭	১৮.১	৫.৬	৬.১	৫২০	১৮০	০.৭					
—বাটা	৮৯	১৪.৩	২.৫	২.২	৭৯০	২০০	১.১					
—বেলে	৭৫	১৪.৫	০.৬	২.৯	৩৭০	৩৩০	১.০					
—বোয়াল	১১৬	১৫.৪	২.৭	৭.৬	১৬০	৪৯০	০.৬					
—ভাঙ্গর	১৫৪	১৪.৮	৮.৮	৩.৮	১৮২	১৯০	১.২					
—ভেটকি	৭৩	১৩.৭	১.১	১.২	৫৩০	৪০০	১.০					
—মাগুর	৮৬	১৫	১.১	৪.২	২১০	২৯০	০.৭					
—মৌরলা (কাঁটা সহ)	১১৯	১৮	৪.১	২.৬	৫৫০	২৫০	০.৭					
—মৃগেল	৯৮	১৯.৫	০.৮	৩.২	৩৫০	২৮০	১.৯					

খাদ্যের নাম	ক্যালরি	প্রোটিন	ফ্যাট	শর্করা	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লোহা	'এ'/ ক্যারটিন	'বি-ওয়ান'	'বি-টু'	নিয়াসিন	'সি
		গ্রাম হিসাবে			মিলিগ্রাম হিসাবে			ইঃ ইউনিট	মিলিগ্রাম হিসাবে			
মাছ—রুই	৯৭	১৬.৬	১.৪	৪.৪								
—ল্যাটা	৮৩	১৯.৪	০.৬		৬১০	৫৩০	১.৩					
—শিঙ্গি	৯৬	২২.৮	০.৬		৬৭০	৬৫০	২.২					
—শোল	৮৫	১৬.২	২.৩	১.৩	১৪০	৯৫	০.৫					
৪. মশলা :												
আদা (Ginger-Fresh)		২.৩	০.৯	১২.৩	২০	৬০	২.৬	৬৭	০.০৬	০.০৩	০.৬	৬.০
এলাচ (Cardamom)		১০.২	২.২	৪২.১	১৩০	১৬০	৫.০	০	০.২২	০.১৭	০.৮	০
গোলমরিচ (Pepper, dry)		১১.৫	৬.৮	৪৯.২	৪৬০	১৯৮	১৬.৮	১৮০০	০.০৯	০.১৪	১.৪	—
জিরা (Cumin seeds)		১৮.৭	১৫.০	৩৬.৬	১০৮০	৫১১	৩১.০	৮৭০	০.৫৫	০.৩৬	২.৬	৩
জোয়ান (Omun)		১৭.১	২১.৮	২৪.৬	১৫২৫	৪৪৩	২৭.৭	১১৯	০.২১	০.২৮	২.১	—
ধনিয়া (coriander)		১৪.১	১৬.১	২১.৬	৬৩০	৩৯৩	১৭.৯	১৫৭০	০.২২	০.৩৫	১.১	০
মেথি (Fenngreek)		২৬.২	৫.৮	৪৪.১	১৬০	৩৭০	১৪.১	১৬০	০.৩৪	০.২৯	১.১	০
পিপুল (Arisippili)		১৩.২	৪.৭	৫৮.৪	৪৬০	৩২৫	১৩.৫					
রসুন (Garlic-dry)		৬.৩	০.১	২৯.৮	৩০	৩১০	১.৩	০	০.০৬	০.২৩	০.৪	১৩
লঙ্কা (শুকনো) (Chillies)		১৫.৯	৬.২	৩১.৬	১৬০	৩৭০	২.৩	৫৭৬	০.৯৩	০.৪৩	৯.৫	৫০
লবঙ্গ (Cloves-dry)		৫.২	৮.৯	৪৬.০	৭৪০	১০০	৪.৯	৪২২	০.০৮	০.১৩	০	০
হলুদ (Turmeric)		১৩.১	৫.১	৬৯.৪	১৫০	২৮২	১৮.৬	৫০	০.০৩	০	২.৩	০
হিং (Asafatida)		৪.০	১.১	৬৭.৮	৬৯০	৫০	২২.২	৮	০	০.০৪	০.৩	০

Specimen Questions

NUTRITION

Paper I

A Type

1. What is food ? How is it related to health ? Name some articles, which are not food, though we eat.

2. Do you think that availability of food depends upon its proper distribution ? Why ?

3. How do you define "food" from the hygienic point of view ? Why do we require food ? Discuss.

4. Explain what is meant by "Basic Seven food groups." Assess the food value of groundnut. It is said groundnut make an excellent food though we may not know it.—Substantiate.

5. Define and classify carbohydrate. Mention the Physical Properties of each group. What are their sources ?

6. Why are the fats called triglycerides ? A gram of fat yields 9 calories, whereas carbohydrate produces only 4 calories. Why ? Oils are liquid in room temperature, whereas fats are solid in the same—why ?

7. Do you think that protein foods are very important for health ? Why ?

Differentiate between first class and second class protein foods. How do you improve the biological value of second class protein food ? Name some good sources of superior protein.

8. What is the use of mineral salts in our dietaries ? What are the different salts ? Name some kinds of food in which salts predominate.

9. What are the good sources of Ca and Fe ? What are their role in human nutrition ?

10. What are the proteolytic enzymes ? What are their substratas ? What is the end products of protein digestion ?

11. What do you mean by caloric value of food ? Why do we require calorie ? What are the factors, on which calorie requirement of human being depends ? How do you calculate total calorie requirement of a person ?

12. Name some natural foods rich in vitamin C and B_2. Describe the deficiency symptoms of these two vitamins.

13. Do you need water ? Why ? What measures would you follow to maintain water balance in your body ?

What is the bad effect of NaCl depletion on water balance ?

14. 'Iron is absorbed only when body needs it'—why ? Describe the mechanism of iron absorption.

15. Classify foods according to basic food groups. Give comparative study of milk and egg from the point of view of their nutritive values.

16. What is the fate of Carbohydrate after absorption ?

17. What is melabolism ? Describe Carbohydrate metabolism. What part does insulin play in Carbohydrate metabolism ?

B Type

Write short notes on :—

(1) Essential amino acids, (2) Essential fatty acids, (3) Cellulose, (4) Basal metabolism, (5) Soyabeans, (6) Germinating gram, (7) Green leafy vegetables, (8) citrus fruits, (9) Biological value of protein, (10) Digestibility co-efficient of protein, (11) Urea formation, (12) 'N' balance, (13) ATP, (14) Protein requirement of Indian children from birth to 12 years of age; (15) Dietetics and its meaning. (16) Nutrition and health, (17) Kwashiorkor, (18) Anaemia, (19) Goitre, (20) Beri beri, (21) Fat absorption. (22) Hydrogenation of fat.

B Type

Give reasons for the following :—

(1) Bile helps the digestion and absorption of fat.
(2) Food value of hand-pound rice is better than milled rice.
(3) Per-boiled rice is better than raw rice.
(4) Atta is better than maida.
(5) Puffed rice is easily digestible than crisped biscuits.
(6) Milk and egg supplement each other.
(7) 'Khichuri' is better than rice.
(8) Tomatoes should be taken raw.
(9) Diabetic patient should not take potatoes.
(10) Milk and egg should be taken together.

B Type

Give comparative study of the following :—

(1) Sugar and jaggery, (2) Bread and biscuits (3) Tea ond Cocoa, (4) Rice and pulses, (5) Milk and curd, (6) Soyabeans and groundnuts, (7) Animal fat and vegetable fat.

C Type

I. Arrange the causes and effects properly :—

Causes	*Effects*
(a) Beri beri	Deficiency of Vitamin A
(b) Anaemia	,, ,, ,, D
(c) Night blindness	,, ,, ,, B
(d) Goiter	,, ,, ,, Ca
(e) Ricket	,, ,, ,, Fe

II. Match the foods with its sources :—(Put the number in the box against the food items).

Foods

(i) Tomatoes ☐
(ii) Cod liver ☐
(iii) Meat ☐
(iv) Milk ☐

Sources

(1) Good Source of D-Vitamin
(2) ,, ,, ,, C-Vitamin
(3) ,, ,, ,, Carbohydrate
(4) ,, ,, ,, Protein

III. Mark under the correct answers :—

(1) Skimmed milk yields more calorie, less calorie than whole milk.

(2) Pulses are good sources of superior, inferior Protein.

(3) One mol. of glucose produces one, two mol. Pyruvic acid.

(4) Diabetes is caused due to the deficiency of insulin, thyroxin.

(5) Pepsin helps the digestion of meat, milk.

(6) Ptyalin acts on boild starch, raw starch.

(7) Lactose acts on glucose, lactose.

(8) Ghee produces more calorie than butter, mustard oil.

IV. Fill up the gaps :—

(i) There are ——essential amino acids.

(ii) Ptyalin is a ——splitting enzyme.

(iii) ——is due to iodine deficiency.

(iv) Hermon is rich in Vitamin——.

(v) Kwashiorkor is a——deficiency disease.

(vi) —— food stuff yields the largest amount of energy.

Paper II

A Type

1. Why should we take cooked food ? Describe the different methods of cooking and discuss their relative advantages and disadvantages.

2. Mention the effect of heat on different food constituents.

3. What measures would you take to maintain ideal sanitation of your Kitchen ? Name the essential Kitchen equipment. How will you arrange them ?

4. Why should we preserve foods ? State the different methods of preservation. Mention the Principles behind each method.

5. What do you mean by the term 'Balanced diet' ? Discuss the principle of diet planning.

6. Prepare a diet chart of low cost for a non-vegetarian pregnant mother offering at least 2400 calories and 70 gms. of protein daily.

7. Plan a feeding programme for a 3 months old baby deprived of mother's milk. What are the disadvantages of artificial feeding ?

8. What are the Common deficiency diseases prevalent among poor Indian children ? Describe in detail the symptoms, prevention and cure of any one of these diseases.

9. What therapeutic diet should be prescribed for a patient suffering from Peptic-ulcer ? Give reasons for your answer.

10. How will you Prepare the following :

(a) Vegetable stew, (b) Whey, (c) Barley water, (d) Sujiruti, (e) Double boiled rice.

11. What are the bad effects of excessive calorie intake ? What principles would you follow while planning a diet for an over-weight person ? Give reasons.

12. Discuss the different factors responsible for high incidence of Protein-Calorie malnutrition among poor Indian children. What measures would you suggest to control the disease ?

13. What are the common defects in our food practices ? What measures will you take to improve them ?

14. How will you impart effective nutrition education among Indian villagers ?

15. Discuss the advantages of breast milk over artificial milk. Mention the composition of breast milk.

16. What fundamental principles are involved in suggesting diet for a baby ? Make a list of the types of food items suitable for a one year old child.

17. What are the different methods of surveying food consumption and food habits in a family ? Which of the methods is most suitable for surveying food practices of Indian families, living in remote rural areas.

18. How do you assess the growth and development rate of a young boy of 3 years of age ? What steps will you take to improve the rate of growth and development ?

19. Discuss the current national nutritional programmes in India, which have been adopted by the Government and other agencies to improve child health.

B Type

Write short notes on :—

(1) Roasting Vs Baking.
(2) Cooking of green leafy vegetables.
(3) Cooking of rice.
(4) Canning and bottling.
(5) Pasteurisation of milk.
(6) Nutritional needs at lactation.
(7) Breast milk.
(8) Weaning.
(9) Nutritional requirement of a School-going child.
(10) Sick diet.
(11) Marasmus.
(12) High Protein diet.
(13) Bland diet.

(14) Balanced diet.
(15) Lathyrism.
(16) Kitchen Sanitation.

C Type

I. *Give reasons for the following :—*

(1) A child should be fed cereal water from the age of 4 months.
(2) A baby should be weaned at the age of 8—9 months.
(3) A patient of liver disease should take fat-free diet.
(4) In high fever, glucose water is essential.
(5) Vegetables should be cooked in closed vessels.
(6) Our diet should contain seasonal fruits and vegetables.
(7) Meat should be cooked at low temperature.
(8) Egg should not be taken raw.

II. *State whether the following statements are true or false :—*

(1) Fruits, especially citrus and tomatoes are too acid to be handled by the body.
(2) Garlic cures high blood pressure.
(3) Beet root builds blood.
(4) Foods cooked in aluminium utensils will not cause Cancer.
(5) The following combinations of foods are poisonous —milk and orange juice or other citrus fruit juice ; milk and meat ; milk and curd.
(6) Honey is not fattening.
(7) Meat gives you strength.
(8) Fruit juices do not contribute calories to the diet.
(9) Toast has higher calorie than bread.
(10) Vegetable fats and oils have low calorie value than animal fats.
(11) Adults need more milk than infants.
(12) Skimmed milk has little nutritive value.
(13) Beef liver is less nutritious than Pork or calves liver.
(14) White shelled eggs are more nutritious than brown ones.

III. *Fill up the gaps :—*

(a) Lathyrism is associated with excessive consumption of the —.
(b) A type of anaemia known as megaloblastic anaemia may be due to the deficiency of either — or vitamin — or both.
(c) Green leafy vegetables are particularly rich in — and —

(d) The calorie and protein allowances for infants of 9 — 12 months are calorie per kg. body weight and — gm./kg. body weight.

(e) The Prevalence of — in the sub-Himalayan regions of India is due to the deficiency of iodine in the diet.

(f) The calorie value of water is —.

Extra Questions :

1. Compare animal proteins and plant proteins. What are the functions of proteins in our body ? What diseases are caused by the deficiency of protein and calorie ?

2. Write a note on the Antiscorbutic Factor.

3. What is digestion ? Describe the process of digestion with the help of a diagram.

4. W hat are the good sources of Calcium and Iron ? What are thair role in human nutrition ?

5. What is 'Vitamin' ? Explain the usefulness of vitamin in the preservation of our health. Trace the cause why one contracts ricket and beri beri. Can you suggest any preventive for these ? —Discuss.

6. Name some foods which are rich sources of Vitamin A. What signs and symptoms are produced in a person suffering from severe deficiency of Vitamin A.

7. Write short notes on any 2 :—

(a) Cereals.

(b) Kilo-calorie.

(c) Vitamin E.

1. Indicate whether true or false :

(a) Bile is secreted from gall bladder.

(b) B. M. R. is increased during pregnancy.

(c) Sun-rays helps in the production of Vitamin K.

(d) Skimmed milk contains more protein than any pulse.

(e) The disease of D's occur due to the deficiency of Nicotinamide.

2. Write short notes on any 5 of the following :

(a) Nightblindness

(b) Cellulose

(c) Milk and its products

(d) Green leafy vegetables

(e) Ariboflavinosis

(f) Colostrum

3. Describe the clinical sings of the deficiencies of vitamids B_1 and B_2. Name some important sources of these vitamins.

4. What is metabolism. Describe carbohydrate metabolism. What part is played by insulin in carbohydrate metabolism ?

5. Define basal metabolism. Discuss the factors which govern basal metabolism of a person.

6. Why is a formula fed baby more prone to scurvy than a breast-fed baby ? What are the clinical manifestations of a deficiency of this factor ? What is the effect of an intake of it in exess of the body's needs ?

7. What are the sources of water in the body ? How water leaves the body ? Discuss how water balance is maintained in the body.

1. What is your idea about the planning of a Kitchen ? Describe an ideal kitchen as it should be. Discuss the steps to be taken for the safety of your kitchen.

2. What are the advantages of breast-feeding an infant ? What are the disadvantages of artificial feeding ? Name some of the weaning foods suitable for a six-month-old infant.

3. Describe the different methods of cooking an d their effects on the nutritive value of food.

4. 'Anaemia as a nutritional deficiency discease'. —Discuss.

5. Give a brief account of the post-natal food of a mother. Give reasons and comment on its nature to justify your treatment.

6. What do you understand by protein-calorie malnutrition ? —Discuss.

7. Write short notes on any 2 :—

(a) Biological value of protein.

(b) Kwashiorkor.

(c) Beri beri.

1. Fill in the blanks —

(a) The cause of pellagra is the deficiency of —.

(b) Ptyalin is a — splitting enzyme.

(c) Keratomalacia is caused by the deficiency of —.

(d) Galactose is obtained from the — of cactose

(e) Tryptophan serves as a — for niacin.

2. Write short notes on any 5 from the following :—

(a) Goitre.

(b) Kitchen hygiene.

(c) Dry cooking vs wet cooking.

(d) Increased calorie requirement during lactation period.

(e) Weaning a baby.

(f) Food sources of iron and phosphorus.

3. State the reasons why most of the foods should be cooked before they are eaten. What are the different methods of cooking ? How best you can preserve the nutritive value in cooking rice ?

4. Name the most common form of nutritional anaemia seen in India in infants and children and in women of child-bearing age. Discuss briefly why they are common ? How would you prevent deficiency anaemia in pregnant mothers.

5. How should a new born baby be fed ? What is weaning ? How is a child weaned ?

6. What factors should be considered while planning a diet ? Give the nutritional allowances for Indian.

7. What is the utility of preserving foods ? Describe the different methods of preserving milk.

———

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন

1980

Paper I

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্যের কি সম্পর্ক? স্বাস্থ্যরক্ষায় খাদ্যের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর। ১৪

২। পরিপাক কাহাকে বলে? পাচনযন্ত্রের চিত্রসহ কার্বহাইড্রেট পরিপাক প্রণালী বর্ণনা কর। ১৪

৩। ক্যালরীর সংজ্ঞা কি? বিভিন্ন প্রকার কায়িক পরিশ্রমে ও শারীরবৃত্তীয় অবস্থায়, ক্যালরীর চাহিদা পরিবর্তিত হয় কেন? ১৪

৪। চর্বিজাতীয় স্নেহ ও তেলের মধ্যে কি পার্থক্য? মানুষের দেহের পুষ্টিতে চর্বিজাতীয় স্নেহ ও তেলের গুরুত্ব আলোচনা কর। ১৪

৫। আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি-র প্রয়োজনীয় কার্য সম্বন্ধে যাহা জান লেখ। এই ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ হয়? ১৪

৬। সুষম খাদ্য তালিকা কি ভাবে প্রস্তুত করিবে? সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুতের শর্তগুলি আলোচনা কর। ১৪

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য লিখ (যে কোন চারটি): ৪×২=৮

(১) সয়াবীনের প্রোটিনে সব কটি আবশ্যকীয় এ্যামিনো এসিড যথেষ্ট পরিমাণে আছে।

(২) ভিটামিন 'সি' পেলেগ্রা রোগ প্রতিরোধ করে।

(৩) চর্বি কার্বহাইড্রেটের চাইতে বেশী শক্তি প্রদান করে।

(৪) ভিটামিন 'এ' সব্জিতে বর্তমান।

(৫) ম্যারাসমাস একটি ভিটামিনের অভাব জনিত রোগ।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি): ৩×২=৬

(১) রক্তাল্পতা সাধারণতঃ—অভাবে ঘটে

(২) কোয়াশিয়রকার নিরাময়ে—জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন

(৩) অস্টিওম্যালেসিয়া—অভাবে ঘটে।

(৪) ভিটামিন বি১২—নামেও পরিচিত

৮। যে কোন চারটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: ৪×৩½=১৪

(ক) শিশুর খাদ্য। (খ) গর্ভাবস্থায় রক্তাল্পতা। (গ) ভিটামিন এ'র উৎস। (ঘ) পাকস্থলীর পাচক রস। (ঙ) দুগ্ধের উপাদান। (চ) উদ্ভিজ্জ প্রোটিন।

Paper II

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও

১। খাদ্য সংরক্ষণ করা যায় [ক] লবণের দ্বারা ; [খ] শুষ্ককরণের সাহায্যে। উভয় পদ্ধতির দুইটি করে উদাহরণ দাও। খাদ্য সংরক্ষণের এই পদ্ধতিগুলির মূলসূত্র কি সংক্ষেপে আলোচনা কর। ২+২+৫+৫=১৪

২। (ক) একজন প্রাপ্তবয়স্কা নিরামিষভোজী স্বল্প পরিশ্রম করেন এমন ভারতীয় নারীর জন্য সুষম দৈনিক খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর। (খ) স্তন্যদানের দ্বারা মায়ের প্রোটিনের চাহিদা কিভাবে প্রভাবিত হয় তাহা আলোচনা কর। ১০+৪=১৪

৩। (ক) ভারতীয় রন্ধনশালার স্বাস্থ্যসম্মত পরিচ্ছন্নতা কিভাবে রক্ষা করিবে ? (খ) একটি আদর্শ ভারতীয় রন্ধনশালা আঁকিয়া দেখাও। ৮+৬=১৪

৪। (ক) ক্যালসিয়ামে সমৃদ্ধ ৫টি খাদ্যের নাম লেখ। (খ) একটি ছোট শিশুর শরীরে ক্যালসিয়ামের কাজ সংক্ষেপে আলোচনা কর। (গ) একটি শিশুর ক্যালসিয়ামের দৈনিক চাহিদা কত ? ৫+৭+২=১৪

৫। ভারতের শিশুদের মধ্যে প্রোটিন ও শক্তির অভাবজনিত অপুষ্টির (Protein Calorie Malnutrition) বিভিন্ন কারণ বর্ণনা কর। ইহার প্রতিরোধ কিভাবে করা যায় ? ৭+৭=১৪

৬। বহুমূত্র অথবা উদরাময় রোগীর একদিনের খাদ্য পরিকল্পনার সময়ে খাদ্যের কোন্ কোন্ উপাদানের কথা বিবেচনা করা উচিত ? তুমি যে খাদ্য তালিকা পরামর্শ দিবে তাহার শক্তি মূল্য (Calorie value) নির্ণয় কর। ৭+৭=১৪

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটি) $৪ \times ৩\frac{১}{২} = ১৪$

(ক) অত্যাবশ্যক অ্যামাইনো অ্যাসিডসমূহ (Essential amino acids), (খ) জাতীয় পুষ্টিপ্রকল্পসমূহ (National Nutritional Programmes), (গ) অতিস্থূলতা (Obesity), (ঘ) ফোলিক অ্যাসিড (Folic Acid), (ঙ) শাক সব্জি রাঁধিবার পদ্ধতি, (চ) মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাইয়া অন্য খাদ্যে অভ্যস্ত করানো (Weaning process)।

৮। (ক) সত্য বা অসত্য উল্লেখ কর (যে কোন চারটি) ঃ ৪×২=৮

(১) রাত্রান্ধতা রোগ ভিটামিন 'এ'র অভাবে ঘটে, (২) সাধারণ রন্ধন পদ্ধতিতে ভিটামিন 'সি' নষ্ট হয় না, (৩) প্রাপ্ত বয়স্কদের চেয়ে শিশুর ভিটামিন 'ডি'র প্রয়োজন বেশী, (৪) স্কার্ভিরোগের কারণ আয়ডিনের অভাব মাত্র, (৫) গলগণ্ড রোগের কারণ প্রোটিনের অভাব।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি) ঃ ৩×২=৬

(১) থায়ামিনের অভাবে — রোগ হয়, (২) স্নেহ পদার্থে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলির নাম —, (৩) লৌহ — তৈরী করতে সাহায্য করে, (৪) গাজরে প্রচুর পরিমাণে — থাকে।

1981

Paper – I

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। পুষ্টির সংজ্ঞা লিখ। পুষ্টির সহিত স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কি? ৪+১০=১৪

২। গুণানুসারে প্রোটীন খাদ্যগুলিকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়?
জান্তব (Animal) ও উদ্ভিদজাত প্রোটীন কোন্ শ্রেণীভুক্ত? উভয় প্রকার প্রোটীনের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। অসম্পূর্ণ প্রোটীন কাহাকে বলে? একজন ষাট কিলোগ্রাম ওজনসম্পন্ন মানুষের কমপক্ষে কতগ্রাম প্রোটীন দৈনিক গ্রহণ করা উচিত? অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড বলিতে কি বুঝ? উহাদের নাম লিখ। প্রোটীনের ক্যালরী মূল্য কত? ১+১+২+১+২+২+৪+১=১৪

৩। নিম্ন বিপাকীয় মান (Basal Metabolic Rate) কাহাকে বলে? কিভাবে ইহার মান নির্ধারিত হয়? পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে এই মান কত? কোন্ কোন্ কারণে ইহা পরিবর্তিত হয়? ২+৩+২+৭=১৪

৪। কার্বোহাইড্রেটের (শ্বেতসার) সংজ্ঞা লিখ এবং উহার শ্রেণী বিভাগ কর। পুষ্টিরক্ষায় কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা আলোচনা কর। নিম্নলিখিত খাদ্যে কি কি কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় তাহার নাম উল্লেখ কর—যকৃৎ, দুগ্ধ, মধু, চাউল।
২+৪+৪+৪=১৪

৫। ভিটামিন কাহাকে বলে? জলে দ্রবণীয় এমন কয়েকটি ভিটামিনের নাম কর। তোমার লেখা যে কোন একটি ভিটামিনের ক্ষেত্রে একজন বয়স্ক লোকের দৈনিক চাহিদা কত? উহার অভাবে দেহে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পাইবে? কয়েকটি খাদ্যের নাম কর। যাহাতে উহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ১+৩+২+৪+৪=১৪

৬। দেহে লৌহের কার্যপ্রণালীর বিবরণ দাও। কোন্ কোন্ খাদ্যে ইহা পাওয়া যায় এবং একজন বয়স্ক লোকের দৈনিক কতখানি লৌহের প্রয়োজন তাহা লেখ।
৮+৪+২

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য লিখ (যে কোন চারটি): ৪×২=৮

(১) পিত্ত একটি জারক রস।
(২) প্রোটীনের অভাবে শিশুদের কোয়াশিয়রকর রোগ হয়।
(৩) ডালে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন বি-১২ আছে।
(৪) লৌহ হিমোগ্লোবিনের একটি বিশেষ উপাদান।
(৫) ভিটামিন সি'র অভাব পেলেগ্রা রোগের কারণ।

(খ) শূন্য স্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি): ৩×২=৬

(১) আয়োডিনের অভাবে——রোগ দেখা দেয়।
(২) ভিটামিন——অভাবে বেরিবেরি হয়।
(৩) ভিটামিন——অভাব, রাতকাণা রোগের জন্য দায়ী।
(৪) দেহের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে———প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটী): ৪×৩½=১৪

(ক) সয়াবীন
(খ) ভিটামিন বি-১২

(গ) শাকসব্জী
(ঘ) রক্তাল্পতা
(ঙ) ডিমের পুষ্টিমূল্য
(চ) খাদ্যের ক্যালোরী মূল্য।

Paper—II

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রন্ধনের উদ্দেশ্য কি? রন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম কর। বিভিন্ন ভিটামিনের উপর রন্ধনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪+৩+৭=১৪

২। খাদ্যবস্তু দূষিত হয় কেন? ইহাতে পচনই বা দেখা দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর। খাদ্যবস্তুর পচন নিবারণের উপায়গুলি বল। ৯+৫=১৪

৩। রাত্রান্ধতা ও রক্তাল্পতার বিভিন্ন কারণগুলি বর্ণনা কর। ইহাদের প্রতিরোধ কিভাবে করা যায়? ৩+৩+৪+৪=১৪

৪। খাদ্য বলিতে কি বুঝ? খাদ্যকে উহার উপাদান হিসাবে শ্রেণীবিভাগ কর। খাদ্যে বিভিন্ন বিভাগ হইতে বাছাই করিয়া তোমার নিজের জন্য একটি সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত কর। ইহার মোট ক্যালরী মূল্য কত হইবে? ২+৩+৭+২=১৪

৫। শিশু ও বালক-বালিকাদের পুষ্টির মান উন্নত করার জন্য ভারতে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে? যে কোন একটি প্রকল্প সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৫+৯

৬। গর্ভবতী নারীর একদিনের খাদ্য পরিকল্পনার সময়ে কোন্ কোন্ উপাদানের কথা বিবেচনা করা উচিত এবং কেন? ১৪

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য উল্লেখ কর (যে কোন চারটি): ৪×২=৮

(১) ময়দার চেয়ে আটার খাদ্য মূল্য বেশী।
(২) যকৃতের রোগে খাদ্যে চর্বি থাকা একান্ত প্রয়োজন।
(৩) ঢাকা দেওয়া পাত্রে শাকশব্জি রান্না করা উচিত।
(৪) উদ্ভিজ্জ তেলের ক্যালরী মূল্য জান্তব চর্বি অপেক্ষা কম।
(৫) কাঁচা ডিম খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী।

(খ) শূন্য স্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি): ৩×২=৬

(১) খেসারী ডাল বেশী খেলে——হয়।
(২) একটি ৯-১২ মাস বয়সের শিশুর দৈনিক প্রোটীনের প্রয়োজন——গ্রাম/কিগ্রা দেহের ওজন।
(৩) ———গ্রহণ করলে স্কার্ভি রোগ নিরাময় হয়।
(৪) ———অভাবে অস্টিওমেলেশিয়া হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটি): ৪×৩½=১৪

(ক) পাস্তুরাইজেশান
(খ) রোগীর খাদ্য
(গ) রন্ধনশালার পরিচ্ছন্নতা
(ঘ) স্তন্যদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ
(ঙ) প্রোটীনসমৃদ্ধ খাদ্য

1982

Paper I

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। খাদ্য কাহাকে বলে? মানবদেহে খাদ্যের কাজগুলি বর্ণনা কর। খাদ্যের বিভিন্ন বিভাগগুলি কি কি? যে কোন একটি আলোচনা কর। ২+৬+১+৫=১৪

২। ডায়াটেক্‌টিকস্‌ বলিতে কি বুঝ? নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সংজ্ঞা দাও—যথোপযুক্ত খাদ্য, রক্ষাকারী খাদ্য, প্রমাণ খাদ্য এবং সুষম খাদ্য। উপাদান ও পরিমাণসহ একটি প্রমাণ খাদ্য তালিকা লিখ। উহার মোট ক্যালরী মূল্য কত? খাদ্যের ব্যক্তিমূল্য বলিতে কি বুঝায়? একজন পুরুষ, নারী এবং পাঁচ, সাত ও দশ বৎসরের তিনটি বালক-বালিকার প্রত্যেকের এবং মোট ব্যক্তিমূল্য কত? একটি পরিবারের খাদ্যের মোট ব্যক্তিমূল্য ৩·৭৩। ইহা হইতে মোট প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট ও স্নেহ পদার্থের পরিমাণ এবং মোট ক্যালোরী নির্ণয় কর। ১+৪+২+১+২+৪=১৪

৩। স্নেহজাতীয় পদার্থকে ট্রাইগ্লিসারাইড কেন বলা হয়? ভৌত ধর্ম ও উৎস (উদাহরণসহ) অনুসারে স্নেহজাতীয় পদার্থের শ্রেণীবিভাগ কর। অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড বলিতে কি বুঝ? দুইটি উদাহরণ দাও। মানবদেহের পুষ্টিতে স্নেহজাতীয় খাদ্যের গুরুত্ব কতখানি আলোচনা কর। একজন বয়স্ক মানুষের দৈনিক কি পরিমাণ স্নেহজাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা উচিত? এমন দুইটি স্নেহজাতীয় পদার্থের নাম লিখ যাহারা ভিটামিনের উৎসও বটে। ১+৩+২+৫+১+২=১৪

৪। খাদ্যের ক্যালোরীমূল্য বলিতে কি বুঝায়? এক ব্যক্তির ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? প্রোটীন, স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রত্যেকের ক্যালোরী মূল্য কত? একজন বহুমূত্র রোগীর খাদ্যতালিকা প্রস্তুতিতে কি কি বিষয়ের উপর সতর্কতা অবলম্বন করিবে? ধরা যাউক, একটি খাদ্য তালিকায় ২২০ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৭০ গ্রাম প্রোটীন এবং ৭০ গ্রাম স্নেহজাতীয় পদার্থ আছে। মোট ক্যালোরীমূল্য হিসাব কর। ১+৩+৩+৩+৪=১৪

৫। একটি ভিটামিনের অভাবে জেরপথ্যালমিয়া ও রাত্রান্ধতা দেখা দেয়। ভিটামিনটিকে চিহ্নিত কর। রাত্রান্ধতায় উহার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। একজন বয়স্কলোকের দৈনিক কত পরিমাণ উক্ত ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত? ঐ ভিটামিন কোন্‌ শ্রেণীতে পড়ে? উক্ত শ্রেণীভুক্ত অন্যান্য সদস্যদের নাম লিখ। কেন এই শ্রেণীর ভিটামিনগুলি চর্বির দ্রাবকে দ্রবীভূত হয়? অন্ততঃপক্ষে চারটি যকৃৎ তেলের নাম কর যাহাতে ঐ ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে। কয়েকটি শাক্‌-সব্জী ও ফলের নাম লিখ যাহাতে ঐ ভিটামিন পাওয়া যায়। গাজর ইত্যাদিতে কোন রাসায়নিক আকারে উহা থাকে? ১+৩+১+২+১+২+৩+১=১৪

৬। মানবদেহের পুষ্টিতে বিভিন্ন প্রকার লবণের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর। সাধারণ অবস্থায় দৈনিক কত পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ গ্রহণ করা উচিত? কোন্‌ অবস্থায় ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে? কমপক্ষে দৈনিক কত পরিমাণ জল গ্রহণ করা উচিত? ধাতব লবণের সমতা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর। ৪+৩+২+১+৪=১৪

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' লিখ (যে কোন চারটি)ঃ ৪×২=৮

(১) থাইরয়েড গ্রন্থি হইতে ইনসুলিন নিঃসৃত হয়।
(২) প্রোটীন জারিত হইয়া অ্যামিনো অ্যাসিড গঠন করে।
(৩) দেহের তাপ বৃদ্ধি পাইলে ক্যালোরীর প্রয়োজনীয়তা বাড়ে।
(৪) যকৃতে লৌহ সঞ্চিত থাকে।
(৫) আতপ চাউল, সিদ্ধ চাউল হইতে উৎকৃষ্ট।
(৬) আমাদের দেহ 'সি' ভিটামিন প্রস্তুত করিতে পারে।

(খ) শূন্য স্থান পূরণ কর (যে কোন তিনটি)ঃ ৩×২=৬

(১) নায়াসিনের অভাবে ——— হয়।
(২) লাইনোলিক অ্যাসিড একটি ——— ফ্যাটি অ্যাসিড।
(৩) অঙ্কুরিত ছোলায় ——— পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।
(৪) গ্লুকোজের বাড়তি ক্যালোরী দেহে ——— রূপে সঞ্চিত হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটি)ঃ ৪×৩½=১৪

(ক) বনস্পতি
(খ) দুধ ও তার পুষ্টিমূল্য
(গ) বেরিবেরি
(ঘ) প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা
(ঙ) এ. টি. পি.
(চ) কোয়াশিয়রকর।

Paper II

যে কোন পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কি কি পরিবর্তন হইবেঃ ৫+৪½+৪½=১৪

(ক) দীর্ঘ সময় ধরিয়া দুধ জ্বাল দেওয়া হইল,
(খ) কড়া করিয়া মাছ ভাজা হইল,
(গ) পালং শাক খোলা পাত্রে সিদ্ধ করা হইল।

প্রত্যেক ক্ষেত্রে পুষ্টিমূল্যের যদি পরিবর্তন হইয়া থাকে তবে তাহা বজায় রাখার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

২। রন্ধনগৃহের পরিকল্পনা কিরূপ হওয়া উচিত, সংক্ষেপে আলোচনা কর। নক্‌শাসহ বিভিন্ন আকারের রন্ধন গৃহের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি লিখ। ৬+৮=১৪

৩। একজন স্তন্যদাত্রী মায়ের জন্য সুষম খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর। এইরূপ খাদ্যতালিকা পরিকল্পনার সময় কোন্ কোন্ উপাদানের কথা বিবেচনা করা উচিত এবং কেন? ৪+১০

৪। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কতকগুলি শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেল—বয়সের তুলনায় দেহের ওজন কম, মেদহীন দেহ, মাংসপেশী সুগঠিত নয়, গায়ের চামড়া খস্‌খসে, খাদ্যদ্রব্য হজম হয় না এবং হাত-পা ফোলা ফোলা। তোমার জানা দুইটি রোগের

নাম কর যাহাতে ঐ উপসর্গগুলি দেখা যায়। ইহার কারণগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর। এরূপ শিশুদের দ্রুত আরোগ্য লাভের জন্য কিরূপ খাদ্য তালিকা হওয়া উচিত ? এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় এবং কম খরচে হয় এমন একটি খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী বর্ণনা কর। ২+৫+৩+৪=১

৫। একটি পরিবারের খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কি কি উপায়ে নির্ধারণ করিবে ? একটি গ্রামীণ পরিবারের পক্ষে কোন্ পদ্ধতিটি সবচেয়ে উপযুক্ত মনে কর ? ১০+৪=১৪

৬। খাদ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্য কি ? গৃহে খাদ্য সংরক্ষণের সাধারণ পদ্ধতিগুলি বর্ণনা কর। ক্যানিং পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা যায় এরূপ তিনটি খাদ্যের নাম কর। ৩+৯+২=১৪

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' লিখ (যে কোন চারিটি) ঃ ৪×২=৮

১। ক্যালোরীর অভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

২। বহুমূত্র একটি সংক্রামক ব্যাধি।

৩। সংরক্ষিত খাদ্য প্রতিদিন আহার করলে অভাবজনিত রোগ দেখা দিতে পারে।

৪। ওজন কমানোর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উপবাসে থাকা।

৫। সাধারণ রান্নার চেয়ে ভাপে রান্না উৎকৃষ্ট।

(খ) রোগের নাম ('ক' বিভাগ) এর সহিত বাক্যাংশ ('খ' বিভাগ) গুলি ঠিকমত পাশাপাশি সাজাও (যে কোন তিনটি) ঃ— ৩×২=৬

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
১। বহুমূত্র রোগে	মাড়ি থেকে রক্ত পড়ে।
২। কোয়াশিয়রকর-এ	রক্তে হিমোগ্লোবিন কমে যায়।
৩। স্কার্ভি রোগে	প্রোটিনের অভাবে হয়।
৪। রক্তাল্পতা রোগে	রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ে।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারিটি) ঃ

১। ম্যারাসমাস।

২। কেরোটিন।

৩। জাতীয় পুষ্টি প্রকল্প।

৪। শিশুর খাদ্য।

৫। অংকুরিত ছোলা। ৪×৩½=১৪

---

* মূল প্রশ্নে যেরূপ বানান দেওয়া আছে সেরূপ বানানই রাখা হইল।

NUTRITION—First Paper

১। শাকসব্জী হইতে কি কি খাদ্য উপাদান পাওয়া যায়? নিম্নলিখিত খাদ্যদ্রব্যগুলি কোন্‌টি কোন্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত নির্ণয় কর ও উহাদের গুণাগুণ বর্ণনা কর : ভুট্টা, মিষ্টি, আলু, পালং শাক, বাঁধাকপি। ৪+২½×৪=১৪

২। পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, লিভার এবং কিড্‌নী—প্রত্যেক অংশের প্রধান প্রধান কাজগুলি উল্লেখ কর। শর্করা ও প্রোটিন পরিপাককারী উৎসেচকগুলির নাম লিখ। ৫×২+৪=১৪

৩। প্রোটিন কাহাকে বলে? গুণানুসারে প্রোটিনকে কয় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, উদাহরণসহ লিখ। প্রোটিনের অভাবজনিত উপসর্গগুলি লিখ। প্রোটিনের প্রধান কাজগুলি কি? কাঁচা মাংস ও সিদ্ধ মাংসের মধ্যে কোন্‌টি দ্রুত হজম হয় এবং কেন? খাদ্যের প্রোটিন কিভাবে দেহের কোষের উপযোগী হয়? ৪। কোন একটি ভিটামিনের অভাবে শরীরে নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দেখা যায়—দাঁতের মাড়ি হইতে রক্ত ক্ষরণ, ত্বক ফাটিয়া রক্ত ক্ষরণ, গাঁট ফুলিয়া যাওয়া। ভিটামিনকে চিহ্নিত কর। উহার রাসায়নিক নাম কি? ঐ ভিটামিন কোন্‌ শ্রেণীতে পড়ে। কয়েকটি শাকসব্জী ও ফলের নাম লিখ যাহাতে ঐ ভিটামিন থাকে। একজন বয়স্ক লোকের দৈনিক কত পরিমাণ উক্ত ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত? মানুষের দেহে ঐ ভিটামিন তৈয়ারী হয় কি? খোলা পাত্রে টাট্‌কা শাকসব্জী সিদ্ধ করিলে ঐ ভিটামিনের কি ক্ষতি হয় এবং কিভাবে উহা বজায় রাখা যায়? কোন্‌ রাসায়নিক আকারে উহা সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয়?

৫। রক্তাল্পতা কাহাকে বলে? কোন্‌ লবণের অভাবে উহা দেখা যায়? লবণটির নাম বল। শরীরের কোন্‌ অংশে উহা সঞ্চিত থাকে এবং কি রাসায়নিক আকারে? কোন্‌ কোন্‌ খাদ্যে উহা পাওয়া যায়? দুইটি ভিটামিনের নাম কর যাহারা রক্তাল্পতা রোধে ব্যবহৃত হয়। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও নারীর ঐ লবণ দৈনিক কতটা গ্রহণ করা উচিত? একজন গর্ভবতী নারীর ক্ষেত্রে ঐ লবণ গুরুত্বপূর্ণ কেন?

১+১+১+১+৩+২+২+৩=১৪

৬। নিম্নবিপাকীয় হার বলিতে কি বুঝ? কিভাবে ইহা পরিমাপ করা হয়, সংক্ষেপে লিখ। ইহার একক কি? কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের উপর ইহার মান নির্ভরশীল? ২+৫+১+৬=১৪

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য লিখ (যে কোন চারটি) :— ৪×২=৮

(১) একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চাইতে একজন বালক/বালিকার প্রতি কিলোগ্রাম দৈহিক ওজনের জন্য বেশী প্রোটিনের প্রয়োজন হয়। (২) ভিটামিন 'ই'-কে রক্ত তঞ্চনকারী ভিটামিন বলা হয়। (৩) ক্যালসিয়ামের অভাবে রক্তাল্পতা দেখা দেয়। (৪) ভিটামিন 'এ' জলে দ্রবণীয়। (৫) আমলকীতে সবচেয়ে বেশী ভিটামিন 'সি' আছে। (৬) গ্লুকোজ মস্তিষ্কে শক্তি সরবরাহ করে। (খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি) :—

(১) সিদ্ধ চালে ——— পরিমাণ বেশী। (২) প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ——— আবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। (৩) গ্লাইকোজেন এক ধরনের ———।

(৪) ক্যালসিয়ামের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস — —। (৫) ডায়াবেটিসে রক্তে — — পরিমাণ বাড়িয়া যায়। (৬) বেরি বেরি রোগের প্রধান উপসর্গ হইল — —। ৩×২=৬

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারটি):— ৪×৩½=১৪

(ক) দৈনন্দিন খাদ্যে ডালের গুরুত্ব, (খ) ক্যালসিয়ামের প্রয়োজনীয়তা, (গ) ম্যারাসমাস, (ঘ) স্কার্ভি, (ঙ) আবশ্যকীয় ফ্যাটি অ্যাসিড, (চ) ভিটামিন 'এ' ও তার শারীরবৃত্তীয় কাজ।

NUTRITION—Second Paper

১। রন্ধনের উদ্দেশ্যগুলির (যে কোন **তিনটি**) সংক্ষেপে আলোচনা কর। রন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম লিখ এবং যে কোন একটি পদ্ধতির গুণাগুণ উল্লেখ কর। রন্ধনের সময় জলে দ্রবণীয় ভিটামিনের উপর উত্তাপের প্রভাব সম্পর্কে লিখ। ৫+২½+২½+৪=১৪

২। মাতৃদুগ্ধ এবং শিশুখাদ্য হিসাবে বর্ণিত গুঁড়া দুগ্ধ—এই দুই দুগ্ধ পান করানোর সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর। শিশুখাদ্যে ভিটামিন 'সি' ও 'ডি' গুরুত্বপূর্ণ কেন? কিভাবে ঐগুলি দেওয়া হইয়া থাকে? মাতৃদুগ্ধের পরিবর্তে গোদুগ্ধ কিরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে যুক্তিসহ লিখ।

৩। গর্ভবতী মাতার দৈনিক সুষম খাদ্য পরিকল্পনায় কোন্ কোন্ বিষয়গুলি বিশেষভাবে বিবেচ্য এবং কেন? আমিষ অথবা নিরামিষ ভোজী গর্ভবতী মাতার দুপুরবেলার খাদ্যতালিকা কিরূপ হইবে? ৮+৬=১৪

৪। কোন ব্যক্তির দেহের ওজন অধিক হওয়ার অসুবিধা কি কি? এরূপ ব্যক্তির খাদ্যতালিকা কিভাবে প্রস্তুত করিবে? খাদ্যতালিকার পরিবর্তন ছাড়া আর কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহাকে সচেতন করিতে হইবে? ৫+৬+৩=১৪

৫। দুগ্ধ নষ্ট হইয়া যাইবার কারণ ব্যাখ্যা কর। উহা নিবারণের উপায়গুলি কি? যে কোন একটি সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর। গোদুগ্ধে কি কি জীবাণু উপস্থিত থাকিবার সম্ভাবনা? দুগ্ধের পুষ্টিমূল্যের উপর সর্বাধিক ব্যবহৃত সংরক্ষণ পদ্ধতির প্রভাব সম্পর্কে লিখ।

৬। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের (৫ হইতে ৭ বৎসরের দুইটি সন্তানসহ পিতা মাতা) মধ্যাহ্ন ভোজনের একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত কর। তোমার তালিকার মোট তাপমূল্য কত তাহা নিম্নে খাদ্যমূল্য তালিকা হইতে নির্ণয় কর:— ৪+১০=১৪

প্রতি ১০০ গ্রামে

খাদ্য	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	শর্করা
চাউল	৬.৯	০.৪	৭৯.২
মুসুর	২৫.১	০.৭	৫৯.৭
মাছ	১৯.৪	৪.৪	—

খাদ্য	প্রোটিন	প্রতি ১০০ গ্রামে স্নেহ পদার্থ	শর্করা
আলু	১.৬	০.১	২২.৯
পিঁয়াজ	১.২	০.১	১১.৬
ফুলকপি	৩.৫	০.৪	৫.৩
টম্যাটো	১.০	০.১	৬.৩

দেওয়া আছে ঃ ১ গ্রাম শর্করা=৪ ক্যালোরি, ১ গ্রাম স্নেহ পদার্থ=৯ ক্যালোরি এবং ১ গ্রাম প্রোটিন=৪ ক্যালোরি।

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য লিখ ঃ— ৪×২=৮

(অ) বি-ভিটামিনের অভাবে কেরাটেমেলেসিয়া হয়। (আ) ট্রিপটোফ্যান গ্রহণ করিলে পেলেগ্রা সারে। (ই) উপবাসই জ্বর নিরাময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা। (ঈ) প্রোটিনের পরিমাণ সয়াবীনেই সবচেয়ে বেশী। (উ) বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা বাড়ে।

(খ) রোগের নাম (ক বিভাগ)-এর সহিত বাক্যাংশ (খ বিভাগ)-গুলি পাশাপাশি ঠিকমত সাজাও (যে কোন **তিনটি**) ঃ— ৩×২=৬

ক-বিভাগ	খ-বিভাগ
(অ) রাত্রান্ধতা	নায়াসিনের অভাবে হয়।
(আ) রিকেট	বি-১২-এর অভাবে হয়।
(ই) পার্নিসাস অ্যানিমিয়া	এ-ভিটামিনের অভাবে হয়।
(ঈ) পেলাগ্রা	ডি-ভিটামিন অভাব জনিত রোগ।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (**যে কোন চারটি**) ঃ— ৪×৩½=১৪

(ক) চীনাবাদাম (খ) দন্তক্ষয় (গ) দুগ্ধজাত খাদ্য। (ঘ) স্কুল টিফিন (ঙ) পরিপূরক আহার (চ) রিকেট।

1984

NUTRITION—First Paper

১। ঋতুকালীন খাদ্য কাহাকে বলে? কোন ঋতুতে কোন কোন খাদ্য খাওয়া উচিত—এ সম্বন্ধে কারণ দেখাও ও উদাহরণ দাও। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের গ্রীষ্মকালে দুপুরের খাদ্যতালিকা কি হইবে লিখ।

২। অত্যাবশ্যক ফ্যাটি অ্যাসিড বলিতে কি বুঝায়? উদাহরণ দাও। ইহার কাজ কি? খাদ্যে স্নেহাধিক্যের কুফল বর্ণনা কর। স্নেহ-জাতীয় পদার্থের কাজ কি? ঘি ও বনস্পতির তুলনা কর। স্নেহ-জাতীয় পদার্থের বিপাকে পিত্তের (Bile salt) কাজ কি? ১+১+১+২+৩+৪+২=১৪

৩। দেহের কোন্ অংশে এবং কি আকারে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত থাকে? উপবাসকালে দেহ কিভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি, আহরণ করে? সাধারণতঃ ফলের রস গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ উপবাসভঙ্গ করা হয় কেন? চিনির পরিবর্তে মধু ব্যবহার করা যায় কি? কার্বোহাইড্রেটের বিপাকে ইনস্যুলিন ও গ্লুকাগনের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর। অধিক কার্বোহাইড্রেট গ্রহণের কুফল কি?

৪। সুষম খাদ্য এবং মূল সাতটি প্রধান খাদ্যগোষ্ঠী বলিতে কি বুঝায়? কিভাবে সুষম খাদ্য পরিকল্পনা করা যাইতে পারে ব্যাখ্যা কর। খাদ্যমূল্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের জন্য যথোপযুক্ত খাদ্য উপাদানসহ একটি নিরামিষ খাদ্য পরিকল্পনা রচনা কর। ২+২+৬+৪=১৪

৫। প্রাণিদেহে ভিটামিনের অভাবজনিত উপসর্গ দেখিতে হইলে নিত্য গ্রহণীয় খাদ্য হইতে উহাকে বাদ দিতে হয়। কিন্তু নায়াসিনের অভাবজনিত উপসর্গ ফুটাইয়া তুলিবার জন্য খাদ্য হইতে উক্ত ভিটামিন ও ট্রিপটোফ্যান বাদ দিতে হইবে। এই দুইটির মধ্যে সম্পর্ক কি? ভিটামিনটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত এবং ইহার অভাবজনিত উপসর্গগুলি কি? প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে দৈনিক কত পরিমাণে এই ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত? কয়েকটি আমিষ ও নিরামিষ জাতীয় খাদ্যের নাম কর যাহাতে ভিটামিনটি থাকে। রান্নার সময় উহা নষ্ট হয় কি? হইলে কিভাবে রোধ করা যায় বল। খাদ্য বিপাকে ইহার ভূমিকা কি? ষাট (৬০) মিলিগ্রাম ট্রিপটোফ্যান হইতে কত মিলিগ্রাম এই ভিটামিন পাওয়া যায়?

৬। খাদ্যের ক্যালোরি মূল্য বলিতে কি বুঝ? প্রোটিন, স্নেহ ও কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থের প্রত্যেকের ক্যালোরি মূল্য কত? চল্লিশের উপর বয়স হইলে কি কি বিষয়ে সতর্কতা লওয়া উচিত? একজন মেদবহুল মানুষের জলখাবার, দুপুরের ও রাত্রের খাবারের তালিকায় উক্ত তিন প্রকার পদার্থ মোট কত পরিমাণে থাকিবে? মোট ক্যালোরি মূল্য হিসাব কর।

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' লিখ (যে কোন চারিটি) ঃ— ৪×২=৮

(১) লোহের অভাবে গলগণ্ড হয়। (২) যকৃৎ হইতে ইনস্যুলিন নিঃসৃত হয়। (৩) ভিটামিন 'কে' জলে অদ্রবণীয়। (৪) ভিটামিন 'এ'র অভাবে রক্তাল্পতা হয়। (৫) মেথিওনিন একটি অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড।

(খ) শূন্যস্থান পূরণ কর (যে কোন তিনটি) ঃ— ৩×২=৬

(১) শিশুদের জন্য — আবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড আছে। (২) টায়ালিন — পরিপাক করে। (৩) — অভাবে গলগণ্ড হয়। (৪) লেবুতে ভিটামিন — আছে। (৫) — হইতে প্রোটিন অপেক্ষা অধিক ক্যালোরি পাই।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারিটি) ঃ— ৪×৩=১৪

(ক) সবুজ শাকসব্জী। (খ) সয়াবিনের প্রোটিন। (গ) ভিটামিন 'ই'। (ঘ) সিদ্ধ চাল বনাম আতপ চাল। (ঙ) খাদ্যে লোহের উৎস। (চ) কেরাটো-মেলাশিয়া।

NUTRITION—Second Paper

১। একটি আদর্শ রন্ধনশালার পরিকল্পনা কর। স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিবে? ১৪

২। খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন উপায়গুলি কি? তুমি গৃহে অনুসরণ করিতে পার এরূপ দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর। ১৪

৩। শিশুর আহার সম্পর্কিত সমস্যা সম্বন্ধে কি জান? একটি এক বছরের শিশুর উপযুক্ত খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর। ১৪

৪। সুষম খাদ্য তালিকার সংজ্ঞা লিখ। খাদ্যতালিকা প্রস্তুতের সূত্রগুলি আলোচনা কর। ১৪

৫। কি উপায়ে তুমি ভারতীয় গ্রামীণ অধিবাসীদের পুষ্টি সম্পর্কীয় শিক্ষাদান করিবে? ১৪

৬। ভারতের বর্তমান জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' লিখ (যে কোন চারিটি):— ৪×২=৮

(১) ডিম কাঁচা খাওয়া উচিত নয়। (২) খোলা পাত্রে সব্‌জী রান্না করা উচিত। (৩) মাটা তোলা দুধের পুষ্টি মূল্য খুব সামান্যই। (৪) জান্তব চর্বির তুলনায় উদ্ভিজ্জ তেলের ক্যালরি মূল্য কম। (৫) যকৃতের রোগে চর্বিহীন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

(খ) 'ক' বিভাগের বাক্যাংশের সহিত 'খ' বিভাগের বাক্যাংশ পাশাপাশি ঠিক মত সাজাও (যে কোন তিনটি):— ৩×২=৬

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
(১) অস্টিওমেলেশিয়া	রেটিনলের অভাবে হয়।
(২) 'চিলোসিস'	ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে হয়।
(৩) বেরিবেরি	রাইবোফ্লেভিনের অভাবে হয়।
(৪) কেরাটোমেলেশিয়া	থায়ামিনের অভাবে হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারিটি):— ৪×৩½=১৪

(১) ডায়বিটিস বা বহুমূত্র রোগ, (২) ডায়েট সার্ভে, (৩) রক্তাল্পতা, (৪) জান্তব প্রোটিন বনাম উদ্ভিজ্জ প্রোটিন, (৫) অঙ্কুরিত ছোলা, (৬) স্কার্ভি।

1985

NUTRITION—First Paper

১। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি বল। প্রত্যেক উপাদানের কয়েকটি কার্যকারিতা লিখ। খাদ্যের মূল্য নিরূপণে কোন্ কোন্ বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত? ৪+৪+৬=১৪

২। উৎসেচক এবং সহ-উৎসেচক কাহাকে বলে। ভিটামিন হইতে সহ-উৎসেচক পাওয়া যায় কি? উদাহরণ দাও। পাচনতন্ত্রের অংশগুলি বল এবং বর্ণিত অংশে

উপস্থিত উৎসেচকের নামগুলি বল। উহাদের পরিপাক ক্রিয়া সম্পর্কিত কাজগুলি লিখ। ১+১+১+৩½+৩½+৪=১৪

৩। প্রবাহ চিত্র (Flow diagram) দ্বারা প্রোটিন কিভাবে দেহে জীর্ণ (digest) হয় লিখ। অ্যামিনো অ্যাসিড কাহাকে বলে? প্রোটীন জাতীয় খাদ্যে কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে? উহাদের মধ্যে অত্যাবশ্যক অ্যামিনো অ্যাসিড কয়টি লিখ। মানবদেহের পুষ্টিতে ইহারা কি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে? প্রোটীন-বহুল যে কোন চারিটি খাদ্যবস্তুর নাম উল্লেখ কর। কি কি লক্ষণ দেখিয়া তুমি বুঝিতে পার যে একজন অল্পবয়সী বালক বা বালিকা প্রোটিনের অত্যধিক অভাবে ভুগিতেছে?

৪। কোন একটি ভিটামিনের অভাবে নিম্নবর্ণিত উপসর্গটি দেখা যায়ঃ

পা ফোলা—পায়ে আঙুল দিয়া চাপ দিলে গর্ত হইয়া যায় এবং ইহা সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে না। ভিটামিনটির নাম লিখ। ইহার অভাব-জনিত অন্যান্য উপসর্গগুলি কি? কোন্ রোগে ঐ উপসর্গগুলি দেখা যায়? ভিটামিনটি কোন্ শ্রেণীভুক্ত? দৈনিক কত পরিমাণে এই ভিটামিন গ্রহণ করা হয় এবং কিভাবে রোধ করা যায়? ঐ ভিটামিনের প্রাচুর্য সংবলিত তিনটি সাধারণ খাদ্যবস্তুর নাম উল্লেখ কর। খাদ্য বিপাকে উহার ভূমিকা কি?

৫। মানবদেহের পুষ্টিসাধনে ক্যালসিয়াম বা লৌহের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা কর। ক্যালসিয়াম ও লৌহের তিনটি উৎকৃষ্ট স্বাভাবিক উৎসের নাম কর। ১০+৪=১৪

৬। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় যে সমস্ত প্রয়োজনীয় খাদ্য-শস্য, শাক-সব্জি এবং ডাল স্থান পাইয়া থাকে তাহাদের সম্পর্কে আলোচনা কর। খাদ্যের পুষ্টিমূল্য কিভাবে বর্ধিত করা যায়? ১০+৪=১৪

৭। (ক) সত্য অথবা অসত্য নির্দেশ কর (যে কোন চারিটি):— ৪×২=৮

(অ) ডিমে ভিটামিন 'সি' আছে। (আ) ভিটামিন 'ডি'-এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। (ই) ভিটামিন 'বি-১২'কে সায়ানোকোবালামিন বলা হয়। (ঈ) দুধে গ্লুকোজ আছে। (উ) অ্যামিনো অ্যাসিড শোষণে পিত্তরসের প্রয়োজন। (ঊ) রক্ত তঞ্চনে ভিটামিন 'কে' সহায়তা করে।

(খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর (যে কোন তিনটি):— ৩×২=৬

(অ) আমাদের প্রতিদিন — মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' প্রয়োজন হয়। (আ) — অভাবে বিটট্ স্পষ্ট্ হয়। (ই) রাইবোফ্লেবিন — দ্রবণীয়। (ঈ) অধিক কায়িক পরিশ্রমে — প্রয়োজনীয়তা বাড়ে। (উ) ভিটামিন 'ই'কে — ও বলা হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন চারিটি):— ৪×৩½=১৪

(ক) জান্তব প্রোটীন বনাম উদ্ভিজ্জ প্রোটীন। (খ) নিম্ন বিপাকীয় হার। (গ) সয়াবীন। (ঘ) অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড। (ঙ) লৌহের ভূমিকা। (চ) জলীয় ভারসাম্য।

NUTRITION—Second Paper

১। রন্ধনের প্রয়োজনীয়তা কি? বিভিন্ন রন্ধনপ্রণালীগুলি বল। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের উপর তাপের প্রভাব বর্ণনা কর। ৪+৫+৫=১৪

২। খাদ্যবস্তু দূষিত হয় কেন? ইহাতে পচনই বা দেখা দেয় কেন? ব্যাখ্যা কর। খাদ্য সংরক্ষণের মূলনীতি কি? পাস্তুরাইজেশান্ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ। ৭+৩+৪=১৪

৩। তিনটি বিভিন্ন আকারে কিভাবে দুধ পরিবেশন করা হয় বল। দুধকে সুষম খাদ্য বলা হয় কেন? গো-দুগ্ধের তুলনায় মাতৃদুগ্ধের উৎকৃষ্টতা আলোচনা কর। ৩+৬+৫=১৪

৪। রোগীর পথ্যের মূলনীতিগুলি কি? কিভাবে রোগীর পথ্য নির্বাচন করিতে হয় লিখ। আন্ত্রিক রোগীর পক্ষে তরল খাদ্যই উপযুক্ত কেন যুক্তি দিয়া দেখাও। ৫+৫+৪=১৪

৫। শিশু জন্মাইবার পর মাতার খাদ্যাদি কিরূপ হওয়া উচিত সংক্ষেপ লিখ। তোমার বক্তব্য যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন কর। ১৪

৬। নিম্নলিখিত রোগগুলি ও তাহাদের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা কর :—
(ক) গলগণ্ড। (খ) রক্তাল্পতা। ৭+৭=১৪

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' নির্দেশ কর (যে কোন **চারিটি**) :—

(অ) বহুমূত্র রোগে শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। (আ) উচ্চ রক্তচাপ অবস্থায় ডিমের সাদা অংশ খাওয়া যাইতে পারে। (ই) কামলা রোগে চর্বিহীন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। (ঈ) প্রাণীজ প্রোটীন উদ্ভিজ্জ প্রোটীন অপেক্ষা শ্রেয়। (উ) খোলা পাত্রে রান্না করিলে ভিটামিন 'সি' ঠিক থাকে।

(খ) 'ক' বিভাগের বাক্যাংশের সহিত 'খ' বিভাগের বাক্যাংশ পাশাপাশি ঠিক মত সাজাও (যে কোন **তিনটি**):— ৩×২=৬

'ক' বিভাগ	**'খ' বিভাগ**
(অ) রাতকানা	আয়োডিনের অভাবে হয়।
(আ) স্কার্ভি	ভিটামিন 'এ'-র অভাবে হয়।
(ই) প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়	ভিটামিন 'সি'-র অভাবে হয়।
(ঈ) গলগণ্ড	ভিটামিন 'ই'-র অভাবে হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ (যে কোন **চারিটি**) :— $8\times3\frac{1}{2}=$১৪

(ক) সিদ্ধ ডিম বনাম কাঁচা ডিম। (খ) চীনা বাদামের খাদ্য মূল্য। (গ) সাতটি প্রধান খাদ্য বিভাগ। (ঘ) খাদ্যের তাপ মূল্য। (ঙ) ৫—১২ বৎসরের স্কুলের বালক-বালিকার পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রোটীনের মাত্রা। (চ) অস্টিওম্যালশিয়া।

1986

NUTRITION—First Paper

যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর লিখ।

১। খাদ্য ও স্বাস্থ্যের সংজ্ঞা লিখ। স্বাস্থ্য রক্ষায় খাদ্যের ভূমিকা কি? ১৬

২। মানুষের পুষ্টিতে কার্বোহাইড্রেটের গুরুত্ব লিখ। দেহে কার্বোহাইড্রেট কিভাবে পাচিত ও শোষিত হয়? ১৬

৩। তেল ও চর্বির মধ্যে পার্থক্য কি? শিশুদের খাদ্যে অপর্যাপ্ত আবশ্যকীয় ফ্যাটি এ্যাসিড থাকলে কি কি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়? পিত্তরসের সঙ্গে চর্বি পরিপাকের কি সম্পর্ক? দেহে কি কি উপায়ে চর্বি সরবরাহ হয়? ১৬

৪। খাদ্য-জাত লৌহের উৎসগুলি কি? দেহে লৌহের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির উল্লেখ কর। কিশোরীদের মধ্যে লৌহের অভাবজনিত রক্তাল্পতার কারণ কি? লৌহের অভাবে রক্তাল্পতা হয় কেন? ১৬

৫। ভিটামিন 'এ'-র গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি লিখ। ইহার খাদ্যজাত উৎস ও দৈনিক প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কি জান? ভিটামিন 'এ'-র অভাবজনিত অন্ধত্বের এখনও ভারতে যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব কেন? কিভাবে ইহা দূর করা যায়? ১৬

৬। একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দেহে জলের পরিমাণ কত? দেহে জলের ভারসাম্য রক্ষার সহজ সূত্রগুলি কি? ১৬

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' নির্দেশ কর: (যে কোন **পাঁচটি**) ৫×২=১০

(ক) ভিটামিন 'ই'-কে রক্ত তঞ্চনকারী ভিটামিন বলা হয়।

(খ) ভিটামিন 'কে'-র উপর অতিবেগুনী রশ্মির কোন প্রভাব নেই।

(গ) ভিটামিন 'ডি'-র অভাবে পেলেগ্রা হয়।

(ঘ) পালং শাক ও আলু উভয়েই ভিটামিন 'সি'-এর উৎকৃষ্ট উৎস।

(ঙ) নিকোটিনিক এ্যাসিড একটি এ্যামিনো এ্যাসিড।

(চ) আয়োডিনের অভাবে গলগণ্ড হয়।

৭। (খ) শূন্যস্থান পূর্ণ কর: (যে কোন **তিনটি**) ৩×২=৬

(ক) যকৃৎ ——— হিসাবে কার্বোহাইড্রেট সঞ্চিত রাখে।

(খ) আমলকীতে সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ——— আছে।

(গ) ——— আবশ্যকীয় অ্যামিনো এ্যাসিড আছে।

(ঘ) লিনোলিক এ্যাসিড একটি আবশ্যকীয় ———।

(ঙ) ——— নালীবিহীন গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হয়।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (যে কোন **চারটি**) ৪×৪=১৬

(ক) গর্ভবতী ও স্তন্যদাত্রীর প্রোটিনের প্রয়োজনীয়তা। (খ) সুষম খাদ্য তালিকা। (গ) মূল ও কন্দ। (ঘ) স্কার্ভি। (ঙ) খাদ্যের ক্যালরী মূল্য। (চ) প্রোটিনের পরিপূরক মূল্য।

NUTRITION—Second Paper

যে কোন **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। রন্ধনের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি কি? পুষ্টি মূল্য বজায় রাখিয়া কিভাবে সব্জী রন্ধন করিবে? ১৬

২। চিত্রসহযোগে একটি আদর্শ রন্ধনশালা পরিকল্পনা কর। ১৬

৩। খাদ্য সংরক্ষণ সম্বন্ধে কি জান? দুগ্ধ কিভাবে সংরক্ষণ করিবে? ১৬

৪। সুষম খাদ্য তালিকা বলিতে কি বুঝ? একটি সতের বছর বয়স্ক বালিকার সুষম খাদ্য তালিকা কিভাবে প্রস্তুত করিবে? ১৬

৫। শিশুকে খাওয়ানোর সমস্যা সম্বন্ধে কি জান লিখ। একটি ছয় মাস বয়স্ক শিশুর একদিনের একটি খাদ্য-সূচী তৈরী কর। ১৬

৬। নিম্নলিখিত অপুষ্টিজনিত রোগগুলি ও তাদের প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা কর। (ক) কোয়াশিয়রকর (খ) রাত কানা ১৬

৭। (ক) 'সত্য' অথবা 'অসত্য' নির্দেশ কর ঃ ৫×২=১০

(যে কোন **পাঁচটি**)

(১) একমাত্র লৌহের অভাবেই রক্তাল্পতা রোগ হয়।

(২) দুগ্ধ একটি সম্পূর্ণ খাদ্য।

(৩) একটি সমাজের শিশু মৃত্যুর হার সঠিকভাবে তার পুষ্টির মান নির্দেশ করে।

(৪) ক্যালসিয়াম শোষণে ভিটামিন 'ডি' সহায়তা করে।

(৫) ক্যালরি পরিমাণের উপর থায়ামিনের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে।

(৬) ভিটামিন 'বি$_{১২}$' একমাত্র ভিটামিন যাহাতে কোবাল্ট আছে।

(খ) 'ক' বিভাগের তালিকার পুষ্টি উপাদানগুলির সহিত 'খ' বিভাগের তালিকার খাদ্য উৎসের মিল বাহির কর ঃ (যে কোন **তিনটি**) ৩×২=৬

'ক' বিভাগ	'খ' বিভাগ
(১) রাইবোফ্লেভিন	পেঁপে
(২) ভিটামিন 'সি'	গুঁড়
(৩) থিয়ামিন	দুধ
(৪) লৌহ	সম্পূর্ণ শস্যকণা
(৫) কেরোটিন	অঙ্কুরিত ছোলা

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ ঃ (যে কোন **চারটি**) ৪×৪=১৬

(ক) সিদ্ধ চাউল; (খ) পুষ্টি শিক্ষা; (গ) আই. সি. ডি. এস.; (ঘ) দুগ্ধজাত খাদ্য; (ঙ) রন্ধনশালার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ; (চ) বি. এম. আর. (নিম্ন বিপাকীয় মান)।